বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

উৎসর্গ

ড. বিমল কৃষ্ণ মজুমদার
গণিতের মানুষের
সাহিত্যে বিচরণ হোক

কিছুকথা

‘কালকেতু ও ফুল্লরা’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকশিত হয় ১৯৮৮ সালে। চারটি মুদ্রণের পরে আমার মনে হলো উপন্যাসটির সামান্য পরিমার্জনা দরকার। আমার বেশ কয়েকটি বইয়ের ক্ষেত্রে আমি এ কাজটি করেছি। এক ধরনের খুঁতখুঁতি থেকেই যায়। সে জন্য পরিমার্জনার বিষয়টি কখনো অনেক পরিবর্তন আনে। যেমন ‘নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি’ বা ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ পুনর্লিখিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশের পরে পরিমার্জনার আকার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ‘যাপিত জীবন’ উপন্যাসের। এভাবেই ঘটে থাকে লেখকের তৃপ্তি-অতৃপ্তির দোলাচল। তবে এ প্রশ্ন আমার নিজের কাছেও থেকে যায় যে, এমন রদবদলে পাঠকের কাছে কতটা দায়ী থাকব। তবে ‘কালকেতু ও ফুল্লরা’র পরিমার্জনা খুবই কম। বড় ধরনের রদবদল নয়। বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করেছে ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ। প্রকাশনা সংস্থার দুই তরুণ জহিরুল আবেদীন জুয়েল ও আদিত্য অন্তরকে জানাই ধন্যবাদ।

সেলিনা হোসেন
২০.১.২০১৩

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

১

কালকেতু প্রাসাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, সূর্য ওঠেনি। গতরাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেনি। অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো কিছু একটা দেখেছিল, কিন্তু তা কী এখন সেটা মনে করতে পারছে না। ও ভাবল, সে কারণে ঘুম ভেঙে যাওয়া উচিত হয়নি। কোনো কারণ ছাড়া ঘুম ভেঙে যাওয়াতে নিজের ওপর রাগ হয়। ও স্পষ্ট এবং নীতিবান লোক, কঠোর নিয়ম মেনে চলে। নিয়মের ব্যতিক্রম পছন্দ করে না। সময়মতো ঘুমানো, সময়মতো খাওয়া এবং সময়মতো প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন না হলে ও নিজেকে শাস্তি দেয়। শাস্তির নিয়মগুলো অদ্ভুত। যেমন ঘরের দরজা-জানালা আটকে দিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দম আটকে আসতে চাইলেও শ্বাস ফেলে না। বুকে ব্যথা শুরু হয়, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, গলার রগ ফুলে ওঠে। এই ধরনের আরো কতগুলো নিজস্ব পদ্ধতি আছে ওর। এটা ওর গোপন অভ্যেস। এ অভ্যেসের কথা ফুল্লরাও জানে না। ও মনে করে এ অভ্যেস বজায় রাখতে পারলেই চারপাশের লোকজনকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবে। নিয়মমাফিক ওদের ডান এবং বাম পা উঠবে। ডানে তাকাতে বললে ডানে তাকাবে এবং বামে তাকাতে বললে বামে। নইলে সোজা দৃষ্টি নাকের ওপর পর্যন্ত যেতে পারবে, এর বাইরে একটুও নয়। ও যাদের নিয়ে এ নগর চালায় তারা ওর কথায় ওঠে বসে, কান ধরতে বললে কান ধরে, হামাগুড়ি দিতে বললে হামাগুড়ি দেয়। কালকেতু ওদের নিয়ে যা খুশি তা করতে পারে। এ জন্য ও খুশি।

ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে ওর মন প্রফুল্ল হতে শুরু করে। ফেলে আসা ব্যর্থ জীবনের কথা মনে পড়ে, এই মনে পড়া ওর জীবনযাপনের সঙ্গী, ও লালন করতে ভালোবাসে। অরণ্যে শিকার করতে গেলে এমন মধুর বাতাসে নিজেকে খুব তরতাজা সতেজ জোয়ান মনে হতো। মনে হতো অনেক কিছু করার আছে, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। দেবী আশীর্বাদে ও পথ খুঁজে পেয়েছে, অনেক কাজ করছে। নগরীর ফোয়ারা খুলে দেওয়া হয়েছে। রুপোলি জলের ধারায় ওর নিদ্রাহীন দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ও বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে বসে চোখ বোজে। আহ্ শান্তি! অথচ ওর শান্তি সহ্য হয় না দুষ্ট লোকের। ওরা কেবল বাজে কথা রটনা করে। বলে, নগরীর আইনশৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়েছে। খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, মাস্তানি, চুরি-ডাকাতিতে বিপর্যস্ত নাগরিক জীবন। কালকেতু উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে। ভাবে, অসম্ভব, এ হতে পারে না। এ নগরকে আমি তিলোত্তমা করে গড়েছি। ওরা যা বলে, মিথ্যা বলে। আমার এই স্থিতির রাজত্বকাল ওদের অসহনীয়। কলিঙ্গ নগর

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমার প্রাণ। ঐসব দুর্মুখদের আমি আবর্জনায় নিক্ষেপ করব। প্রয়োজনবোধে আমার এ নগর থেকে আমি ওদের বহিষ্কার করব। আমি বাজে সমালোচনা সহ্য করি না।

এতক্ষণে নিজের ভেতরে স্বস্তি ফিরে পায়। ও ধীর পায়ে পায়চারি করে। বুকে তৃপ্তি, হৃদয়ে সুখ, গলার কাছে প্রবল আবেগের সুড়সুড়ি। এই ভোরবেলাতেও ওর নাকের ডগায় ঘাম জমেছে, বেশি তৃপ্তিতে ওর এমন হয়। ও মনে মনে দেবীকে প্রণাম জানায়। এতকিছুর মধ্যে ওর একটাই দুঃখ যে ওর সন্তান নেই। মুহূর্তে এই প্রাসাদ এবং যতদূর চোখ যায় কলিঙ্গর শস্য শ্যামল প্রান্তর বিরান মনে হয়। যেন পুড়ে ধূসর হয়ে গেছে প্রকৃতি, নদীতে পড়েছে চরা, দুগ্ধবতী গাভী আর দুধ দেয় না, মানুষের মুখে হাসি নেই। কালকেতুর মনে হয় সুখে এবং দুঃখে এভাবেই উলটেপালটে যায় কলিঙ্গ। ফুল্লরা দিন দিন মুটিয়ে যাচ্ছে, শরীরের চারদিকে চর্বি বাড়ছে। ওর পোষা শুয়োরগুলোর মতো হয়ে যাচ্ছে ফুল্লরা, কুতকুতে দৃষ্টি, থলথলে মাংস। অথচ ব্যাধ জীবনে ও যখন মাংস ফেরি করে ফিরত তখন কেমন টানটান ছিল ওর শরীর। বেরুলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত ওর যৌবন। অদ্ভুত মোহনীয় ছিল ওর হাসি। হাটের দিনের সন্ধ্যায় অন্ধকারে আড়ালে দাঁড়িয়ে কালকেতু নিজেই শুনেছে অন্যদের কথা। বলছে, কালকেতুর বউটা একটা বাঘিনী। অন্যজন বলে, দূর কী যে বলিস, বাঘিনী নয় কচি বেতের ডগা। ধাম করে বুকে এসে আঘাত করে। লাল দাগ ফুটে ওঠে, চড়চড়িয়ে বিষ নামে রক্তে।

এসব শুনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দেয় কালকেতু। ও বোঝে যে ওর রাগ করা উচিত, যারা এসব বলে তাদের মুখের ওপর কিছু বলা দরকার, কিন্তু ও রাগতে পারে না। ফুল্লরার শরীরের এমন উপমা ওর ভালোই লাগে। তবু তো ফুল্লরা সবার আলোচনার বিষয়। কালকেতুর ইচ্ছে ওর সবকিছুই মানুষের চোখে লেগে থাকুক, ঠোঁট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসুক। ওর দোষ এবং গুণের কীর্তনে মানুষের জিহ্বা অনবরত নড়ুক।

দোষ? কালকেতু বারান্দার মাঝখানে থমকে দাঁড়ায়। না, এখন ও নিজের কোনো দোষ দেখতে পায় না। নগর পত্তনের পর থেকেই তো ওর আর কোনো দোষ নেই। ও মনে করে, যে এমন একটি কীর্তি স্থাপন করতে পারে তার কোনো দোষ থাকতে পারে না। তবু ও বোঝে যে ও আঁটকুড়ে বলে লোকে ওর নিন্দে করে। জিনিসটা মনে এলেই ও সঙ্গে সঙ্গে সেটা উড়িয়ে দেয়। যেখানে ওর ঘাটতি সেখানে কোনো আপস নেই। ও রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায়। বাগানে চমৎকার ফুল। মালী কাজ করছে। ইচ্ছে করে একবার নেমে যেতে, কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে শাসন করে। ফুল, পাখি, রংধনু, মেঘ ইত্যাদির পেছনে আবেগ ছোটানো ওর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। ও এসব পছন্দ করে না।

যেমন পছন্দ করে না ফুল্লরার প্রসাধন চর্চা। এখনকার ফুল্লরা একদম কৃত্রিম। মুখে হাসি নেই, হাসতে বাধ্য হচ্ছে। ওর প্রসাধনচর্চিত মুখে দীপ্তি নেই, পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করেছে তা। কাজলটানা

https://boierhut.com/fb

চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। ও যখন কথা বলে তখন মনে হয় দূরের কেউ। ও এখন শকট ছাড়া নগরের রাস্তায় বের হয় না। কালকেতুর জানতে ইচ্ছে করে যে এখন সেইসব সাধারণ মানুষ ফুল্লরাকে দেখে কী বলে। কিন্তু জানার উপায় নেই। এখন আর নগরের কোথাও হাট বসে না। সোডিয়াম আলোতে নগরের অন্ধকার দূর হয়ে গেছে এবং কালকেতু দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। ও হাঁটতে হাঁটতে শোবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ফুল্লরা এখনো ঘুমুচ্ছে। নিজে থেকে না উঠলে কেউ ওকে ডেকে ওঠায় না, এটা নিয়ম। তাতে ফুল্লরা ভীষণ রেগে যায়। ও রেগে গেলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে এ বাড়িতে। জিনিসপত্র ভাঙচুর হয়। কাপড়চোপড় কেটে কুচি কুচি করে ছড়িয়ে ফেলে। সেইসব শাড়ি ও নির্দ্বিধায় কেটে ফেলে যেটা মাত্র দুদিন আগে কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ে নগরের সেরা তাঁতি বুনে দিয়ে গেছে। ব্যাধ জীবনে কালকেতু ওকে একসঙ্গে তিনটে শাড়ি কিনে দিতে পারেনি। ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ, মৃদু আলো জ্বলছে। সারারাত এই আলো জ্বলে। কালকেতু হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। গতকাল ফুল্লরার জন্মদিন ছিল। প্রাসাদে উৎসব গেছে। রাত বারটা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। প্রচুর খাবার এবং পানীয় ছিল। যে যতক্ষণ পেরেছে খেয়েছে, কোনো মানা ছিল না। ভিন দেশের নগর অধিপতিদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল কালকেতু। সবাই এসেছে। দামি উপহার এসেছে ফুল্লরার জন্য। খাবারের আয়োজন দেখে বিদেশিদের চোখ গোল হয়ে ওঠে। কালকেতু স্পষ্ট শুনেছে যে কেউ কেউ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছে, কে বলবে এটি একটি গরিব নগর। কী চমৎকার সব ব্যবস্থা! কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। বিদেশিদের সঙ্গে যেসব সাংবাদিক এসেছে প্রচুর খেয়ে তারা উচ্ছ্বসিত। কালকেতুর অতিথি ভবন দেখেই ওরা অভিভূত হয়েছিল। রাজপ্রসাদ দেখে ওদের মূর্ছা যাবার জোগাড়। কালকেতু সাংবাদিকদের বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে। ঠিক করেছে যাবার সময় পাটের কার্পেট উপহার দেবে। কালকেতুর ইচ্ছে ভিন নগরেও ওর মাহাত্ম্য প্রচারিত হোক। ওদের পত্রিকাগুলো ওর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠুক। শোবার ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলে, আমি প্রচার চাই। সাংবাদিকরা দেখুক আমি কেমন নগর গড়েছি, ওরা পঞ্চমুখে বলুক যে আমার নগরে সুখের বন্যা। এখানকার মানুষের ঘরে খাবার না থাকলে কী হবে ডাস্টবিনে খাবার উপচে থাকে। যে কেউ যত ইচ্ছে খুঁটে খেতে পারে। আমি একটি লোককেও না খেয়ে মরতে দিই না।

ও পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় গতরাতের বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো ভাঁড়ে করে নিয়ে যাচ্ছে ডাস্টবিনে ফেলার জন্য। লোকগুলো করিৎকর্মা। ওর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। কালকেতু গর্বের হাসি হাসে। ওর নির্বাচন ভুল হয় না। যাদের ও নিজের চারপাশে নিযুক্ত করে তারা ওর অত্যন্ত অনুগত। এমন লোকই ও চায়। এতক্ষণে রাস্তার পাশের ডাস্টবিনগুলো খাবারে ভরে গেছে। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সেখানে ভিড় জমিয়েছে, কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে জুটেছে কুকুর এবং কাক। দৃশ্যটা চিন্তা করে ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ভাবে, এভাবে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

খেতে দিলে পরবর্তী প্রজন্ম ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ে থাকবে। কেউ আর মাথা তুলবে না। আত্মতৃপ্তিতে ভরে যায় মন। এভাবেই নানা কৌশলে জীবনভর ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। কৌশল না জানলে জীবনটাই বৃথা। ও বোঝে যেটুকু জনসাধারণকে বলবে এবং যেটুকু তাদের জন্য করবে তার মধ্যে গভীর অর্থ থাকতে হবে। সে অর্থ হবে কৃতকাজের একদম বিপরীত। বিদ্যুতের মতো খেলবে মাথা, সে বিচ্ছুরিত আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে থাকবে সাধারণ মানুষের। ওরা বুঝতেই পারবে না যে কোথা দিয়ে কী হচ্ছে।

দেয়াল ঘড়িতে ছয়টা বাজে। ও ব্যায়ামের ঘরে আসে। রোজ সকালে ও এই ঘরে কিছুক্ষণ শরীর নাড়াচাড়া করে। যতক্ষণ বাম পা এবং ডান পা ওঠানামা করে। এটা ওর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। ব্যাধ জীবনে এমন করত। অভ্যেসটি ধরে রেখেছে, তাতে শরীর ঠিক থাকে। কেউ বুঝতে পারে না যে কালকেতুর বয়স কত। কখনো মনে হয় চল্লিশ, কখনো পঞ্চাশ, কখনো পঁয়ত্রিশ, কখনো পঁয়ষট্টি। ও যখন নগরের চত্বরে ভাষণ দিতে দাঁড়ায় নগরের নারীকুল বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এসব দেখে ফুল্লরা রেগে যায়। বলে, মিনসের যত কূটচাল। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, বহুরূপী একটা। কালকেতু অনায়াসে ফুল্লরাকে সামলে নেয়। কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, ধীরে সখী ধীরে। কী যে জাদু জানে কালকেতু। ফুল্লরার ফোঁস করে তোলা ফণা নিমেষে নেমে যায়। চোখ জলে ভরে ওঠে। কালকেতুর বুকে মাথা রেখে চোখের জল ফেলে। কালকেতু তৃপ্তির হাসি হাসে।

শরীর ঠিক রাখার জন্য ও গলফ খেলে, দামি খেলা। নগরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এ খেলা খেললে কালকেতুর মাথা যেমন খোলাসা হয়, শরীর তেমন ঝরঝরে লাগে। বল যখন গর্তে ঢুকে যায় তখন ওর মনে হয়, আহা কী আনন্দ, আনন্দের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন বুদ্ধির উদ্ভাবন হয়। ইদানীং ব্যায়ামের সঙ্গে ও আর একটি জিনিস যুক্ত করেছে। ওর শ্বাসক্রিয়া জটিলতামুক্ত রাখার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকের ডানদিকের ফুটো বন্ধ করে বামদিকের ফুটো দিয়ে গভীর করে শ্বাস টানে। তারপর একটুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে ডানদিকের ফুটো দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ে। আবার বামদিকের ফুটো বন্ধ করে ডানদিকের ফুটো দিয়ে শ্বাস টানে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চালাতে থাকে। ও দীর্ঘজীবী হতে চায়। ক্ষমতায় টিকে থাকার ওর খুব খায়েশ। দ্রুত মরে গিয়ে এই তিলোত্তমা নগর ও অন্যের হাতে তুলে দিতে চায় না। সেজন্য স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণ কালকেতুর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ব্যায়াম ঘর থেকে বেরুতেই দেখল ফুল্লরা ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। চোখমুখ ফোলা, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। কালকেতুর সঙ্গে চোখাচোখি হলে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। কালকেতু বুঝল ফুল্লরা এখন নিজের মধ্যে মগ্ন। গায়ে হীরের গহনা, ঝকমক করছে দ্যুতি। লম্বা ঝুল সাদা সার্টিনের জামা গায়ে। রাতদিন রানীর মতো সেজে থাকতে ভালোবাসে। এই হীরের

https://boierhut.com/fb

গহনা নগরবাসীর পক্ষ থেকে ফুল্লরার জন্মদিনের উপহার। ভাঁড়ু দত্ত এসব ব্যাপারে পাকা। নতুন ট্যাক্স বসিয়ে সাতদিনের মধ্যে তা আদায় করে ফুল্লরার জন্য হীরের গহনার ব্যবস্থা করেছে।

কালকেতু চোখ কুঁচকে বলে, তোমাকে রাজনর্তকীর মতো লাগছে। ফুল্লরা মুখ ঝামটা দেয়, মিনসের কেবল বাঁকা চোখে দেখা। রাজমহিষী বলতে পার না?

আহা সই! যেমন বিলোল কটাক্ষ, তেমন ওষ্ঠের মদিরা, মরে যেতে সাধ হয়।

হুঁ, বলে ফুল্লরা ঘরে প্রবেশ করে। দামি সুগন্ধি ছড়িয়ে থাকে পুরো বারান্দায়। কালকেতু বুকভরে শ্বাস নেয়। ফুল্লরার সঙ্গে এই ছলনা তার প্রতিদিনের রুটিনের অংশ। দিনের কোনো না কোনো সময় সে এ ধরনের কথা একবার বলে। এটাও তার কৌশল। ও ধীর পায়ে স্নানঘরে যায়। আজ অনেক কাজ। স্নান করতে করতে কালকেতুর মাথায় একটি নতুন বুদ্ধি আসে। ভাবে, এখন থেকে নিয়ম করে দেবে যে সবাই একরকম পোশাক পরবে। কেমন হবে? মানুষকে একই ঘোড়ার নিচে জুতে দিতে হলে অনেক কিছু এক করতে হবে, অন্তত বাইরের আবরণটি তো বটেই। মাথায় প্রচুর পানি ঢেলে ও নিজের উত্তেজনা রোধ করে। কারণ গরিব লোকের পোশাক ওর নিজের করে দিতে হবে। ওরা পোশাকের টাকা পাবে কোথায়? হয়তো একটা বিশৃঙ্খলা হতে পারে। তার চেয়ে আপাতত স্থগিত থাক এই আইডিয়া। তা ছাড়া তীরন্দাজ বাহিনীর নির্ধারিত পোশাক আছে। ওরা আপত্তি জানাতে পারে। তীরন্দাজ বাহিনী কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হোক এটা ওর কাম্য নয়। ঐ বাহিনী গড়ে তুলতে ওর প্রচুর শ্রম দিতে হয়েছে। নানাকিছু দিয়ে বশ করার পর এখন ওরা একদম অনুগত। ওদের নিয়ে ওর আর কোনো ভয় নেই। কালকেতু মাথায় জল ঢালা শেষ করে। আজ ও বাথটাবে এলিয়ে পড়েনি। ভালো লাগছিল না। জলপাই রঙের সবুজ বাথটাব ফুল্লরার খুব প্রিয়। ফুল্লরা অনেক সময় লাগিয়ে স্নানঘর থেকে বের হয়। তখন ওর ত্বক মাখনের মতো পেলব হয়ে যায়। এই ত্বক ঠিক রাখার জন্য ফুল্লরা প্রচুর সময় ব্যয় করে। সংসারে শিশু নেই বলে নিজের প্রতি ওর এই যত্ন। শিশুর জন্য ফুল্লরার তেমন ব্যাকুলতাও নেই। কালকেতুর বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ও স্নানঘর থেকে বেরিয়ে শরীরে দামি সুগন্ধি ছড়িয়ে কাপড় পরে।

টেবিল ভর্তি সকালের খাবার তৈরি হয়ে আছে। পায়েস থেকে ধোঁয়া উড়ছে, চমৎকার গন্ধ আসছে। চারপাশে বয়-বাবুর্চি দাঁড়িয়ে আছে। ওরা চোখের ইশারায় সব কথা বুঝে যায়, এমনই ওদের প্রশিক্ষণ। কোলের ওপর ন্যাপকিন বিছিয়ে কাঁটাছুরি তুলে নেয় হাতে। প্রথমে একটি ডিম পোজ খায়, তারপর এক টুকরো মুরগির মাংস এবং কিছু মটরশুঁটি ভাজা। সারা বছর মটরশুঁটি চাই কালকেতুর। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখে কাজের লোকেরা। দুচামচ ফিরনি খেয়ে ওর ভালো লাগে। আর এক চামচ খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু খায় না। তাতে নিয়ম ভঙ্গ হবে। কালকেতু নিজের ইচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করে। আট থেকে দশটা আঙুর আছে ওর সামনে, সঙ্গে দুটুকরো আপেল। এরপর এক কাপ কড়া কালো কফি। কালকেতু বেশি খায় না। খেলে ফিগার

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নষ্ট হবার সম্ভাবনা। শরীরে মেদ জমা ওর একদম অপছন্দ। ফুল্লরা সকালে খাবার টেবিলে থাকে না। কালকেতু একা খায়। একা খেতেই ওর ভালোলাগে। রাতে বিছানায় ছাড়া ফুল্লরার সঙ্গে ওর তেমন একটা দেখা হয় না। বিছানাতে ফুল্লরার মেদসর্বস্ব শরীর ছুঁতে ওর কখনো ঘেন্না হয়। জীবনের শুরু থেকে আজকের এই অবস্থানে এসে ও ফুল্লরা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এখন ওর জন্য শারীরিক এবং মানসিক কোনো টানই অনুভব করে না। গত সপ্তাহে ফুল্লরা সোনার কারুকাজ করা জামদানি বানিয়েছে। নগরের সেরা তাঁতি ওর নির্দেশে বানায় শাড়ি। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি হয় ফুল্লরার জুতো, এ ছাড়া আরো কত ধরনের সেরা চামড়া দিয়ে জুতো বানানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে জুতো কারখানার লোকেরা। কালকেতু কফি শেষ করে ঠক করে টেবিলের ওপর কাপ রাখে। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। ও জানে, ফুল্লরা কালকেতুর পোষা প্রাণীর মতো হেলেদুলে চলে। মানুষকে পায়ের নিচে চেপে রাখতেই ওর যত আনন্দ।

একতলায় নেমে অফিস ঘরে আসে ও। এখানে সকালে ঘণ্টাখানেক বসে। ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে গোপন আলাপ হয়। ভাঁড়ু দত্ত প্রতিদিন নগরের খবর নিয়ে আসে। আজো এসে বসে আছে। কালকেতু চেয়ারে বসলে ভাঁড়ু দত্ত পদচুম্বন করে, এটা ভাঁড়ুর অভ্যেস। পদচুম্বন করতে না পারলে সারাদিন ওর খারাপ যায়। কোনো কারণে কালকেতুর সঙ্গে দেখা না করলে কিংবা কালকেতু ভিন দেশে থাকলে ভাঁড়ু দত্তের দিনগুলো খুব খারাপ কাটে। ওর ভাষায় এটা ওর দুর্যোগের সময়। রাস্তাঘাটে কেউ কখনো যদি জিজ্ঞেস করে, কেমন আছেন দত্ত মশাই? ও অবলীলায় বলবে, দুর্যোগের মধ্যে আছি। প্রথম প্রথম ওর মুখে দুর্যোগ শুনে সবাই চোখ বড় বড় করে তাকাত, কেউ কেউ সহানুভূতি জানাত। এখন সবাই বোঝে ভাঁড়ু দত্তের দুর্যোগ কী। ও ঘোষণা দিয়ে বেড়ায় যে, কালকেতুর জন্য সব করতে পারে। এমনকি মেথর হতেও রাজি। কালকেতু বললে ও দিনভর নগরের রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে সাফ করতে পারে। কালকেতুর চোখের দিকে তাকিয়ে ও কথা বলে না, পাছে কালকেতু রুষ্ট হয়। সেজন্য কালকেতুকে ও কখনো সঠিক খবর দেয় না। কিছু গোপন করে, কিছু আড়াল করে, সেভাবে বলে। আজো শুকনা মুখে এসে বসে। ফুল্লরার হীরের গয়না বাবদ যে কর তুলেছে সেজন্য নগরের অনেক প্রজা ক্ষুব্ধ, অনেকে কর দিতে রাজি হয়নি। যারা দেয়নি তাদের নাম লিখে রেখেছে ও। দেখে নেবে একহাত। কিন্তু কালকেতুকে এসব কিছুই বলা যাবে না। কারণ কালকেতুকে দিয়ে সে নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। কালকেতুর জন্য যা কিছু করে সেখান থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা আয় হয় ওর। ইদানীং ও ভিন দেশের ব্যাংকে টাকা জমানোর স্বপ্ন দেখছে। ভাঁড়ু দত্ত মোচ পাকায়। আগামী পরশু বাজার থেকে কিছু টাকা ওঠানোর কথা আছে। দোকানিদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ওঠায় ও। দোকানিরা এ নিয়ে ক্ষুব্ধ। কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত পরোয়া করে না। নিজেকে রক্ষা করার জন্য ওর নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী আছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তার ওপর কালকেতু ওর পক্ষে। ওর অন্যায়ের দায়িত্ব কালকেতুর। ফলে ও এই ধরণীতে একটি স্বর্গ বানাতে চায়।

নিজের ভাগ্যকে নিজেই ঈর্ষা করে ভাঁড়ু দত্ত। কালকেতু কলিঙ্গ নগর পত্তনের পর কত রকম ভেট দিয়ে আজ ও এই অবস্থানে এসেছে। অবশ্য ওকে তেমন পরিশ্রম করতে হয়নি। ভেটই ছিল প্রধান। কালকেতুর পরিষদ গঠনের জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল অনেক। তাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভাঁড়ু দত্তকে বাদ দিতে পারেনি ও, সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়েছে। এখন ওর জমজমাট অবস্থা। আড়ালে ওকে কেউ কেউ কালকেতুর জারজ সন্তান বলে, তাতে ওর কিছু এসে যায় না। ওর জীবনে অর্থ এবং প্রতিপত্তিটাই সব; আত্মসম্মানের প্রয়োজন নেই। ও লেখাপড়ার ধার ধারে না, সংস্কৃতি কি বোঝে না, নগরের জন্য ওর ভালোমন্দ বোধ নেই। কেউ যদি বলে এই নগর আমাদের দিয়ে দাও, তোমাকে ভূস্বর্গ গড়ে দেব, পারলে তাতেও ও রাজি হয়ে যায়। ওর কোনো কষ্ট নেই। ওর কোনো নীতিবোধের বালাই নেই। ও এসব পছন্দও করে না। ওর মতে আবেগের প্রশ্রয় তারাই দেয়, যাদের মাথা ঠিকমতো কাজ করে না। আর নীতি? এটা এক ধরনের অসুখ। যাদের আছে তাদের জন্য কোনো ওষুধ নেই। তারা সারা জীবন কাতরায়। নিজেরাও জীবন্মৃত হয়ে বাঁচে, অন্যদেরও সেভাবে বাঁচতে বলে। কালকেতু এমন মানুষ নয় বলে কালকেতু ওর প্রিয় মানুষ।

আজো পদচুম্বন করে ও কালকেতুর পায়ের ধুলো নিজের চুলে মেখে নেয়। ঠোঁটে এক ধরনের হাসি ধরে রাখে যার অর্থ কালকেতু নিজেও কখনো বুঝতে পারে না। ও ভেবে দেখেছে যে ভাঁড়ু দত্তের হাসির রং আছে। সে রং কখনো চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল, কখনো ধূসর, বিবর্ণ, কখনো শকিং কালার, যার অর্থ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং চাতুর্যপূর্ণ। আজ ওর হাসি ফুল্লরার হীরের গহনার মতো দ্যুতিময়। ভাঁড়ু দত্তের কালো গাত্রবর্ণের সঙ্গে স্ফটিক স্বচ্ছ দাঁতের হাসিতে সকালটা মনোরম মনে হয় কালকেতুর। অর্থাৎ কালকেতু বুঝে যায় যে আজ সর্বত্র মঙ্গল, খবর ভালো। ভাঁড়ু দত্ত এভাবেই কালকেতুর দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটায়, ও কখনই সঠিক খবর জানতে পারে না। কালকেতু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, সব কুশল তো?

কলিঙ্গ নগরে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত জনপদের সবখানে মঙ্গলের ঘণ্টাধ্বনি। বঙ্গোপসাগরে বয়ে যাচ্ছে সুখের স্রোত, সুন্দরবনের পাতায় পাতায় সুখের রশ্মি, আপনার কোনো ভাবনা নেই। নগরের রাজপথে সুখী মানুষেরা পথ চলছে।

আহ্ কী শান্তির কথা!

কালকেতু আরামে চোখ বোজে। চেয়ারের গায়ে মাথা হেলিয়ে দেয়। ভাঁড়ু দত্ত দাঁড়িয়ে থাকে। প্রভুকে শান্তি দিতে পেরেছে, আজ ওর পরম সৌভাগ্যের দিন। অনবরত নিজের দুহাতের তালু ঘষতে থাকে। নাকের ডগায় স্বেদ বিন্দু জমে মুক্তার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কালকেতু চোখ বুজেই হাত ওঠায়, অর্থাৎ আজ এই পর্যন্ত। ভাঁড়ু দত্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। কোনো শব্দ নেই। কালকেতুর

https://boierhut.com/fb

অফিস ঘরে নীরবতা। ও পা দোলায়। বাইরে শকট তৈরি, একটু পরে বেরুবে ও। কিন্তু কিছুতেই চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না। কেবলই সেই একটি দিনের কথা মনে পড়ে যেদিন ও একজোড়া শূকর কেনার জন্য দূরে গাঁয়ে যাচ্ছিল। সেদিনের ছবিটি এমন : দেবীর ইচ্ছেয় কালকেতু এখন শাপগ্রস্ত জীবনযাপন করছে। ও দরিদ্র গ্রামের দরিদ্র অধিবাসী, পেটে ভাত নেই, পরনে নেংটি। ও শিকার করে জীবনযাপন করে। ওর অনেক দিনের শখ একজোড়া শূকর কিনবে। তাই ও যাচ্ছে পাঁচ ক্রোশ দূরের গ্রামে। খবর পেয়েছে ওর বন্ধু নটবরের খোঁজে ভালো শূকর আছে। নটবর হিসেবি লোক, দরদামে পাকা। কালকেতুর ঠকে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অনেক দিন ধরে মাংস বিক্রির টাকা জমিয়েছে শূকর কেনার জন্য। চিত্তে যতই সুখ থাক, ও ক্ষুধার্ত। পিঠের ওপর শরাধারের ওজনও আর বহনযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। দীর্ঘপথ একটানা পরিভ্রমণে ও শ্রমক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসা কাতর। তাই ধনুক আর তূণ রেখে ও বিশাল গাছের নিচে শায়িত, প্রলম্বিত শ্বাসের কারণে ওর বুকের খাঁচা ওঠানামা করছে। কালকেতুর শরীর উদোম, পাঁজরের কাঠিগুলো গোনা যায়। তার চারপাছে অর্জুনের কালো বর্ণের বিচি পাথরে নুড়ির মতো সবুজ ঘাসের ওপর জড়িয়ে আছে। ওগুলো তাজা ফল হলে কালকেতু কতগুলো খেয়ে ফেলত। মৃদুমন্দ বাতাস ওর ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছে। বাতাসের মর্মরে অস্ফুট ধ্বনি, যেন বলছে, ঘুমোও কালকেতু, ঘুমোও। ওর চোখ বুজে আসে, কপালের ওপর হাত। ওর চৈতন্য রহিত হবার আগে মনে মনে বলে, সবই দেবীর ইচ্ছে।

অতীত জীবনের এইসব স্মৃতিচারণ কালকেতুর প্রতিদিনের রুটিনের অংশ। পরিষদের সঙ্গে জরুরি মিটিঙে, নগরের কেন্দ্রস্থলে নাগরিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেবার সময় কিংবা তিন দেশের অতিথির সঙ্গে আলোচনার সময় কখনো এ স্মৃতিচারণ ওকে বিপর্যস্ত করে। এমনকি স্ত্রী কিংবা সুন্দরী নারীর সঙ্গ উপভোগের সময়ও এই স্মৃতিচারণ ওর বীর্যপাত রুদ্ধ করে দেয়। ওর প্রচণ্ড মাথা ধরে এবং ক্লান্তি বোধ করে।

২

রাতে ঘুমুতে পারে না মজিদ। প্রায় মাঝরাতে কোথায় যেন শব্দ হয় কিংবা আর্তনাদ ভেসে আসে অথবা কিছু লোকের হৈচৈ উঠে অল্প সময়ে মিলিয়ে যায়। কর্কশ স্বরে কারা যেন অন্যদের ধমকায়। ধুপধাপ মিলিয়ে যায় পায়ের শব্দ, তারপর সব নিঝুম। বিছানায় উঠে বসে থাকে মজিদ। প্রতি

https://boierhut.com/fb

রাতেই এমন হয় এবং তা মজিদের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সকালে ওর চোখ লাল হয়ে থাকে, চুল উস্কোখুস্কো, দৃষ্টি বুনো পশুর মতো গোঁয়ার এবং একরোখা হয়ে ওঠে।

মজিদ বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। গতকাল ছিল কলিঙ্গ নগরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সম্ভাব্য ব্যয় করে সাজানো হয়েছে নগরীকে। বিকেলে নগরের গোল চত্বরে বক্তৃতা করেছে কালকেতু। যে কথাটা ও প্রতি বক্তৃতায় বলে সেটা কালকেও বলেছে। বলেছে, এই নগরীকে তিলোত্তমা নগরী করবে। আরো ফোয়ারা তৈরি হবে, উদ্যান হবে, রাজপথ আলোকিত হবে। পুষ্পময় তরুলতায় ছেয়ে যাবে রাস্তার দুপাশ। বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হবে নগরের ভবনগুলো। কালকেতু আরো বলেছে, একমাত্র সৌন্দর্যচেতনাই পারে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগিয়ে রাখতে। মানুষ নগরের পার্কে খোলা বাতাসে ফুলের শোভায় চোখ রাখলে তার ফুসফুসে স্নিগ্ধ সতেজ বাতাস প্রবেশ করবে। তাতে মানুষের অর্ধেক অসুখ কমে যাবে। পুষ্পময় তরুলতায় চোখ রেখে পথ চললে মানুষের সব খিদে উবে যাবে। মজিদ ভাবল, এই সঙ্গে নেংটিপরা মানুষগুলোর শরীরে ফুল এবং পাতার পোশাক থাকলে নগরের সৌন্দর্য আরো বাহারি হবে। মজিদের মনে হল, কী যে সব মনোরম দৃশ্য। কালকেতু বক্তৃতার শেষে ঘোষণা দিয়েছে যে, নগরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি চমৎকার। এতদিন মজিদের মনে হয়নি, কালকেতুর বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে, এমন চমৎকার পরিস্থিতির জন্যই নগরের সুন্দর পাখিগুলো যেন কোথায় চলে গেছে। কেবল কাকের কর্কশ কণ্ঠ জেগে থাকে মগজে। সেটা যেমন অস্বস্তিকর তেমন ভয়াবহ।

এই চমৎকার নগরীর দুটো অংশ। একদিকে আছে সোডিয়াম লাইট শোভিত কার্পেটিং করা রাজপথ, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, লেক, উদ্যান, ফোয়ারা। অন্যদিকে রয়েছে অপ্রশস্ত সড়ক, ঘিঞ্জিমারা বস্তির বিস্তার, খোলা ম্যানহোল, আবর্জনার স্তূপ, মশার কামড়, সরু গলি, আলো-বাতাসহীন অবস্থায় মানুষের বসত। কালকেতুর স্বপ্নের নগর মজিদের চোখের কোণে কেতরের মতো জমে ওঠে। হাত দিলেই ময়লা টের পায় এবং সে ময়লা আঠার মতো লেগে থাকে চোখজুড়ে। চারদিকে এত ছাইপাঁশ যে দৃষ্টি মেলা যায় না। সে দৃষ্টি অনবরত সংকুচিত হতে থাকে। ওর চারপাশে কত মানুষের মুখ, বেশিরভাগ সময় চেনা মুখ অচেনা হয়ে যায়। সবার চেহারায় এক ধরনের ভণ্ডামি এবং শঠতা খেলা করে। প্রত্যেকে নিজেকে ধূর্ত ভাবে। মজিদ ব্যাকুল হয়ে একজন ভালো মানুষ খোঁজে। এই ব্যাকুলতার সময় ও চোখ বুজলে ব্যাধ কালকেতুকে দেখতে পায়। যে হরিণ শিকার করে কাঁধে ঝুলিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরত। কালকেতুর পেশিতে ছিল তাজা টগবগে জওয়ানকি, দৃষ্টিতে সারল্য এবং জিহ্বায় সততা। ও দেখতে পায় ফুল্লরাকে। যে মাংস ফেরি করে ফেরে, পরিশ্রমে যার বিমুখতা নেই এবং যার দৃষ্টিতে মিথ্যার আশ্রয় নেই। এই নগরের আবর্জনায় ক্লান্ত হলে ও কলিঙ্গের জঙ্গলে চলে যায়। ওর কৈশোর যৌবন আশ্রয় খোঁজে। মজিদ ভেবে পায় না যে এভাবে পালিয়ে ও কতদিন এই নগরে থাকতে পারবে? কত ও চোখ বুজে

https://boierhut.com/fb

থাকবে? চোখ বুজলেই তো হয় না, মনের পটে ভেসে ওঠে সেইসব ছবি যা ও প্রাণপণ চেষ্টায় মুছে ফেলতে চায়। পরশু দিন সকালে যুবতীর ক্ষতবিক্ষত ন্যাংটো লাশ পড়েছিল উত্তরপাড়ার ডোবায়। লোকেরা ভিড় করে দেখেছে সে লাশ। অফিস থেকে ফেরার পথে মজিদও দেখেছে। পিঁপড়েয় ভরে ছিল লাশের শরীরে, বড় বড় লাল রঙের পিঁপড়ে। লাশের চোখ উপড়ানো, স্তন কাটা, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসছে। মুখটা হাঁ করা, জিহ্বার অর্ধেক নেই। একটু পর কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনী এসে লোকদের সরিয়ে দেয়। মজিদ মাথার ভেতর এই দৃশ্য নিয়ে ঘরে ফেরে। ও ভাবে, কে বলে কালকেতু স্বর্গ থেকে অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে এসেছে? ও দেবীর বরপুত্র। ওকে খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এমনকি জনগণের রোষ পর্যন্ত স্পর্শ করে না। কালকেতু অনায়াসে ডিঙিয়ে যায় সব দুর্যোগ। শুধু দুর্যোগের ছোবলে গুঁড়িয়ে যায় সোনাবরুদের জীবন। সোনাবরুরা লাশ হয়ে ডোবায় ভাসে, বন্যায় ভেসে যায় দুর্ভিক্ষে গাছের নিচে পড়ে শুঁটকি হয়। যারা ওদের খুন করে তাদের কোনো বিচার হয় না। কারণ তারা কালকেতুকে পুজো দেয়। নগরের মানুষ এভাবেই জীবন কাটায়। মজিদ দিনপঞ্জি লিখতে ভালোবাসে। বড় কিছু লেখার ইচ্ছে ওর প্রবল, কিন্তু পারে না। ছোট করে শুরু করার বাসনায় ও দিনপঞ্জিতে নিজের উপলব্ধির কথা লেখে। যুবতীর লাশ দেখে এসে ও এইসব কথা লিখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

অফিসে মজিদ যেখানে বসে তার ডানদিকে একটি দরজা আছে। দরজাটা ও খুলে রাখতে ভালোবাসে। এই খুলে রাখার ও নানারকম ব্যাখ্যা করে। সে ব্যাখ্যায় ওর নিজস্ব দর্শন আছে বলে ও ভাবে। ওর অন্তর্গত ভাবনায় এই নগরের রাজনীতি, সামাজিক অবস্থান এবং অর্থনীতির পাশাপাশি ওর স্ত্রী রঞ্জনাও একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রশ্ন আকারের বাঁকা চিহ্নটি ওর হৃৎপিণ্ডে প্রবল থাবা, সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরে।

বৈশাখের কোনো একদিন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ধুলো এবং শুকনো পাতায় ভরে যায় ঘর। বাতাসে ওর টেবেল থেকে কাগজ উড়ে যায়, ওর চোখে কিচ্‌মিচ্‌ করে। তবুও ঠায় বসে থাকে। দৌড়ে আসে অন্যরা। তারেক ক্রুদ্ধস্বরে বলে, আপনার খামখেয়ালির খেসারত কি আমরাও দেব নাকি? দেখছেন কি হয়েছে চেয়ার টেবিলের অবস্থা? ধুলো আমার এলার্জি বাড়ায়। যত্তসব। মজিদের মুখের ওপর প্রবল হাঁচি দেয়। তারপর ঠাস করে দরজা বন্ধ করে। মজিদ কথা বলে না। সবাই জানে ও বলবে, যে পথে বাতাস আসে তা আটকে রাখতে নেই। এই মুহূর্তে এই কথাটা বললে অন্যরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ও চেয়ারে বসে বন্ধ দরজার কপাট থেকে চোখ সরাতে পারে না। মনে হয় এই বন্ধ দরজা কালকেতু এবং রঞ্জনা। জোর করে খুলে রাখার মধ্যে কোনো সত্য নেই। সেজন্য নিজ হাতে দরজা বন্ধ করতে চায় না ও।

দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে হু-হু করে বাতাস আসে। দালানের পেছন দিকে একটা বিশাল বহেড়া গাছ আছে, ডালপালা মজিদের দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত। ও পুরো গাছটা দেখতে পায় না ঠিক,

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু ডালগুলো দেখলে শীত-বসন্তে গাছটার পরিবর্তন টের পায়। শীতে পুরো গাছটা একদম ন্যাড়া হয়ে যায়। পত্রহীন বৃক্ষ ওর ভালো লাগে, আর কিছু না হোক একটা ভিন্ন ছবি তো। বসন্তে কচিপাতা টিয়া রং নিয়ে ফুটে ওঠে। এই অপরূপ দৃশ্যগুলো ওর আনন্দময় স্বস্তি। এর সঙ্গে কালকেতুর সৌন্দর্যচেতনার কোনো যোগ নেই। গাছটি আপনা-আপনি গজিয়েছে। গাছের শোভায় মজিদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। এটা নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই।

অফিসে ও যে ভবনে বসে তার পেছন দিকে আর একটা চারতলা ভবন আছে। দুই ভবনের মাঝখানে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা। ঐ ফাঁকা জায়গায় তিনটে কাঁঠাল গাছ আছে। ও নিরিখ করে দেখেছে যে দুটো গাছের পাতা গঠনের দিক থেকে দুরকম। আষাঢ় মাসে গাছের অর্ধেক পাতা কমলা রঙের হয়ে যায়। প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় ও জানালার শার্সিতে মুখ রেখে পাতাদের ভিজে যাওয়া দেখে। তখন ওর নথি খোলা থাকে না, প্রুফ দেখা থাকে না, এমনকি পাণ্ডুলিপি সংশোধনও না। কাঁঠালের সারির পরই একটা দেবদারু গাছ। চারতলা ভবন সমান উঁচু গাছটা ঘন সবুজ পাতায় অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ওর যখন কিছু করার থাকে না, তখন নির্নিমেষ ঐ গাছ দেখে। বাতাসে বহেড়ার শুকনো পাতা এসে ঘরের মধ্যে লুটোপুটি খায়। চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপির পাতা উড়ে গেলে কিংবা ফোন বেজে উঠলে ও নিষ্ক্রিয় থাকতে ভালোবাসে। জরুরি কাগজ উড়ে গিয়ে ওর চাকরিতে সাংঘাতিক কোনো ক্ষতি হোক কিংবা টেলিফোন বেজে বেজে থেমে যাক। যে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, ব্যক্তিগত কিংবা দাপ্তরিক কাজে, ওর কিছু এসে যায় না, ও তখন মানুষ থেকে দূরে থাকতে চায়—তারা সব ভীতিজনক এবং ভয়াবহ মানুষ। ওদের বুকের ভেতর হিংসার কুণ্ড আছে, সেখান থেকে অনবরত ধোঁয়া ওঠে। ওর দুঃখ যে ওর অভিজ্ঞতায় বিশাল মানুষ নেই। মাঝে মাঝে এ বোধে আক্রান্ত হলে ও খুব কষ্ট পায়।

ও মনে করে ওর স্বাভাবিক জীবন নেই—যে জীবন ঘুম ভেঙে যাওয়া থেকে ঘুমুতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন একইরকমভাবে গড়ায়। সে দিনগুলো পোকায় কাটে না, স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে না। ও অনবরত নিজের ভেতর গুটিয়ে যেতে যেতে নোনাধরা ফাটলে প্রবেশ করে, যেখানে মগজে ঘাস জন্মায় এবং এক ধরনের হলুদ ম্লান ফুল ফোটে। ও দেখতে পায় রঞ্জনা এক ধরনের পোকা হয়ে মুখ থেকে আঠালো লালা নিঃসরণ করছে। সে আঠায় সেঁটিয়ে যাচ্ছে ওর ত্বকের লালিত্য এবং হৃদয়ের যাবতীয় কোমল অনুভূতি। রঞ্জনা ওর স্ত্রী, বছর পাঁচেক আগে ওদের বিয়ে হয়েছে। বছর দেড়েকের একটি মেয়ে আছে। নাম মন্টি। এই নগরে রঞ্জনার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। ও কালকেতুকে নিয়ে তেমন ভাবে না। ওর ছোট সংসারের সীমিত গণ্ডিতে কালকেতু যে কোন অলক্ষ্যে প্রবেশ করে রঞ্জনা তা বুঝতে পারে না। ওর যা মেধা তাতে বোঝার কথাও নয়। ও বোঝে জীবনের উপরিভাগটুকু, তলানিটুকু নয়। এই বোঝার ভারে গুঁড়ো হয়ে যায় মজিদের হাড়মাংস।

https://boierhut.com/fb

মজিদের অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য ঘরে-বাইরে লোকে ওকে ভুল বোঝে। ও আগ বাড়িয়ে নিজের কথা ঘোষণা করতে পারে। প্রচারে ওর বিশ্বাস নেই। ও বিশ্বাস করে কাজে এবং সততায়। তাই লোকের চোখে ও কিছুটা অন্যরকম। কখনো দাম্ভিক, কখনো গোমরামুখো, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। ও মনে মনে হাসে। ও জানে এসবের ও কোনোটাই নয়। যে যা বলে বলুক, সেসব ওকে স্পর্শ করে না। অফিসে ওর সহকর্মীরা সুযোগ পেলে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না। ও যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে সেটা একটা কৌতুকের ব্যাপার। ও ফাঁকি পছন্দ করে না, হাতে কাজ থাকলে আড্ডা দেয় না। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রচণ্ড অস্বস্তিতে থাকে ও। পায়চারি করে, ঘন ঘন পানি খায়, সিগারেট পোড়ায়, কাগজ ছেঁড়ে ইত্যাদি বাজে অভ্যাস বেড়ে ওঠে। ও নিজেকে এসব থেকে মুক্ত করতে পারে না, মুক্ত করতে চায় না। ওর ধারণা এসব থাকা ভালো, তা হলে মানুষ থেকে আলাদা থাকা যায়। নইলে তো গড্ডলিকা স্রোতে এক হতে হয়। কালকেতুর নগরে মানুষ ভেসে যাচ্ছে, কুটো ধরার ইচ্ছে কারো নেই। মজিদের মাঝে মাঝে মনে হয় এ এক অদ্ভুত নগর। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই কেবল ধূর্ত মানুষের ঢল। কেউ ভালো কিছু চিন্তা করলে অন্যের চোখে গর্দভ হয়ে যায়।

অফিসে তারেক ওকে কর্মবীর ডাকে, ও গায়ে মাখে না। ইয়াসিন আর বশীর অনেক সময় ওদের কাজগুলো ওর ওপর চাপিয়ে দিয়ে অফিস থেকে কেটে পড়ে। ও মুখ বুজে সেসব কাজ করে দেয়। মানুষের অসুবিধাগুলো ও খুব দরদ দিয়ে বিবেচনা করে। কেউ যে ফাঁকি দিয়ে ওর ওপর কাজ চাপিয়ে দিতে পারে এটা ও বিশ্বাসই করতে চায় না। এর দায়ভারে পারিবারিক অশান্তি ঘনিয়ে ওঠে। রাত জেগে প্রুফ দেখলে রঞ্জনা ক্ষিপ্ত হয়, গালাগাল করে। ওর গালাগালের একটা শব্দ আছে, সেটা হলো বুড়োহাবড়া। রঞ্জনা যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রূঢ় কণ্ঠে বলে, বুড়োহাবড়া রাত দুপুরে জ্বালাতন শুরু করল, তখন ওর হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরে। ঐ শব্দটি হজম করতে ওর ভীষণ কষ্ট হয়। তবুও ইয়াসিন এবং বশীরের জন্য মাঝে মাঝে ও এইসব সহ্য করে। যদিও জানে ইয়াসিন এবং বশীর পেছনে বলে, ঐ শালা তো একটা বেকুব। ও মনে মনে হাসে এবং ভাবে, একদিন হয়তো আমার ভেতর অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে। আমি আমার উষ্ণ রক্ত দিয়ে লাভার মতো চারদিক প্লাবিত করে দেব।

আন্তরিকভাবে অফিসের সব দায়িত্ব পালন করার পরও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওর কাজের প্রশংসা পায় ওর বস হামিদুর রহমান। বড়কর্তা পর্যন্ত পৌঁছুনোর ক্ষমতা ওর নেই এবং আড়ালে থাকা ওর স্বভাবের অন্তর্গত বলে ওর কিছু হয় না। ওর ঘাড়ে পা রেখে হামিদুর রহমান দুটো ইনক্রিমেন্ট বাগিয়ে নেয়। ও শুধু অবাক হয় এই ভেবে যে, এজন্য হামিদুর রহমানের বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই, বরং ভাবে সবকিছু তার প্রাপ্য। মজিদ মরমে মরে যায়, ওর দিন খারাপ কাটে। ও তখন অফিস ভবনের উত্তর দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সামনে বিশাল বটগাছ। গাছটা কিছুটা

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিংবদন্তির মতো হয়ে গেছে, এটা কত পুরনো কেউ বলতে পারে না। চারদিকে অসংখ্য ঝুরি নেমেছে, গোড়ার চারপাশ বাঁধানো। নিচে দিয়ে টেরাকোটা করা, চমৎকার লাগে লাল ইটের টেরাকোটা। ও অবসরের টেরাকোটাগুলো খুঁটিয়ে দেখে। কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির এই অবদানের জন্য ও মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ করে। শীতে এই বটগাছ লাল ফলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অসংখ্য পাখি এসে এই ফল খায়। ফলের ভেতরে গুঁড়ি গুঁড়ি শাঁস গাছের নিচে বিছিয়ে থাকে। এই প্রিয় দৃশ্য দেখতে দেখতে ও মগ্ন হয়ে যায়। এইসব সৌন্দর্যের সঙ্গে কালকেতুর সৌন্দর্যচেতনার তুলনা হয় না। কালকেতু কৃত্রিম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চায়, তাতে দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয় কিন্তু প্রাণ শীতল হয় না। মজিদ আবার ফিরে যায় বটগাছের লালে। ভুলে যেতে চায় মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা। ওর মনে হয়, এইসব দৃশ্য আছে বলে মানুষের বেঁচে থাকা সহজ হয়।

মন্টি ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ। ও জানে না এই নগর মন্টিকে কতটুকু গ্রাস করবে। হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন ও মন্টিকে চিনতে পারবে না। ওর মুখটা হয়ে যাবে শঠ ও প্রতারকের। মন্টি কি পারবে এই নগরের গড্ডলিকা স্রোতের উলটো দিকে থাকতে? মজিদ করতলে মাথা রাখে। অনিশ্চিত কালো ভবিষ্যৎ ওকে ম্রিয়মাণ করে। তবু এই মুহূর্তে ও মন্টিকেই আঁকড়ে ধরে। একজন শিশুর অস্তিত্ব ধরে নিজের ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নিতে চায়। কিন্তু রঞ্জনা? সেখান থেকে ওর মুক্তি কোথায়? রঞ্জনাই বা কীভাবে বাঁচবে? মজিদ পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার কালো অক্ষরগুলোকে পোকা হয়ে যেতে দেখে। এমন ঘটতে থাকলে ওর মাথা গরম হয়ে ওঠে, নিজের ওপর ওর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। বিয়ের পরদিন মিলনের গভীর মুহূর্তে রঞ্জনা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল, না। পারব না। তুমি দেখতে আমার বাবার মতো।

বাবার মতো? রঞ্জনার অস্বাভাবিক দৃষ্টি এবং আচরণে ও বিমূঢ় হয়ে যায়। কী বলছ রঞ্জনা?

তোমার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য অনেক। আমার বান্ধবীরা বলেছে, তুমি আমার বাবার বয়সী। ওরা আমাকে নিয়ে হাসে।

তুমি বিয়েতে রাজি হলে কেন?

ভাইয়া বলেছে রাজি না হলে আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা যে আমার বোঝা আর বইতে পারে না।

ও।

মজিদের অনুভূতি গরম সিসায় পুড়ে যায়। ও রঞ্জনাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। ওর হাত কুঁকড়ে যায়, ওর শরীর আড়ষ্ট হয়ে থাকে, ওর হৃদয় টেরাকোটার মতো এক বিচিত্র শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। ভাইয়ের সংসারে দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে পীড়িত হয়েছে রঞ্জনা। ওর জন্মের মাস দুয়েক আগে বাবা মারা যায়, জন্মের বছরখানেক পরে মা। দশ বছর পর্যন্ত খালার কাছে বড় হয়েছে। তারপর ভাইয়ের সংসারে আসে। সংসার জীবনের শুরুতে এই আপদ ভাবী ভালো চোখে দেখেনি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বঞ্চনা এবং অবহেলা ছাড়া রঞ্জনা কিছুই পায়নি। মজিদের সঙ্গে ওর বাইশ বছরের ব্যবধান। বান্ধবীরা ঠাট্টা করেছে বাবার বয়সী স্বামী বলে। ওরা বোঝেনি এই ঠাট্টা রঞ্জনার কতটা ক্ষতি করেছে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রথম অভিব্যক্তির প্রকাশ মজিদের ওপর হয়েছে। মজিদ কাছে এলেই ও ভয়ার্ত চোখে চেঁচিয়ে ওঠে। অন্যসময় স্বাভাবিক, ঘর-সংসার কাজ ঠিকঠাক মতোই করে। কিছুতেই বোঝা যায় না যে দীর্ঘদিনের মানসিক অবসাদে ও ক্ষুব্ধ, তিক্ত এবং রুক্ষ। ভাইয়ের সংসারে মুখ খোলার জো ছিল না। ভাবীর দোর্দণ্ড দাপট ছিল, ভাইও কিছু বলত না। এখন নিজের সংসারে ওর অর্গলমুক্তি ঘটেছে, সব আক্রোশ মজিদের ওপর ঝাড়ে। এক অদৃশ্য প্রতিশোধ নিতে চায় ওর ওপর। মজিদ বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে এই কি চেয়েছিল ও? একসময় রঞ্জনাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল ও। কিন্তু তাতে ও রাজি হয়নি। ও কিছুতেই আর ভাইয়ের সংসারে ফিরে যাবে না। একটু থেমে ও আবার বলেছিল, মজিদকে ও ভালোবাসে। শুধু কোনো বিশেষ সময়ে ওর ভেতরের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়।

মজিদ রঞ্জনাকে সহ্য করার চেষ্টা করে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফিস দিতে হয়েছিল বলে সামান্য ছুতোয় রঞ্জনার ভাবী রাগ ঝেড়েছিল ওর চুল কেটে দিয়ে।

এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে চুল ছেড়ে দিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে। লজ্জাও করে না? বেহায়া একটা! কেবল ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা? দেখাচ্ছি মজা।

কাঁচি দিয়ে কচকচিয়ে গোছা গোছা চুল কেটে ফেলার পরও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি ও। ফেলার উপায় ছিল না। শুধু শোকে পাথর হয়েছিল। সেই শোক এখনো ভুলতে পারছে না ও। তারপর থেকে যতদিন ভাইয়ের বাড়িতে ছিল নিজেই চুল কেটে ফেলত। এখন ওর চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমরে নেমেছে। কালো মসৃণ চকচকে চুলের গোছা অপূর্ব।

বিয়ের পরে সেই চুলে মুখ রেখে ও বলেছিল, অপূর্ব। এমন চুল কারো দেখিনি।

টপ্ টপ্ করে চোখ থেকে জল ঝরেছিল। তারপরও ও এই চুলের গল্প বলেছিল। মজিদ ভেবে দেখেছে যে, রঞ্জনার সবকিছুর পেছনে গল্প আছে। ওর দুঃখবোধ তীক্ষ্ণ। ও চটজলদি কোনোকিছু ভুলে যায় না বা হেসে উড়িয়ে দেয় না। ওগুলো ধরে রাখে এবং সে রোষে মজিদকে ছিন্নভিন্ন করে। ও নিজে একদিনের অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষায় আছে, রঞ্জনার জীবনে অগ্ন্যুৎপাত প্রতিদিন।

রঞ্জনার সঙ্গে জোর করে প্রথম মিলনে ও মজিদকে খামচে ধরেছিল। গেঞ্জি ছিঁড়ে ফেলিছিল এবং শেষে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। বিপর্যস্ত, বীতশ্রদ্ধ মজিদ ঠাস করে ওর গালে চড় মেরে বলেছিল, পাগলামি করার একটা সীমা আছে। নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ।

রঞ্জনা চেঁচিয়ে ওঠে, মরো, মরে যাও।

মরলে তুমি খুশি হও?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হ্যাঁ, হই, হই। আমি আর বাঁচতে চাই না।

আমি মরলে তো আবার ভাইয়ের সংসার...।

ভাইয়ের সংসার?

রঞ্জনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ দিয়ে আগুন ছোটে। বলে, আবার ভাইয়ের সংসার হলে সবাইকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব। নইলে ঘুমিয়ে থাকলে বঁটি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটব।

কথা বলতে বলতে ছুটে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় রঞ্জনা। মজিদ জানে ও এখন ঘণ্টাখানেক ধরে ভিজবে। শরীর ভিজিয়ে বসে থাকবে এবং অনবরত মাথায় পানি ঢালবে, ডাকলেও দরজা খুলবে না। বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলে ও এমন করে। মজিদ এসব মেনে নিয়েছে। মন্টি আসার পর ও কিছুটা শান্ত হয়েছিল। কিন্তু সেটা বড় সাময়িক। একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, ভাগ্যিস মন্টির ভাই নেই। আমি চাই না ওর কোনো ভাই থাকুক। মজিদের মনে হয়েছিল রঞ্জনার হাসি স্বাভাবিক নয়। ও আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। কখনো মন্টিকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলে, আমি মরে গেলে তুমি ওকে এতিমখানায় দিয়ে দিও। সৎমায়ের কাছে ফেল না।

মজিদ এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বুক ভার হয়ে যায়। মনে হয় কাঁদতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু কান্না আসে না। বিড়বিড় করে, এই মেয়েকে সহজ করা কি সহজ? উলটে ওর নিজের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত চুইয়ে যায়।

ছমাস বয়সে মন্টি একদিন খাট থেকে পড়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে রঞ্জনা, দেখো তো ওর কপাল কেটেছে কি না? মজিদ ওকে বুকে দোলাতে দোলাতে বলে, না কিছু হয়নি। বাচ্চারা সহজে ব্যথা পায় না।

না, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, দেখি আমাকে দাও।

মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে উলটেপালটে নানাভাবে দেখে রঞ্জনা। তারপর আশ্বস্ত হয়ে মেয়েকে নিয়ে খাটে বসে।

ওকে বুকে জড়িয়ে বলে, দেড় বছর বয়সে ছোটন একদিন খাট থেকে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে গিয়েছিল। ছোটন ওর ভাইয়ের ছেলে। তার সঙ্গে মন্টির কপাল কাটার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র না পেয়ে মজিদ চুপ করে থাকে। রঞ্জনা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ছোটনের কপাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কেটেছিল। এই দেখ এখানে কাটা চিহ্ন আছে।

রঞ্জনা কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দাগ দেখায়। মজিদ উৎসুক হয়ে বলে, কী করে হল?

ভাবী খাটে বসে সেলাই করছিলেন। ও খেলতে খেলতে হঠাৎ করে কীভাবে পড়ে গেল আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু ওর পড়ে যাওয়ার সব অপরাধ হয় আমার। কেটে রক্ত পড়তে শুরু করল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলে কতগুলো কিলচড় খেলাম। তারপর দুদিন আমার কী হয়েছিল কিছুই মনে করতে পারিনি। দুমাস লেগেছিল ঘা শুকোতে।

তোমার ভাই কিছু বলেননি?

ভাই?

রঞ্জনা ঠাঠা হাসে। সেই অস্বাভাবিক হাসির তোড়ে কেঁদে ওঠে মন্টি। মজিদ তারপর থেকে কখনো ওর সামনে ভাইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না।

রঞ্জনার ভালোমন্দ নিয়ে মজিদের দিনগুলো এমনই। ঘরে কখনো ভালো লাগলে, মন্টির সঙ্গে খেলে সময় কাটে। কখনো উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে পড়ে; ফুটপাত ধরে হাঁটে। ফুটপাত তারাবানুর সংসার দেখে। ছাব্বিশ বছর বয়সে বুড়িয়ে যাওয়া তারাবানু মজিদের চোখে বিস্ময়। প্রবল মনোবল নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। পঙ্গু স্বামীর দুপা-ই হাঁটুর ওপর থেকে কাটা। বিয়ের মাসখানেক পর ঠেলাগাড়ি চালাবার সময় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে সুলেমা। সেই থেকে শুরু হয় ওদের জীবনের ঠেলা। আগে বস্তির ঘর ভাড়া করার সামর্থ্য ছিল, এখন তাও নেই। ফুটপাতে রান্নাবাড়া এবং জীবনযাপন। দুপুরবেলা পার্কের ভেতরের পুকুরে গিয়ে স্নান করে। বৃষ্টি এলে পার্শ্ববর্তী স্কুলের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। চার চাকার ছোট্ট একটি গাড়ির ওপর স্বামীকে বসিয়ে শহরময় ঘুরে ভিক্ষা করে তারাবানু। কোটরগত চোখ, হাড্ডিসার শরীর, রুক্ষ তেলহীন চুল তারাবানুর। তবু এখনো বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে, কখনো মৃত্যুর চিন্তা করে না। ফুটপাত ধরে হাঁটলে ওদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। মজিদের বাড়ির আশপাশেই থাকে ওরা। বেশিরভাগ সময় বিশাল রেনট্রি গাছের নিচে। প্রায়ই ইটের চুলোয় শুকনো পাতা জ্বালিয়ে ভাত রান্না করে ও। কখনো ভাতের মধ্যে আলু সেদ্ধ করে, নইলে লবণ-মরিচ, সুলেমান ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে থাকে, ছেলেগুলো মাকে ঘিরে বায়না ধরে। আজ ছেলে দুটো ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। শুধু ভাত খেতে ওদের ভালো লাগে না। ওরা দেখবে আশপাশের বাড়িতে ঢুঁ মেরে কিছু তরকারি জোগাড় করা যায় কি না। মজিদ গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়।

সুলেমান এবং তারাবানু দুজনেই ওকে দেখে হাসে। সুলেমান হাত বাড়িয়ে দেয়, স্যার একটা সিগারেট দ্যান। মজিদ এলে সুলেমান একটা আস্ত সিগারেট খেতে পায়। নইলে অন্যের ফেলে দেওয়া টুকরো কুড়িয়ে টানে, ওতে মন ভরে না। মজিদ ওকে একটা সিগারেট দেয়, সঙ্গে দিয়াশলাইও।

সুলেমান ধোঁয়া উড়িয়ে বলে, আইজ আপনের মন ভালা নাই।

তারাবানু একগাল হাসে, আমাগো এইহানে খাড়াইলেই টের পাই যে সাবের কি য্যান অইছে।

মজিদ অন্যমনস্ক হয়ে প্রশ্ন করে, তোমার কোনো বড় ভাই আছে তারাবানু?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাই। থাইকলে তো বাঁইচা যাইতাম। মাথার উপর একজন কেউ থাইকলে কি এমুন পথে পথে ঘুইরা বেড়াই।

তারাবানুর বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। মজিদের কানে তা অন্যরকম লাগে। রেনট্রির পাতার ফাঁকে বেগুনি ফুল ফুটে আছে। টুকরো টুকরো আকাশও দেখা যায়। তারাবানুর চুলোয় টগবগিয়ে ভাত ফোটে। সেই ধ্বনিতে ও রঞ্জনার গলাই শুনতে পায়, মিষ্টি কণ্ঠস্বর, কিন্তু তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ। ও তারাবানুর মতো এমন উদার এবং সহিষ্ণু হয় না কেন?

তারাবানু তোমার কি কখনো মরতে ইচ্ছে করে?

ওর চোখ বড় হয়ে যায়। প্রবল প্রতিবাদে বলে, কি যে কন সাব, মরমু ক্যান? মরার কথা ভাবি না। ওর মুখে বিরক্তি, বোঝা যায় কথাটা ওর পছন্দ হয়নি।

তবুও মজিদ মরিয়া হয়ে বলে, তোমার এত কষ্ট, তারাবানু?

কষ্ট তো কী অইছে? আল্লাহ ভাইগ্যে যা রাইখছে। আপনে আর আমি কি ইচ্ছা কইরলেই ভাইগ্য বদলাইতে পারি।

মজিদ চুপ করে শোনে। তা হলে রঞ্জনার ব্যাপারটা পুরোই ভাগ্য? ও মানতে পারে না। ভাগ্য হলে জীবনযাপন এমন হয় কেন? কেন প্রতিটি দিন যন্ত্রণার, কেন বুক কালো হয়ে যায়? কেন রক্ত ঝরে? আসলে তারাবানুর মতো বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারাটাই ভাগ্য। ও তা কিছুতেই পারবে না। এই অবিশ্বাসের নগরে তারাবানুদের সংখ্যা বেশি বলেই কালকেতু এত সহজে সবকিছুতে পার পেয়ে যাচ্ছে।

এইসব বিশ্বাসীর ঘাড়ের ওপর পা রেখে কালকেতুর অবাধ রাজত্ব, বড় বেশি তিলোত্তমা নগরীর অধিপতি। ওর মুখ দেখে কিছু হয়তো আঁচ করে তারাবানু বলে, আমি ঠিক কই নাই সার?

তোমার মতো করে ঠিকই বলেছ। তবে তোমার মতো বিশ্বাস নিয়ে বাঁচাটা কঠিন। আমার এমন বিশ্বাস নেই।

তারাবানু হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মজিদ রাস্তা দেখে, রিকশায় মানুষ, দু-একটা গাড়ি হুশ করে চলে যায়। ওর মাথা কেমন করে। বিষাদ, এত গ্লানি, ভালো লাগে না।

সাব, দুইটা টাকা দিবেন?

টাকা?

মাত্র দুইটা। এটটুখানি ত্যাল কিনমু। ত্যাল না দিলে মাথাডা ঘুরায়।

রঞ্জনার কাছে কেউ কিছু চাইলে ও ফুঁসে ওঠে। বলে, কেন দেব? আমাকে কে কী দিয়েছে? কোনোদিন কারো কাছে চেয়ে একটা শখ মেটাতে পারিনি।

এত করুণ কেন রঞ্জনার স্মৃতি? এত তিক্ত কেন রঞ্জনার স্মৃতি? আরো কিছু ভালো হলে মজিদ বেঁচে যেত। সাব, দিবেন না?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হ্যাঁ দেব।

মজিদ পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে। কেন দেব না? আমার স্মৃতি তো এত খারাপ নয়? আমি অনেকের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো পেয়েছি। দুহাত ভরে পাইনি ঠিক, কিন্তু যা পেয়েছি তা কম নয়। এ নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই, তিক্ততা বা হাহাকারও নেই। সুলেমানের জন্য ওর ঈর্ষা হয়। সুলেমান ভাগ্যবান যে তারাবানুর মতো বউ পেয়েছে। ভাবতেই পঙ্গু এবং একজন ভিক্ষুকের ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত মজিদের বুক পুড়ে যায়। মজিদ পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে, নাও।

ওর কণ্ঠে ক্রোধ। ও তারাবানুর গায়ের ওপর টাকা দুটো ফেলে দেয়। তারাবানু কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে বাঁধে। ও যাবার জন্য পা বাড়াতেই পেছন থেকে সুলেমান ডাকে, সাব, আর একডা সিগারেট? ও প্রায় খালি হয়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট ও দিয়াশলাইটা সুলেমানের গায়ের ওপর ছুড়ে দেয়। এইভাবে মানুষের কাছে পরাজিত হওয়াটাই লজ্জার। মজিদ বিজয়ী মানুষ হতে চায়। খানিকটা পথ আসার পর কে একজন ওর ঘাড়ে হাত রাখে।

কি ভাই, দরদাম করছিলেন বুঝি?

দরদাম?

বুঝলেন না?

আমি এমনি ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ইস্ সাধু সাজা হচ্ছে। সত্যি কথা বললেই তো পারেন যে রেটে কুলোল না।

হারামজাদা।

মজিদ ধাম করে ওর চোয়ালে ঘুষি মারে। লোকটা মুহূর্ত থমকে যায়। বাজে কথা বলার জায়গা পান না? নিজে যা অন্যকে তাই ভাবছেন।

লোকটি ততক্ষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে। পালটা ওকে দুটো ঘুষি দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। অন্ধকারে ওর পিছু ছোটার কোনো ইচ্ছে হয় না মজিদের। ঘুষি খেয়ে মাথা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে। আক্রোশ, অক্ষমতা, গ্লানি ইত্যাদি অনেক কিছু মিলিয়ে ওর মনে এক বিচিত্র অবস্থা। ইচ্ছে করে চিৎকার করে কাঁদতে, ইচ্ছে করে সুলেমান আর তারাবানুর সংসারে আগুন লাগিয়ে দিতে। কিন্তু কেন? চিন্তা করে থিতিয়ে যায় মজিদ। কী বিকৃত মানসিকতা ঐ লোকটির। মজিদের মনে হয় এটাই বুঝি সত্যি, এটাই সৌন্দর্য। আসলে এই তিলোত্তমা নগরীতে ও নিজেই একটা পোকা।

সে রাতে ও ঘুমুতে পারে না। বারবার ঘুম ভেঙে যায়। মাথা ধরা ছাড়ে না। ভোররাতের দিকে স্বপ্ন দেখে ও। সামান্য তন্দ্রার মতো এসেছিল, এর মধ্যে ঐ স্বপ্ন। ও স্বপ্ন দেখে যে, কালকেতু দেবী হয়েছে। লোকে ওকে পুজো দিচ্ছে। কালকেতুর পায়ের কাছে মানুষের মাথা গড়াগড়ি যাচ্ছে, ফুলে ছেয়ে আছে সমস্ত শরীর। ওর দশ হাত দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। কালকেতুর পায়ের নিচে মজিদের মতো আরো অনেকে থেঁতলে যাচ্ছে। কেউ কোনো টুঁ শব্দ করছে না। কালকেতু হাত তুলে আশীর্বাদ

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করছে। ওর আশীর্বাদে ঝরে যাচ্ছে শূকরের লেজ, সেগুলো অবিকল মানুষ হচ্ছে। কিন্তু গায়ের গন্ধে কেউ কাছে যেতে পারে না। ওদের ছুঁচালো মুখ থেকে ঝরে পড়ছে মল।

স্বপ্নের ভয়ে মজিদ নড়তে পারে না, শ্বাস ফেলতে পারে না। ইচ্ছে করে রঞ্জনাকে ডাকতে, কিন্তু হাত ওঠে না। মজিদের হাত বিছানার সঙ্গে সেঁটে থাকে। কষ্টে ওর বুক ফেটে যায়। সকালে ও মুখ না ধুয়ে দিনপঞ্জি লিখতে বসে। তখনো পুরোপুরি আলো ফোটেনি। স্নিগ্ধ বাতাসে ওর মাথার যন্ত্রণা কমতে থাকে। দিনপঞ্জির পাতায় কালো কালিতে ফুটে ওঠে চমৎকার অক্ষর। মজিদ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় স্বপ্নের কথা লেখে। শেষে একটি লাইন যুক্ত করে অনেক ভেবেচিন্তে : তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের ঘরের একদল লোকের জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নাগপাশ ছিঁড়তে পারছে না। ওদের জনগণের দুধরনের শত্রু, ভেতরে এবং বাইরে। এসব দেশের শাসকরা চায় গোটা জাতিকে হয় ভিক্ষুকে পরিণত করতে, নয় ক্রীতদাস বানাতে। তা হলেই ওদের সুবিধে। কিন্তু এসব শাসক ভুলে যায় যে, এক মাঘে শীত যায় না।

৩

বিশাল এলাকা নিয়ে কালকেতুর অফিস ভবন। ভেতরে যেমন সাজানো, বাইরের উদ্যানটিও তেমন মনোহর। নগরে সাধারণ লোকের ওখানে ঢোকা নিষেধ। বিদেশিরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। কারো কারো মুখ দিয়ে কথা সরে না। কেউ কেউ কালকেতুর সৌন্দর্যের প্রশংসায় মুখ দিয়ে ফেনা উঠিয়ে ফেলে। নগরের সাধারণ লোকেরা দেয়ালের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে উদ্যানের সৌন্দর্য দেখে। ওদের মনে হয় এখানকার ঘাসগুলোও দুধ-মাখন খেয়ে বেড়ে ওঠা। এত চকচকে, এত নরম!

অফিস থেকে ফিরে কখনো ক্লান্তি বোধ করে না কালকেতু। ওর চেহারায় সব সময় একটা সজীব, তরতাজা ভাব বজায় থাকে। সেদিন অফিস থেকে ফিরতেই ফুল্লরা ধরে বসল। ও তখন সবে বাইরে থেকে ফিরেছে। নারী সমাজের উন্নতির ওপর বক্তৃতা করে এসেছে। তখনো অঙ্গে গহনা, দামি শাড়ি এবং কড়া সুগন্ধি, মুখে মেকআপ, চোখে কাজল, রঙিন চুলে সোনার ক্লিপ। কালকেতু দেখে একটু থমকে যায়, তারপর চোখ ঠেরে বলে, ভালোই তো দেখাচ্ছে। ফুল্লরা উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, মিনসে আমি ব্যবসা করব ঠিক করেছি।

ব্যবসা, কিসের ব্যবসা?

https://boierhut.com/fb

ব্যবসা তো হাজার রকম আছে। পথমে আলু-পটোল দিয়ে শুরু করব ভাবছি।

কিন্তু? কালকেতুর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। ফুল্লরা সে ভাঁজ উপেক্ষা করে বলে, কিন্তুর কিছু নেই। আমি কাগজপত্রে কোথাও থাকব না। সব ভাঁড়ু দত্ত ম্যানেজ করবে। বুদ্ধিটা তো ও-ই আমাকে দিল।

ওহ্ গ্রেট ভ্যাঁড়ু দত্ত। এ জন্যই ও আমার প্রধান উপদেষ্টা।

আমাদের অনেক টাকা হবে মিনসে।

টাকা? কালকেতুর চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে। অনেক টাকা।

ফুল্লরার চোখ সাপের মণির মতো জ্বলে ওঠে। কণ্ঠে হিস্‌হিস্ ধ্বনি।

হ্যাঁ, তুমি ব্যবসাই করো।

ও ভেবে দেখল, বউকে দিয়ে ব্যবসা করালে নিজের গায়ে কালিমা লাগার ভয় নেই। আর ভাঁড়ু দত্ত সাথে থাকলে আর ভয় কি। ও ট্রিকস ভালো বোঝে। ওর সঙ্গে আছে ওর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, যার অনেকেই শিল্পপতি। ওভার ইনভয়েসিং এবং আন্ডার ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে নগর থেকে ভিন্ন দেশে অর্থপাচারের কৌশল চমৎকার রপ্ত করেছে। ওরা নগরের আইনের আওতায়ই যন্ত্রপাতি কিংবা পণ্যসামগ্রী আমদানির জন্য নগর থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ভিন দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু পণ্যসামগ্রী কেনা হয় কাগজে, তার দাম হয় কয়েকগুণ বেশি। অর্থাৎ এক কোটি টাকার জিনিস কেনা হলে কাগজপত্র তৈরি করা হয় দুই কোটি টাকার। বাড়তি মুদ্রা কোথায় যায়? ভিন্ন দেশে সেটা জমতে থাকে। অথচ কাগজে-কলমে ধরা পড়ার উপায় নেই। এ এক চমৎকার খেলা। দেশের সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে একই জারিজুরি চলে। তিন কোটি টাকার জিনিস রপ্তানি করে কাগজে দেখানো হয় এক কোটি। ভাঁড়ু দত্ত এই স্বপ্ন দেখিয়েছে ফুল্লরাকে। এসবের বাইরে ব্যবসার আরো যে কত কৌশল আছে তার সবকিছু আস্তে আস্তে বুঝবে ফুল্লরা। ভাঁড়ু দত্ত সবকিছু বুঝিয়ে ছাড়বে। বিশাল কনস্ট্রাকশন ফার্ম, বিশাল এনজিও এবং আমদানি-রপ্তানির মতো বড় বড় ব্যাপারেই থাকা ভালো। টাই খুলতে খুলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে কালকেতু। এক জীবনে অনেক কিছু চাই তার। ফুল্লরা বাথরুমে খুব যত্ন করে মেকআপ ওঠাচ্ছে। যত্নের ফলে ওর ত্বকটা এখনো মসৃণ। দাগ নেই এবং কোনো ব্রণও না। টাইটা বিছানার দিকে ছুড়ে মারে কালকেতু। সেটা বিছানায় না পড়ে মেঝেতে পড়ে যায়। উত্তেজনায় ওর হাত-পা অবশ হয়ে আসে। ব্যবসার বুদ্ধিটা ফুল্লরা চমৎকার করেছে। আজ রাতে একটা বড় কিছু পাওয়া হয়ে গেল ফুল্লরার, যার জন্য ওকে উন্মুখ হয়ে থাকতে হয়। ও একে একে নিজের পোশাক ছুড়ে ফেলে দিগম্বর হয়ে যায়। কালকেতু বুঝতে পারে যে এ আচরণ ওর নিয়মের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, তবু নিয়ম ভাঙতেই ভালো লাগছে। এখন থেকে ও নিয়মই ভাঙবে, ভেঙে নিজেকে অন্যভাবে গড়বে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ও বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে নিজের অতীতের দিকে ফিরে চাইল। সেই অতীত এমন : শিবভক্ত ইন্দ্রের পুত্র অরণ্য-রসিক নীলাম্বর। বনে বনে ঘুরে প্রতিদিন শিবের পুজোর জন্য শতেক ফুল চয়ন করে। দেবী চণ্ডী শিবের অভিশাপ দিয়ে তাকে মনুষ্য জন্ম নিতে বাধ্য করলেন। কলিঙ্গ জনপদে ব্যাধের ঘরে নীলাম্বর জন্ম নিল। নাম হলো কালকেতু। পিতা ধর্মকেতু। স্ত্রী ফুল্লরা। দেবীর ইচ্ছে কালকেতুর দ্বারা তার মাহাত্ম্য প্রচার হবে। কৈলাসে শিবের ভিক্ষের অন্নের গৃহিণী হয়ে তার জীবন অতিষ্ঠ। দারিদ্র্যের এই ক্লেশ থেকে তিনি মুক্তি চান। বাবা তাকে বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। শুধু দুঃখ যৌতুক দিয়ে। যতদিন বাবার বাড়ি ছিল সখী পদ্মাবতীর সঙ্গে পাশা খেলে এবং নানা রঙ্গরসে দিনগুলো ভালোই কেটেছে। কোল আলো করে আসে দুই পুত্র গণেশ আর কার্তিক। সব সুখে বাদ সাধল দেবীর মা। শুরু হয় তার গঞ্জনা আর খোঁটা। সবার কাছে বলতে থাকে, আর কতদিন আমি ঝি-জামাই আর নাতিদের পুষব? রাত না পোহাতে কার্তিক-গণেশ ভাতের জন্য কান্না জুড়ে দেয়। জামাইয়ের কেবল এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা। চাষবাসে মন নেই, ভাঙের নেশায় চুর হয়ে থাকে। ওদের জন্য রাঁধতে রাঁধতে আমার কাঁকালে বাত হয়ে গেল। কত আর আমি এই উৎপাত সহ্য করব? মায়ের নিত্যদিনের খোঁটায় দেবী স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসে চলে যায়। সেখানে ভিক্ষা করে অন্ন জোগায় শিব। যেদিন ভালো জোটে সেদিন দশ ব্যঞ্জন খায়, যেদিন জোটে না সেদিন উপোস, নইলে ধারের জন্য বেরুতে হয় দেবীকে। ধার শোধ করতে না পারলে লজ্জায় গ্লানিতে ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না। শিব দেশান্তরে গেলে মা দেবীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু গঞ্জনা দিতে ছাড়ে না। বলে, তোমার দরিদ্র পতি বাঘের চামড়া পরে। বুড়ো ষাঁড় একটা, গলায় আবার হাঁড়ের মালা ঝোলায়। জামাইকে নিয়ে সবার মাঝে আমার মাথা হেঁট হয়েছে। তোমার স্বামীর অঙ্গরাগ চিতার ধুলো, কাঁধে থাকে ভাঙের ঝুলি, শ্মশান তার বিনোদলীলা—যত ভূত প্রেত পিশাচ তার দোসর। মাগো লজ্জায় মরে যাই।

মায়ের কথা বিষের মতো সারা শরীর কামড়ে রাখে। দেবী নিশিদিন জ্বলে পুড়ে মরে। এই সময় পথের সন্ধান দেয় পদ্মাবতী। বলে, মর্তলোকে পুজো পেলে তোমার যশঃপ্রাপ্তি ঘটবে এবং দারিদ্র্য ক্লেশেরও নিবারণ হবে। সই তুমি মনুষ্যলোকে তোমার মাহাত্ম্য প্রচারের ব্যবস্থা করো।

দেবী চিন্তিত। কীভাবে হবে? কাকে শাপ দিতে মর্তে পাঠান যায়? তিনি অরণ্যানী। তিনি অরণ্যভূমিপূর্ণ কলিঙ্গ জনপদের অধিপতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সেই অনুসারে রাজা বিচিত্র দেউল নির্মাণ করে সেখানে দেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। ভালোভাবে পুজোর ব্যবস্থাও হয়েছে। দেবী সশরীরে পুজো নিয়েছেন। পুজো পেতে তার চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। স্বস্থানে ফেরার পথে অরণ্যের প্রাণীরা তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজেদের দেবতা জেনে সাধ্যমতো পুজো দেয়। দেবী সবাইকে ভরসা দেন এবং সিংহকে রাজা করে অন্য পশুদের যথাযোগ্য নিয়োগ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দিন যত গড়ায় দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার পায় না। দেবী প্রচার চান। লোকে লোকারণ্য দশদিক জুড়ে পুজো না হলে

https://boierhut.com/fb

তার কি মূল্য আছে? পদ্মাবতীর কথা দেবীর খুবই মনে ধরে। সে দেবীকে আবার পরামর্শ দেয়, নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে মর্তে পাঠাও। একমাত্র শিবই এটা করতে পারেন। অমরাবতীতে শিব পুজো সম্পন্ন করে কৈলাসে আসেন। সে পুজোর শত ফুল জোগায় নীলাম্বর দেবী শিবের শরণাপন্ন হন। নিজের পুজোর খবর তাকে জানান। তারপর শিবকে বলেন, আমি মর্তলোকে মনুষ্য পুজো চাই।

শিব মৃদু হাসেন, কীভাবে?

নীলাম্বরকে শাপ দিয়ে মানুষের ঘরে পাঠাও।

অসম্ভব! নীলাম্বরের তিলমাত্র পাপ নাই। কী কারণে আমি তাকে অভিশাপ দেব?

যদি ওর পাপ হয়?

তা হলে শাপ দেব।

দেবী আশ্বস্ত হন। কাজ উদ্ধারের জন্য নানারকম পথ খুঁজে ফেরেন।

পদ্মাবতীর সাথে যুক্তি করে দেবী নন্দনকাননে এসে মায়া বিস্তার করেন। ফুলহীন হয়ে যায় কানন। সাজি হাতে বাগানে ঢুকে হতবাক হয় নীলাম্বর। এখন কী হবে? কোথায় পাবে ফুল? ও পাগলের মতো ছুটোছুটি করে। এত ফুল খুঁজতে গেলে তো পুজোর বেলা পার হয়ে যাবে। উপায় না দেখে নীলাম্বর রথে চড়ে স্বর্গ থেকে মর্তে আসে। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে ও। সেখানে ব্যাধ ধর্মকেতু এক হরিণের পেছনে তাড়া করছে। দেবী নিজে রূপসী হরিণ হয়ে মায়া বিস্তার করেন। তিনি দৌড়ে দৌড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যান। ধর্মকেতু পিছু ছাড়ে না। সেও হরিণকে অনুসরণ করে। বনজুড়ে এক মায়ার খেলার অপরূপ দৃশ্য রচিত হয়। নীলাম্বর মুগ্ধ হয়ে দেখে। ধর্মকেতু তীর ছোড়ে, সে তীর বাতাসে ভেসে চলে যায়। ফুলের কথা ভুলে যায় নীলাম্বর। ওর হৃদয়ে এখন থৈ-থৈ আনন্দ, পুজোর জন্য কোনো দুশ্চিন্তা নেই। গাছের নিচে বসে কতক্ষণ এই অপরূপ খেলা দেখে মনে নেই ওর। বরং দুঃখ হয় এই ভেবে যে, কেন ও ইন্দ্রের কুমোর হল? তার চেয়ে অনেক ভালো ছিল এই ব্যাধ জীবন। এই ব্যাধ নিজের ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করে। যখন খুশি তখন ভোজনে নিষেধ নেই, তৃষ্ণায় আঁজলা ভরে জল পান করতে পারে। আর ও? শিব যতক্ষণ পুজো না করেন ততক্ষণ উপোস থাকে, কখনো ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য হয়ে ওঠে। নিজের জন্য খুব দুঃখ হয় নীলাম্বরের। মনে হয় কোনো কাজই তো শেখেনি। ব্যর্থ ওর দেবতা জন্ম। না করল বিদ্যার অন্বেষণ, না করল ধনু শিক্ষা। দেবতা এবং অসুরের মধ্যে যুদ্ধ হলেও তো কোনো কাজেই লাগবে না? এই মালাকরের জীবন কি একটা জীবন? প্রভাতে উঠে সাজি হাতে কেবল ফুল চয়ন? পায়ে কাঁটা ফোটে, কাঁটার আঁচড়ে ছিঁড়ে যায় হাত-পা। তার চেয়ে এ ব্যাধ কত উদ্দাম, কত শক্তিধর। এর সঙ্গে সিংহ-হরিণের খেলা। এ যেন বনবাসী রাম। আমি এমন জীবন পেলে ধন্য হতাম। কী নিদারুণ দৈব আমার! নীলাম্বরের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। দুঃখে-বেদনায় ও ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। পরক্ষণে নিজেকে এসব থেকে মুক্ত করে ফুল তুলতে ছোটে। পুজোর বেলা

https://boierhut.com/fb

বয়ে যাচ্ছে। ও দ্রুত হাতে ফুল তুলতে থাকে। আজ আর বাছবিচার নেই, যা পায় তাই দিয়ে সাজি ভরে। ফুলের ভেতর দেবী মায়া পাতলেন। তিনি পলাশ ফুলে পিঁপড়া হয়ে ঢুকে রইলেন। সেই ফুল ঢুকে গেল নীলাম্বরের সাজিতে। বিলম্বের কারণে আজ ওর কপালে দুঃখ আছে। না জানি কী ঘটবে? নীলাম্বর দ্রুতগতিতে রথ নিয়ে ছোটে। শিব পুজোর অপেক্ষায় বসে থাকেন। তিনি ভাবেন, নীলাম্বর খেলায় মত্ত হয়ে গেছে। এই পাপ তার খণ্ডাবে কী করে? আজকে অভিশাপ না দিয়ে উপায় নেই। নীলাম্বর ফুল আনলে পুজো শুরু হয়। শিবের মাথায় ফুল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার খোঁচা লাগে। এবং পরক্ষণে পিঁপড়ে হয়ে লুকিয়ে থাকা দেবী দারুণ কামড়ে বিষ ছড়িয়ে দেন। যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠেন শিব। পিঁপড়ের বিষে আগুনের মতো পুড়ে যায় শরীর। ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ইন্দ্রের ওপর। বলেন, ইন্দ্র তুমি ত্রিদশের অধিকারী, আমি জন্মাভিমানী। কিসের জন্য তুমি আমার অর্চনা করো? কপট ভক্তি দেখিয়ে আমাকে বিড়ম্বিত করো? ভেবেছ আমি বাঘের চামড়া পরি, গলায় হাড়ের মালা দেই তাই আমার সঙ্গে পরিহাস? শিবের তৃতীয় নয়ন দিয়ে আগুনের গোলা ছোটে। ইন্দ্র জোড় হাতে বলে, আমার কোনো দোষ নেই। পুষ্প তো নীলাম্বর তুলে আনে।

শিব রক্তচক্ষুতে নীলাম্বরের দিকে তাকান, সত্যি করে বল কী হয়েছিল?

বনে যা ঘটেছিল নীলাম্বর তা অকপটে বলে যায়। শিব প্রচণ্ড রোষে বলেন, আমার সেবা ত্যাগ করে তোমার মনে অন্য সাধ জেগেছে? ঠিক আছে দূর হও মর্তে, ব্যাধ হয়ে জন্মাও।

নীলাম্বরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ও শিবের পা জড়িয়ে ধরে। অনুনয়-বিনয় করে, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। সবই দেবীর ইচ্ছে। দেবীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথায় বিছানায় শায়িত কালকেতুর নগ্ন শরীর শিহরিত হয়। আকাঙ্ক্ষা পূরণ কে না চায়? প্রতিটি মানুষ যেন নীলাম্বরের মতো স্বাধীনভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করে তেমন দেবীর মতো নিজের মাহাত্ম্যের প্রচার চায়। দেবী ছলে বলে কৌশলে শিবকে দিয়ে নীলাম্বরকে অভিশাপ দেওয়ালেন। এর নাম রাজনীতি এবং এভাবেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়। কালকেতুর শরীর উত্তপ্ত হতে থাকে। মনে মনে বলে, আমিও নিজের মাহাত্ম্যের প্রচার চাই। আমি মনুষ্যলোকে পুজো চাই। ফুলে ফুলে ভরে যাবে আমার পদযুগল। আমি নগরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে উল্কার মতো ছুটে বেড়াব। নিজের অতীতের মধ্যে বর্তমানের আচরণের যুক্তি খুঁজে পেয়ে কালকেতু তৃপ্ত। যারা বলে কালকেতু কলিঙ্গকে পৈতৃক সম্পত্তি বানিয়েছে তাদের জন্য ওর করুণা হয়। ওরা তো জানে না দেবীর মতো কত কৌশল উদ্ভাবন করতে হয় ওকে। রাত-দিনের অসংখ্য মুহূর্ত ব্যয় করতে হয় ওকে। সবকিছু এত সোজা হলে তো ভবানিও নগরের রাজা হতে পারত! কালকেতুর দাঁত কিড়মিড় করে, হাত নিশপিশ।

রাতের পোশাক পরে ফুল্লরা বিছানায় এলে কালকেতু তার ওপর মায়া বিস্তার করে। একসময় ফুল্লরা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, মিনসে আমার ব্যাধ জীবনই ভালো ছিল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাই নাকি? কালকেতুর কণ্ঠে ঝিলিক।

তখন তুমি শুধু আমাকেই চাইতে। এখন তুমি আমার শরীর হাতড়ে অন্য নারী খোঁজ। তোমার স্পর্শ আর আগের মতো নয়। আমার সঙ্গে কেলিতে মেতে তোমার মগজ অন্যখানে কেলি করে।

কালকেতু অবসাদযুক্ত শরীরে প্রচণ্ড হাসির ঝড় উঠিয়ে বলে, ঠিক বলেছ। আমি চাইলেই এই নগরে অনেক সুন্দরী নারীকে নিজের দখলে পেতে পারি।

কীভাবে? ফুল্লরার কণ্ঠ গাঢ় হয়।

ওদের স্বামীদের উচ্চ পদ দিয়ে কিংবা প্রচুর টাকার ব্যবসা ধরিয়ে দিয়ে।

মিনসে আমার ব্যাধ জীবনই ভালো ছিল।

চাইলেই আমরা সে জীবনে ফিরে যেতে পারি।

আকস্মিকভাবে ফুল্লরার মেদ-শরীরে ভয় ছড়িয়ে যায়। কণ্ঠে আর্তনাদ তুলে বলে, না যেতে চাই না।

কালকেতু ঠাঠা হাসে। হাসতে হাসতে বলে, তা হলে দেখো তোমাকেও আমি কিনে ফেলেছি।

৪

ঘরে ফিরে মজিদ অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন বোধ করে। ছোট্ট বাড়ি ওর, দুটো মাত্র ঘর। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিলে ও বৈঠকখানায় বসে থাকে। দরজায় পরদা নেই, ওটা খুলে রাখলে হু-হু করে বাতাস আসে। বেতের চেয়ারে বসে মজিদ টেবিলের ওপর পা তুলে দেয়। রঞ্জনা হয়তো রান্নাঘরে, ইলিশ ভাজার গন্ধ আসছে। মন্টি ঘুমিয়েছে। রঞ্জনাকে কি ঘুষি খাওয়ার কথা বলা যাবে? ও কীভাবে নেবে ব্যাপারটা? না থাক দরকার নেই। ও হয়তো ভালো ব্যাখ্যা করবে এবং সে ব্যাখ্যা ওর মগজে এমনভাবে ক্রিয়া করবে যে সেটা মজিদের জন্য হবে আরো ভয়াবহ ও ভাববে সত্যি মজিদ হয়তো তারাবানুদের মতো মেয়েদের সঙ্গসুখের জন্য ঘুরে বেড়ায়। তারাবানুদের সুখ যে ওর হৃদয়কে ঈর্ষার ধোঁয়ার পিণ্ডে পরিণত করেছে এ বোঝার শক্তি রঞ্জনার কোনোদিন হবে না। মজিদ চেয়ারের পেছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে থাকে। হাতের কাছে সিগারেট নেই বলে বিরক্ত হচ্ছে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনা উচিত ছিল। আসলে ঘুষি না খেলে ও সিগারেট কিনে আনতে ভুলত না। কী নিষ্ঠুর মানুষের আচরণ। কেমন অবলীলায় নর্দমার ময়লায় দাঁড়িয়ে কথা বলে যায়। অন্যকে নিজের মতো দেখতে পায়নি বলে ক্ষেপে উঠেছে। মজিদ যদি বলতে পারত তারাবানুকে ও চেয়েছিল, দরদামে বনেনি বলে আনা হয়নি তা হলে ও হয়তো খুশি হত। হয়তো

https://boierhut.com/fb

বলে দিতে পারত কার কাছে গেলে দরদাম ঠিক ঠিক মিলে যায়। ও শুনেছে কালকেতুর নিজের দরদামের কোনো মাপকাঠি নেই। যা ওর পছন্দে তা ওর চাই। যেভাবেই হোক আনতে হবে, অন্যথা হতে পারবে না। দরদামের খুনসুটি ওদের মতো সাধারণের জন্য, যাদের পকেট পাঁচের বদলে সাত হয় না।

তখুনি রঞ্জনা ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে, তোমাকে না কত দিন বলেছি দরজা এমন হাট করে খুলে রাখবে না?

মজিদও ধমকের স্বরে বলে, চেঁচিও না বলছি।

কেন চেঁচাব না? এক শ' বার চেঁচাব। তুমি যা খুশি তা করবে নাকি?

হ্যাঁ করব। দরজা বন্ধ করবে না বলছি।

এক শ' বার করব।

দরজা বন্ধ করে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে রঞ্জনা।

মজিদের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আবারও কি ঘুষি খেয়ে আসবে? না। না কেন? রঞ্জনা নারী বলে? বল প্রয়োগে ও মজিদের সঙ্গে পারবে না বলে? তখন প্রবল গ্লানিতে ও পিছিয়ে যায়। চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়ে।

নরম স্বরে বলে, দরজা খোলা রাখলে আমার ভালো লাগে। জীবনের সব দরজা বন্ধ বলে—

ইস্ ঢং, কথা শেষ করতে দেয় না রঞ্জনা, কবি হবার শখ হয়েছে। বুড়ো বয়সে আরো কত কী দেখাবে? এর চাইতে ধর্মে মন দিলে হয়।

রঞ্জনা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে। ওর স্বাভাবই এমন। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি না করে কথা বলতে পারে না। সেই উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখলে শরীর রি রি করে। মজিদ আবার চেয়ারের মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে।

বাইরে থেকে এসে কাপড়ও ছাড়নি দেখছি? যাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

আমি খাবার দিচ্ছি।

মজিদের মনে হয় এই কথাটা রঞ্জনা ভালো বলেছে। শরীরে পানির স্পর্শ লাগলে ভালো লাগবে। হয়তো মুছে যাবে ঘুষি খাওয়ার বেদনা। কিন্তু না, আজকে কোনোকিছু থেকেই মজিদ মুক্তি পায় না। প্রিয় রান্না ইলিশ মাছ ভাজা সেটাও বিস্বাদ হয়ে যায়। বারবার শুকনো পাতা দিয়ে রান্না একটি টগবগে ভাতের হাঁড়ি ওর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রঞ্জনা বাঁকা চোখে তাকায়, কিছু খাচ্ছ না যে?

ভালো লাগছে না।

তা তো বলবেই। আমি কি আর রাঁধতে জানি।

আমি তা বলিনি। আমারই শরীর খারাপ। খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

https://boierhut.com/fb

রঞ্জনা গুম হয়ে থাকে, কথা বলে না। রাগের চোটে মজিদের প্লেট থেকে মাছের টুকরোগুলো উঠিয়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলে। তারপর জোরে চেয়ার ঠেলে দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে যায়। ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ে মজিদ। এভাবে তো মানুষের জীবন কাটে না। মানুষের দিনগুলো এমন স্যাঁতসেঁতে হওয়া উচিত নয়।

ও দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনবে। যদি ঘুম না আসে তা হলে তো সিগারেট সঙ্গী হবে। এই একটা জিনিস না হলে ও হয়তো কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারত না। দোকানি ইউনুস চটপটে ছেলে। নিজের চেষ্টায় দোকানটা দাঁড় করিয়েছে। হাসিখুশি বলে ওর সঙ্গে কথা বলে স্বস্তি পাওয়া যায়, ভালোও লাগে।

স্যার আজ আপনার মন ভালো নেই?

কেনরে? ভালোই তো আছে।

বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম মুখটা কেমন কালো করে রেখেছেন। কিছু হয়েছে নাকি স্যার?

কিছু হয়নি। শরীর ভালো লাগছে না। এক প্যাকেট স্টার দে। তোর বাবা ভালো আছে?

কোনোরকম। হাঁপানির রুগি। বেশি কাশি উঠলে মনে হয় এই বুঝি শেষ হয়ে গেল।

জানি রে, খুব কষ্ট হয়। আমার চাচার ছিল।

মজিদ সিগারেট নিয়ে ফিরে আসে। রঞ্জনা দরজায় দাঁড়ানো। ঠোঁট উলটিয়ে বলে, হুট করে বেরিয়ে গেলে যে?

সিগারেট আনতে।

ও প্যাকেটটা উঁচিয়ে দেখায়।

এই ছাইপাঁশ খেয়ে কেবল পয়সা ওড়াও।

আমার যা কিছু আনন্দ, তাতেই তোমার আপত্তি।

মজিদ রঞ্জনাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে। ও দরজা বন্ধ করে দেয়। ও গজগজ করছে, কথার কী ছিরি! যেন আমাকে নিয়ে তিনি বানের জলে ভাসছেন। আমি তার কাছে খড়কুটো। রঞ্জনা আরো কত কী বলে মজিদ শোনে না। ও অন্য কিছুতে নিমগ্ন হবার চেষ্টা করে। ও কিছু সুখের মুহূর্ত ফিরিয়ে আনতে চায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় মাথা কিছুটা পরিষ্কার হয়। রঞ্জনা শুয়ে পড়েছে, বাতি নেভানো। ওর মনে হয় রঞ্জনা কি দরদামের ঊর্ধ্বে? এটাও তো এক ধরনের দরদাম; যেখানে সব মানুষ পুণ্যের দরে বিকোয়। আমরা কিসের ওপর টিকে আছি? কিসে আমাদের মূল্য নির্ধারণ হয়? আবেগে না বাণিজ্যে? মজিদ আবার সেই ঘুষি খাওয়া সন্ধ্যায় ফিরে যায়। প্রবলভাবে তারাবানুর উপস্থিতি ওকে আলোড়িত করে। ও সিগারেটের বাকি অংশ মেঝেতে ছুড়ে ফেলে।

রঞ্জনা? সাড়া নেই, হয়তো ঘুমিয়ে গেছে।

রঞ্জনা?

https://boierhut.com/fb

বলো

ঠাণ্ডা শীতল কণ্ঠ, নিস্পৃহ এবং উত্তাপহীন। যেন মজিদ নামের কাউকে ও চেনে না। এই কণ্ঠস্বর ও কখনো শোনেনি। এমন করে কেউ ওকে কখনো ডাকে না। মজিদ ওর কাছে সরে আসে। ওর গায়ে হাত রাখে।

রঞ্জনা, এমন কেউ নেই যে তোমাকে যৌবনে প্রবলভাবে আবেগতাড়িত করেছিল?

না।

তুমি তাকে স্মরণ কর রঞ্জনা। তার মধ্যে আমাকে খুঁজে নাও।

রঞ্জনা চুপ করে থাকে।

প্লিজ রঞ্জনা, একবার তাকে ভাবো।

রঞ্জনা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিছুটা চেঁচিয়ে বলে, নেই, আমার কেউ নেই। আমার কেউ ছিল না।

তোমার তো আমিও নেই।

হ্যাঁ, নেই।

রঞ্জনা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মজিদ হকচকিয়ে যায়। ও কখনো কাঁদে না। সব সময় রেগেই থাকে। আজ কাঁদছে কেন?

কাঁদছ কেন রঞ্জনা? তোমার কিসের দুঃখ?

সেটাই যদি বুঝতে তা হলে তো বেঁচেই যেতাম।

রঞ্জনা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে। মজিদ বৈঠকখানায় আসে। কাঁদুক, রঞ্জনা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ুক। ও রঞ্জনাকে বোঝে না। রঞ্জনার সঙ্গে ওর কোথায় দূরত্ব? নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। যে ওর সারা জীবনের সঙ্গী তাকে ও বুঝতে পারবে না কেন? মজিদের বুক ভার হয়ে যায়। ও দরজা খুলে দেয়। হু-হু বাতাস আসছে। ও নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য রঞ্জনাকে উত্তপ্ত করতে চেয়েছিল। কাউকে স্মরণ করতে বলেছে। ছিঃ এ কী করে ভাবল ও? এমন করে নিজেকে ছোট করতে কেউ কি পারে? আসলেই ও কাউকে বোঝার উপযুক্ত নয়। ওর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। ও মরমে মরে যায়। নিজেকে গালাগালি করেও শান্তি পায়নি। ও আর বিছানায় যেতে পারে না। চেয়ারে মাথা এলিয়ে চোখ বুজে থাকে। সব সময় পরাজয়ের গ্লানিতে ও আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আজকের এই পরাজয় ও কি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারবে? এমন গ্লানি তো অনেকেরই থাকে, তারা কী করে কাটিয়ে ওঠে? সবার কি ওর মতো কষ্ট হয়? নাকি ওদের অনুভবে গ্লানি নামের কোনো শব্দ নেই?

মজিদ ভেবে দেখল কালকেতু যা করে তাতে তো ওর বুকের ভেতর সহস্র গ্লানির জন্ম হওয়া উচিত। কিন্তু ও তো দিব্যি আছে। হাসিখুশি উচ্ছল, নগরময় ওর প্রতাপ। ওর হাসিসংবলিত চেহারায় গ্লানির ছাপ নেই। ওর প্রশাসনযন্ত্র এমন, ওর দলের লোকেরাও এমন। কালকেতু চায় নগরবাসীও

https://boierhut.com/fb

এমন হোক। তবু মজিদ কেন এই জলহাওয়ায় থেকেও গ্লানিহীন মানুষ হতে পারছে না। গতকাল ঘটে যাওয়া শ্যামপুর বস্তির ঘটনা ওকে প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত করেছে। ওর মাথার মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। গতকাল দুদলের রেষারেষিতে পুড়ে গেছে শ্যামপুর বস্তি। বস্তির দরজা আটকিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে নারী-পুরুষ-শিশু। দুদলেই প্রশাসনের উপরতলায় ক্ষমতার খুঁটি আছে, জোর লড়াই চলছে তাদের মধ্যে। পুড়ে কয়লা হয়েছে সাধারণ নিরীহ মানুষ। গতকাল মজিদ ওর দিনপঞ্জিতে লিখেছে, এই নগর মানুষের মানবিক বোধগুলো দ্রুত নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। এই নগর এমন এক প্রজন্ম তৈরি করেছে যারা শুভবুদ্ধি, কল্যাণবোধ, মানবিকতা ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে পরিচিত নয়।... চরম অরাজকতা এই নগরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ও বোঝেনি ডটডট দিয়ে পরের বাক্যটি লিখল কেন? ও কি আরো কিছু লিখতে চেয়েছিল? আসলে বড় কিছু লেখা ওকে দিয়ে হয় না বলে এমন দু-একটি বাক্য বের হয়। ও অনেক ভেবে দেখেছে যে যাদের পায়ের নিচে মাটি নেই, শুধুই শ্যাওলা, তারা এমন পরগাছা হয়ে বেড়ে ওঠে। যা খুশি তা করার মানসিকতাই এদের হয়। এর মূল কারণ এইডনির্ভর অর্থনীতি। ও বাতি জ্বালিয়ে ডায়েরিটা নিয়ে আসে। এক জায়গায় লিখে, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি আমার জন্মভূমি। নিজস্ব কোনো অর্থনীতি নেই, সবই সাহায্যনির্ভর। যেটুক নিজের সম্পদ আছে সেটুকুও বাইরে পাচার হয়ে যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতীয় স্বার্থকে গ্রাস করে। কালকেতু চমৎকারভাবে ম্যানেজ করতে পারে। নিজেকে ভিক্ষুক বানানোর সঙ্গে সঙ্গে ও ভিক্ষুক বানিয়েছে নগরবাসীকে। তাই এখানকার লোকেরা কালকেতুর হাতের পুতুল। ও যা খুশি তা করতে পারে। এইটুকু লিখে ও আবার বাতি বন্ধ করে দেয়। চোখ জ্বালা করছে।

ভোররাতে তন্দ্রার মধ্যে ধড়ফড় করে জেগে ওঠে ও। মনে হয় ঘরে কেউ হাঁটছে। কে? কে?

এক অস্বাভাবিক আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসে ওর কণ্ঠ থেকে। দৌড়ে আসে রঞ্জনা। কী হয়েছে?

মনে হয় ঘরে কেউ এসেছিল।

তুমি দরজা খুলে রেখেছিলে?

দুজনে বিস্ফারিত চোখে খোলা দরজার দিকে তাকায়।

নিশ্চয় চোর ঢুকেছিল?

রঞ্জনা ঘরের এদিক-ওদিকে দেখে। বেশি কিছু খোয়া যায়নি।

মজিদের হাতঘড়িটা নিয়ে গেছে চোরে। আলনার কাপড়চোপড় তছনছ করা। তবে খোয়া যায়নি কিছু। স্টিলের আলমারির চাবি রঞ্জনার তোষকের নিচে ছিল, নেবার সুযোগ হয়তো হয়নি। আঁতিপাঁতি করে রান্নাঘর এবং বাথরুম পর্যন্ত দেখে ফিরে আসে রঞ্জনা। মজিদ যেমন বসেছিল তেমন বসে থাকে। রঞ্জনা ঠাস্ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। রোষের সঙ্গে বলে, ঘড়িটা গেছে ভালোই হয়েছে। ওটা আমার ভাই তোমাকে দিয়েছিল। ওটা ও বাসায় না থাকলেই আমি খুশি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মজিদ কোনো কথা বলে না। মাথার মধ্যে ঘোরে যে, আর একটি ঘড়ি কি ও কিনতে পারবে? ওর ঘুম পাচ্ছে। রঞ্জনা বাথরুমে ঢুকলে ও বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

সকালে অফিসে যেতে দেরি হয় ওর। তারেক এগিয়ে আসে।

কর্মবীর আজকে দেখছি লেট?

গতরাতে আমার ঘরে চোর ঢুকেছিল।

তাই নাকি? কী খোয়া গেল?

হাতঘড়িটা।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তারেক লাফিয়ে সামনে আসে, আপনি নিশ্চয় দরজা খুলে রেখে চোরকে আসার সুযোগ দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, দরজা খুলে বৈঠকখানায় বসেছিলাম। ঘুমোইনি। কেবল একটু তন্দ্রার মতো হয়েছিল।

ব্যস, আর বলতে হবে না। আমরা বুঝে গেছি। তারেক হাত বাড়ায়, দশটা টাকা ফেলুন।

কেন?

বাহ্ চোরকে ঘড়ি দিয়েছেন আর আমাদের দশটা টাকা দেবেন না চা খেতে? আমরা আপনার ঘড়ি চুরি উৎসব পালন করব।

মজিদ পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে দেয়। ওরা হৈচৈ করতে করতে নিজের সিটে ফিরে গিয়ে চা-শিঙ্গাড়া খাবার আয়োজন করে। ঘড়ি চুরির উৎসব? মজিদের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। ও ডানদিকের দরজা খুলে দেয়। বাতাসে ভরে যায় ঘর। পিয়ন এসে খবর দেয় যে হামিদুর রহমান ওকে ডাকছে। ও দ্রুত যেতে গিয়ে চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খায়, হাঁটুতে ব্যথা লাগে। অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ও হামিদুর রহমানের ঘরে আসে।

স্যার?

আপনাকে সকাল থেকে কয়েকবার খুঁজেছি। আপনি আজকে দেরিতে এসেছেন।

জি স্যার, আমার বাড়িতে—

মজিদ কথা শেষ করতে পারে না।

এই ফাইলটা দেখুন। লেখকদের রয়্যালটির ব্যাপারটা আপনি ঠিকমতো ডিল করতে পারেন না।

স্যার আমি তো সব পেমেন্ট ক্লিয়ার করেছি।

এই লেখক?

এই লেখকের উত্তরাধিকারীদের টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কিছু আইনগত জটিলতা আছে। এদের সাকসেশন সার্টিফিকেট নেই।

তাই বলে ফাইল ধরে রাখবেন?

ধরে রাখিনি স্যার। আইন উপদেষ্টার কাছে পাঠিয়েছি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

খালি মুখে মুখে কথা বলেন। যান।

নিয়মমাফিক সত্য কথা বললে তা মুখে মুখে কথা বলা হয়? মজিদ বুঝতে পারে না যে, কী ওর অপরাধ। প্রতিটি কাজ তো ও সঙ্গে সঙ্গে করে দেয়। তারপরও হামিদুর রহমানের দাঁত খিঁচুনি খেতে হয় কেন? সবার ভেতর কি একজন করে কালকেতু বাস করে যারা নিজেদের বাইরে আর কিছু বুঝতে চায় না? কালকেতুরা দাঁড়িয়ে আছে সর্বত্র।

ও ভীষণ মন খারাপ করে নিজের ঘরে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে কিছু পড়ার চেষ্টা করে। জয়নুলের কাছ থেকে টাইমসের লিটারেরি সাপ্লিমেন্টটা চেয়ে এনেছে। পড়া হয়নি। গত সপ্তাহে জয়নুল ফোন করেছিল ফেরত চেয়ে। ও পত্রিকাটা পড়ার চেষ্টা করে। দেখে মার্কেজের নতুন বই বেরিয়েছে। মার্কেজের বই বেরুলে ও সেটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। উৎসুক হয়ে খবরটুকু গোগ্রাসে গিলতে থাকে। বইটির নাম 'দ্য জেনারেল ইন হিজ লেব্রিনথ'। নায়ক সাইমন বলিভার, যিনি ১৮৩০ সালে মারা যান। তিনি চেয়েছিলেন ল্যাটিন আমেরিকার ইউনিটি। তাঁর শেষের দিনগুলো ছিল অত্যন্ত করুণ এবং যন্ত্রণাময়। আট শ' কিলোমিটার নদীপথ পেরিয়ে এসেছিলেন এক নৌকায়। পৌঁছেছিলেন ক্যারিবিয়ান সমুদ্র উপকূলে। সেখানেই তার শেষ দিনগুলো কাটে। মার্কেজ তার উপন্যাসের পটভূমি করেছেন ক্যারিবিয়ান সমুদ্র উপকূল। এই বই এখন বেস্ট সেলারের তালিকায়। এই বইয়ের দৌলতে তিনি এখন কোটিপতি। মজিদের মন খারাপ গাঢ় হয়। এই নগরের একজন লেখকও হাজারপতি হতে পারে না। কী চরম দুরবস্থায় কেটে যায় এখানকার লেখকদের জীবন। বিত্তহীন, সম্মানহীন যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুর পর মুছে যায় সব কর্মফল। কিন্তু মার্কেজের এই বইয়ের নামটি ওকে চমকিত করে। ও কাগজে হিজিবিজি করে লেখে, জেনারেল তার গোলকধাঁধায়। জেনারেলরা ক্ষমতায় গেলে নিজের দেশটাকে গোলকধাঁধা বানিয়ে ফেলে, সেখান থেকে বেরুনোর পথ ওদের জানা থাকে না। বলিভার নিজের দখলে একটি নগর নয়, বিশাল এক মহাদেশ চেয়েছিলেন। কী বিপুল আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু বুঝতে পারেনি যে এত দেশকে এক শাসনে বাঁধা যায় না, যেমন ধান চাষ করা যায় না সমুদ্রের নোনাজলে। মানুষের হাতে অস্ত্র উঠলেই কি মানুষ সেটা অন্যের দিকে তাক করতে শুরু করে? সাম্রাজ্যলিপ্সু বলিভার নয়, নগরলিপ্সু কালকেতু নিজের গোলকধাঁধায় একচ্ছত্র সম্রাট। তাই গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে চলছে একনায়কতন্ত্রের শাসন এবং তারও অন্তরালে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে মিলিটারি অ্যারিসটোক্রেসি। বলিভার এক নয়, বলিভার অনেক।

ও পত্রিকাটা বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দেয়। অনেক প্রুফ জমে গেছে, সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। একটু পর ডক্টর মুখলেস আসেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, মজিদের শিক্ষক। স্পষ্ট কথা বলেন। এ জন্য অনেকে তাঁকে পছন্দ করে না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কেমন আছ মজিদ? এখানে এলাম, ভাবলাম তোমাকে দেখে যাই। তোমার স্ত্রী, বাচ্চা ভালো তো?

জি স্যার, আমরা সবাই ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন?

বুড়োকালের আর ভালো থাকা? একটা কিছু লেগেই থাকে। হাইপারটেশন, ডায়াবেটিস কত কিছুতে ভুগছি।

এখন কিছু লিখছেন স্যার?

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের ওপর কাজ করছি। শহীদুল্লাহ সাহেব ফোন করেছিলেন। বললেন, বইটা এখান থেকে ছাপবেন। সেই ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম।

ভালোই হবে স্যার। পুরাকীর্তির ওপর লেখা আপনার আগের বইটি খুব সমাদার পেয়েছে।

ড. মুখলেস মৃদু হাসলেন।

তা তোমার কাজকর্ম ভালোই চলছে? তুমি কিছু লেখ না কেন? ছাত্র থাকাকালে তো কবিতায় তোমার বেশ হাত ছিল।

এখন আর হয়ে ওঠে না।

আমার মনে হয়, ই নগর মানুষের সুকুমারবৃত্তিকে কুরেকুরে খায়।

মজিদ চোখ বিস্ফারিত করে বলে, আমারও তাই মনে হয় স্যার।

ড. মুখলেস কণ্ঠ চড়িয়ে বললেন, এই নগর খেয়ে ফেলেছে মানুষের মননচর্চা। বর্তমান অবস্থায় বড় সমস্যা কি জানো?

মজিদ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকায়, কী স্যার?

সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে দায়িত্বহীন, নীতিবিবর্জিত মানসিক শূন্যতা। মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতিকে শূন্যের কোঠায় এনে ঠেকিয়েছে। তোমার মতো দু-চারজনকে দেখলে স্বস্তি পাই।

মজিদ চুপ করে থাকে। ওর প্রশংসা ওকে তাড়িত করে না। ও মনোযোগ দিয়ে ড. মুখলেসের কথা ভাবে। আসলেই এক সর্বগ্রাসী মানসিক শূন্যতাই চারদিক থেকে বেষ্টন করে আসছে। একজন প্রভুর পেছনে ছুটে যাচ্ছে শত শত অনুগত ভৃত্য। এরা কী করে অন্যদের বড় কথা বলবে? কী করে অন্যদের মেরুদণ্ড টান রাখার কথা শেখাবে? কী করে নিজেদের প্রসারিত ভিক্ষুকের হাতকে উত্তোলিত করতে বলবে?

ড. মুখলেস কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলেন, গতকাল হামিদুর রহমানের কাছে তোমার প্রশংসা করেছিলাম। বলেছিলাম তোমার মতো নিষ্ঠাবান ছেলে দু-চার দশজন থাকলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হতো। ঠিক আছে, কাজ করো। যাই। আবার এলে দেখা হবে।

ড. মুখলেস চলে গেলে মজিদের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। ও বুঝে যায় নথি সময়মতো ঠিক জায়গায় পাঠানোর পরও কেন হামিদুর রহমান ক্ষেপে আছে। ড. মুখলেস যদি বুঝতে পারতেন

https://boierhut.com/fb

তাঁর অকৃত্রিম সত্য ভাষণে হামিদুর রহমানের বুকের প্রান্তরে আগুন জ্বলছে, তা হলে কি তিনি তা বলতেন? হয়তো বলতেন, কারণ এমন তো দু-চারজন থাকেনই। সবাই তো জানে মজিদের পরিশ্রমের ওপর হামিদুর রহমানের কৃতিত্ব। তবুও সত্য কথা বললে নিগ্রহ সইতেই হয়।

ও কাজে মনোযোগী হয়। হাতে কাজ থাকলে সময়টা ভালো কাটে। ও কাজে ডুবে পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করে। তবু ছেলেবেলার অভিমান বুকের মধ্যে খলবলিয়ে ওঠে। কী পাগলামি, মজিদ নিজেকে বোঝায়। মানুষ এমনই, অন্যের ভালোতে হৃদয় দহন হয়। তারাবানুর সুখ দেখে ওরও তো বুক পুড়ে গেছে। ও নিজেও কি খুব বিশাল মানুষ?

তবু ছেলেবেলার অভিমান কাটে না।

তখন বাতাসে উড়তে উড়তে একটা লাল রঙের কাটা ঘুড়ি ওর দরজার সামনে এসে পড়ে। ও প্রবল আতঙ্কে দুচোখ বিস্ফারিত করে লাল ঘুড়ি এবং সাদা সুতোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই তিলোত্তমা নগরী পত্তনের আগে ও এক কাদাজলের গাঁয়ে থাকত। নাটাই হাতে ছুটতে ছুটতে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে যেত। তখন এমন কোনো কালকেতু ছিল না যে নষ্ট করেছিল আইনশৃঙ্খলা, করাপ্ট করেছিল জাতিকে, কিনেছিল পুঁথিপাঠের আসর, দুপায়ে মাড়িয়েছিল পাঠশালাগুলো, জ্যান্ত মানুষকে সুতোয় বেঁধে নাচিয়েছিল নিজের খেয়ালখুশিমাফিক, ব্যবসা দিয়েছিল ভিন দেশকে এবং ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল গাঁয়ের শক্ত মেরুদণ্ড। এখন এই মুহূর্তে ঐ লাল ঘুড়ির সাদা সুতো ওর গলায় ফাঁস হয়ে আটকে গেলে ও ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে দুহাতে মুখ ঢাকে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কারো কারো এমনই জীবন থাকে এবং তারা অনায়াসে সেইসব জীবন উতরে যায়। সেইসব জীবনের চিন্তা তাদের পরবর্তী জীবনকে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করে না। কালকেতুর এমন জীবন ছিল যখন সে শুয়োর কিনে এনে উৎফুল্ল হয়ে থাকত।

শুয়োর কিনে ঘরে ফিরে আসে কালকেতু। নাদুসনুদুস চর্বিসর্বস্ব শুয়োর দেখে ধন্য ধন্য করে সবাই। সবচেয়ে বেশি খুশি ফুল্লরা। আঙিনায় লোক ভেঙে পড়েছে। কালকেতুর শুয়োর দেখছে ওরা। ওমা কী সুন্দর! সবার কণ্ঠে এক ধ্বনি। এমন বুঝি আর হয় না। এমনটি আর দেখিনি। শুয়োরজোড়া কুতকুতে চোখ তুলে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে। কালকেতু বারান্দায় রাজার ভঙ্গিতে বসে আছে। গোঁফজোড়া ঘাড়ের পেছন দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

কত দাম পড়ল কালকেতু?

ও মৃদু হাসে। মনে মনে বলে, দাম দিয়ে কি আর জিনিসের বিচার হয়? ওগুলো আমার শোভা এবং শক্তি বাড়াবে এ জন্যই তো কেনা। ওর একটা নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে। সে সাম্রাজ্য ও নিজের নিয়মে চালায়। আর কারো ধার ধারে না। শিকারে ওর পাকা হাত, বনের পশুপাখি ওর হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে সে যেটা খুশি সেটা মেরে ফেলতে পারে। এ জন্য গাঁয়ের লোকে ওকে সমীহ করে। বলে, কালকেতুর তুলনা হয় না। কালকেতু শুয়োরের দাম বলে না। মৃদু হাসি দিয়ে সবাইকে একটা ধাঁধার মধ্যে রেখে দেয়। ও ব্যাধ, অস্ত্র ও হাতিয়ার, হত্যা ওর প্রয়োজন—তবুও কৌশল অবলম্বন করে। কৌশলে সবাইকে বিভ্রান্ত করে রাখে। এটা ওর চরিত্র এবং এভাবে ওর নিজের চারপাশে লোক জড় হয়। সমাজের সব জায়গা থেকে লোক আসে। চাষি, তাঁতি, জোলা, জেলে, মুচি, দোকানি, ক্ষেতমজুর, কলু, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠুরে, শিকারি কেউ বাদ যায় না। কালকেতুর আত্মপ্রসাদ চরমে ওঠে। বলে, আমি সবাইকে কেমন বিভ্রান্ত করেছি, সব জগাখিচুড়ি করেছি। সবার ওপরে থাকতে হলে কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এখন শুয়োরের দাম নিয়ে যে যেমন খুশি তেমন জল্পনা-কল্পনা করুক, কালকেতু সবার আলোচনার বস্তু হয়ে থাকুক, এটাই ও চায়। যারা এসেছে, তারা নিজেরা সবাই একটি মূল্য নির্ধারণ করে, অকারণ তর্ক করে, কেউ একমত হয়, কেউ একমত হয় না। তারপর যে যার পথে বাড়ি চলে যায়। সবার জিভের ডগায় কালকেতুর নাম নাচতে থাকে।

ফুল্লরা শুয়োর জোড়া নিকটস্থ জলাশয়ে নিয়ে যায়। ওগুলো কাদায় নেমে শরীর রগড়ে আয়েশ করতে থাকে। ও কুরুবক গাছের নিচে বসে সে শোভা দেখে। ওর দৃষ্টি ফেরে না, ও আনন্দে আত্মহারা। কালকেতু উঠোন পেরিয়ে বাড়ির বাইরে আসে। দেখে তখনো এখানে-ওখানে জটলা। এই একটা সূত্র পেয়ে মানবসন্তানেরা অন্য সব কাজ রেখে নিজেদের নিমগ্ন করে রেখেছে। ও

https://boierhut.com/fb

ভেবে আনন্দ পায় যে এই দরিদ্র গ্রামের মানবসন্তানেরা কত নিজস্ব নিয়মে, কত অনায়াসে নিজের মতো করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সে কারণে এইসব মানবসন্তানকে অনায়াসে কবজা করা যায়। ও মনে মনে পরিকল্পনা ভাঁজতে ভাঁজতে মুরারি শীলের বাড়ির দিকে যায়। মুরারি ধারে মাংস নিয়েছে, মাস দুয়েক হয়ে গেল শোধ দেয়নি। আজ ওটা আদায় করে ছাড়তে হবে। বণিক বড় ধুরন্ধর, একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যায়। এই গ্রামের অধিবাসীদের এই আর এক স্বভাব। ধার নিলে আর শোধ করতে চায় না। ধার নেবার সময় শত অনুরোধ, পেয়ে গেলে ভুলে যায়, যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অপকর্ম করার মতো মতি তার হয়নি। মানবসন্তান হয়ে এমন বাজে কাজ কী করে করা যায়, ভাবখানা এমন। গতকাল ফুল্লরা রাগ করে বাকি মাংস বিক্রি করেনি। ঘরে এনে হলুদ লবণ দিয়ে জ্বাল করে রোদে শুকোতে দিয়েছে। মাংসের শুঁটকি বানিয়ে রাখলে বর্ষকালে চড়া দামে বিক্রি করা যায়। যখন একটানা সাত দিন দশ দিন বৃষ্টি হয় অথচ ঘরে কিছু থাকে না তখন অনেকে মানকচুর পাতা মাথায় দিয়ে মাংসের শুঁটকির জন্য আসে। বারান্দায় বসে শুঁটকি বেচে ফুল্লরা, দাঁড়িপাল্লার ওজন একদম ঠিকঠাক, পাকা হিসেবি ও। ভাবতে ভাবতে কালকেতু হন্তদন্ত হয়ে মুরারির বাড়িতে আসে। আগে থেকে ওকে দেখে মুরারি খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মুরারি খুড়ো বাড়ি আছে?

বণিকের বউ হাসি মুখে বেরিয়ে আসে।

তোমার খুড়ো তো বাড়ি ফেরেনি। আর দুটো দিন সবুর করো বাপু, মাংসের কড়ি আমরা তোমার বাড়িতে দিয়ে আসব।

ছিঃ ছিঃ খুড়ি এত কষ্ট করা কি তোমার সাজে? মাংস বাকিতে দিয়ে আমরাই পাপ করেছি। পাপের ভাগ আমাদেরই বহন করতে হবে। তুমি কষ্ট করে যাবে কেন? কাল আমিই আসব। খুড়োকে বলো কড়ি তোমার কাছে রেখে দিতে।

কালকেতুর শ্লেষে মুখ শুকিয়ে যায় বণিকের বউয়ের। শুকনো গলায় বলে, তাই বলব। কালকেতু মোচ ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ি ফেরে। আঙিনায় শুয়োরজোড়া বাঁধা। ওগুলোর শরীর থেকে ময়লা দূর হয়েছে, বেশ চকচকে দেখাচ্ছে। ফুল্লরা গায়ে তেল মাখিয়ে দিয়েছে। ঘরের পেছনে ওগুলোর থাকার জায়গা করা হয়েছে। একদম বেড়ার সঙ্গে লাগোয়া ঘর। নড়লে-চড়লে সাড়া পাওয়া যায়, ঘোঁতঘোঁত শব্দ শোনা যাবে। কালকেতু হরষিত চিত্তে মোচে তা দেয়। ফুল্লরা রান্নাঘরে। আজ কালকেতুর জন্য দশ ব্যঞ্জন রান্না হবে।

কালকেতু এমনই। যখন হাতে কড়ি তখন ধুমধাম করে খায়। যখন থাকে না তখন উপোস দেয়। ও আগামী দিনের চিন্তা করে না। ওর চারপাশের মানবসন্তানরাও এমনই। ঋণ করে ঘি খাওয়া ওদের অভ্যেস। ঋণে ওদের গ্লানি নেই, ঘিতে ওদের আনন্দ। ফুল্লরা আনাজ কোটে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কালকেতু দাঁড়িয়ে থেকে দশ ব্যঞ্জনের নির্দেশ দেয়—নিম শিম বেগুনে তেতো রান্না করো। এই সময়ে সুকতো মধুর লাগে। কুমড়া আর বেগুনের সঙ্গে কাঁঠাল-বিচি দিও। সঙ্গে ফুলবড়ি আর আদারস যেন থাকে। সরিষা তেল দিয়ে কড়াইতে করে শাক রান্না করে, পাঁচফোড়ন দিও। গন্ধে যেন চারদিক ম-ম করে। আশপাশের বিশ ঘরে যেন সে গন্ধ পৌঁছায়। সরিষার তেলে কড়া করে ভাথুয়ার শাক ভাজো, ভালো করে কাঁচা মরিচ দিও। যে পরিমাণ শাক ঠিক সে পরিমাণ মরিচ। ঝালে যেন জিহ্বা পুড়ে যায়। মুসুরির ডাল দিয়ে ঝোল তৈরি করবে, যেন টলটল করে। সেই ঝোলে রসুনের ফোড়ন যেন পদ্মফুলের মতো ভাসে। দু-তিন বাটি আমি এক চুমুকে শেষ করে ফেলতে চাই। গুড় দিয়ে করঞ্জার চাটনি বানাও। টক-ঝাল-মিষ্টিতে সে চাটনি আমার রসনা পরিপাক করে দেবে। মাগো, এখনই জিহ্বায় জল এসে যায়। ফুলবড়ি ঘিয়ে ভেজে গুড়ে মিশিয়ে ভর্তা বানাও। ছোলার ডাল রাঁধো। তাড়াহুড়া করবে না, অল্প জ্বালে অনেকক্ষণ ধরে রাঁধবে। যেন মুখে দিলে গলে যায়, সঙ্গে কুমড়োর বড়ি আর কাঁঠাল-বিচি ভেজে ছড়িয়ে দিও। ঘিয়ে জিরা সাঁতলিয়ে পালঙ্গ রাঁধো। জামিরের রস আর কাসন্দি ছাড়া তো খেতেই পারি না আমি। এই বেলা আমার মতো করে দশ ব্যঞ্জন রাঁধো ফুল্ল বউ।

ধারালো বঁটিতে দ্রুত হাতে আনাজ কাটে ফুল্লরা। স্বামী তার ভোজন রসিক, প্রচুর খেতে পারে। রেঁধে-বেড়ে ওর সুখ। সব সময় হাঁড়ি হাঁড়ি রাঁধতে ইচ্ছে করে। ওর আর কিইবা করার আছে? রাঁধতে না পারলে মন খারাপ হয়। কিন্তু সাধ্য কৈ? এমন দিনও তো যায় যেদিন আধাবেলা চুলো জ্বলে না। মানুষটা একটু হিসেবি হলে এমন বিপাকে পড়তে হয় না। কিন্তু স্বামী তার হিসেবের ধার ধারে না। উড়ে চলতে ভালোবাসে। কালো কুচকুচে মোটা তাগড়া শরীরে নেশা আছে, সে নেশার কোনো তল নেই। ফুল্লরার অনেক কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। রান্না শেষ হলে ব্যঞ্জনের গন্ধ ছড়িয়ে যায় দূরে। হুলো বেড়াল ম্যাঁও শব্দ করে বারান্দার কোণে এসে বসে। ফুল্লরা কাঁসার থালায় বাসমতি চালের ভাত বাড়ে। কালকেতু খেতে বসে পিঁড়ি পেতে। গরম ভাতের ধোঁয়া ওর নাকেমুখে লাগে। দশ ব্যঞ্জনে ওর রসনা আজ পরিতৃপ্ত। ওর খাওয়া ফুরোয় না, দুই সের চালের ভাত খেয়ে ফেলে। এই প্রথম ফুল্লরার মনে হয় মিনসের গ্রাস তালের আঁটির মতো।

খেয়েদেয়ে কালকেতু বারান্দায় বিছানা পেতে চিত হয়ে শুয়ে থাকে। হাত-পা ছড়ানো, থ্যাবড়া পায়ের পাতা, মোটা মোটা আঙুল। লম্বা নখে ময়লা জমে আছে। একটু পর ওর নাক ডাকতে শুরু করে। খেতে খেতে সে শব্দ শোনে ফুল্লরা। ভাবে, মিনসের শয়ন বিটকেলে। হুলোটা ম্যাঁও করে সামনে এগিয়ে আসে। ও দুই মুঠি ভাত ফেলে দেয়। বেড়াল হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভাতের ওপর। ফুল্লরা মুখে ভাত তুলতে পারে না। ভাবে, কালকেতুর নাক ডাকা ঐ ম্যাঁও ধ্বনির মতো? নাকি শুয়োরে ঘোঁতঘোঁত শব্দের মতো। বিয়ের সময় ওর বাবা কালকেতুকে তীরধনুক যৌতুক দিয়েছিল। আশীর্বাদ করে বলেছিল, বীর হও। ফুল্লরা ভেবে পায় না যে পশুপাখি মারলেই কি বীর হওয়া যায়?

https://boierhut.com/fb

বীরের নাক থেকে কি এমন শব্দ নির্গত হয়? ওর মন খারাপ হয়ে যায়। খাওয়া ছাড়া কালকেতু তেমন কিছু বোঝে না। গাছে ফুল ফুটলে তাকিয়ে দেখে না। সুন্দর পাখি দেখলে ওর মাংসের কথাই মনে হয়। ও গাছ ভালোবাসে কাঠের জন্য। শুকনা পাতা কিংবা কাঠ না হলে যে রান্না হয় না। কালকেতুর সবটাই প্রয়োজন। তীরধনুক হাতে নিয়ে ও বেরুলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাও কালকেতু?

আহারের সন্ধানে।

কালকেতু গম্ভীর হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে বলে। এই একটি কথায় ওর প্রবল প্রত্যয় জড়িত। ও জানে মানবসন্তানের আদিম আকাঙ্ক্ষা উদরপূর্তি। এ জন্য রাতদিন পরিশ্রম করতে হয়।

ফুল্লরা আরো দুমুঠো ভাত হুলোকে দেয়। ওটা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফুল্লরার থালার দিকে। চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে। ফুল্লরার গা শিউরে ওঠে। হুলোর তাকানো যেন কেমন। কালকেতুর নাকডাকা প্রবল হয়ে উঠেছে। বাড়িটা নিঝুম। ফুল্লরার ভয় করে।

মিনসের এক অভ্যেস, খেলেই ঘুমিয়ে পড়ে। একটুখানি রাত জাগলে কি যে হয়?

ঘরের পেছনে জলহরি। রাতের বেলা জল আনতে গেলে গা ছমছম করে। দুপুরে হাঁড়িকুঁড়ি মাজতে বসলে কিংবা চান করতে গেলে ভালোই লাগে। রাত হলে যত ঝামেলা। ফুল্লরা সবকিছু গুছিয়ে রান্নাঘরে শেকল তুলে দেয়। হুলো আঙিনায় নেমে গেছে। ওটা প্রতি রাতেই ঝগড়া করে। মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে হয় চ্যালা দিয়ে পিটিয়ে পিঠ ভেঙে দিতে। ফুল্লরার পোষা বেড়ালটা চারটে বাচ্চা দিয়েছে। হুলো ওগুলোকে খাবার জন্য তড়পায়।

ফুল্লরা কুপি নিয়ে ঘরে ঢোকে। কালকেতু পাশ ফিরে শুয়েছে। নাকডাকা বন্ধ। ফুল্লরা মাটিতেই বিছানা পাতে। তেল চিটচিটে বালিশ থেকে কেমন একটা বোটকা গন্ধ আসছে। ওর বহুদিনের ইচ্ছে এক শিশি ফুলের তেল কেনা। তা হলে ঘুমোনোর সময় চুল থেকে সুগন্ধ পাবে, কিন্তু হয় না। কালকেতু এসব কিনতে রাজি নয়। ও বিছানা ঠিক করে কালকেতুর পিঠে ঠেলা দেয়, ওঠো, ঘরে শোবে চলো।

না।

সারারাত এখানে থাকবে?

হ্যাঁ।

ওঠো না?

আহ্ জ্বালিয়ো না বলছি।

কালকেতু প্রবল বিরক্তি প্রকাশ করে। ফুল্লরা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেয়। ফুঁ দিয়ে বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ওকে গ্রাস করে। ও প্রাণপণে ঘুমোনোর চেষ্টা করে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফুল্লরা হাটে মাংস পসরা করে। যেদিন হাট থাকে না সেদিন মাংস নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। গতকাল কালকেতু এক মস্ত হরিণ মেরে এনেছে। হরিণ কেটেকুটে ঠিকঠাক করে ফুল্লরা চুবড়ি ভরে মাংস নিয়ে বের হয়। কালকেতু চামড়াটা লবণ মাখিয়ে শুকনোর ব্যবস্থা করে। নগরে নিয়ে গেলে এই চামড়ার ভালো দাম পাওয়া যাবে। ঘরের খুঁটি উইপোকায় খেয়েছে, সারাতে হবে। কালকেতুর ইচ্ছা দু-চার দিন থেকে ভালো দাম পাবার ব্যবস্থা করবে, না পাওয়া পর্যন্ত ফিরবে না। ফুল্লরা বায়না ধরেছে ফুলের তেল আনার জন্য। শুনে কালকেতুর শরীর চিড়বিড় করে, মেয়েমানুষের কেবল বায়নাক্কা।

চামড়া থেকে উৎকট গন্ধ আসছে, ঝাঁজাল হয়ে উঠেছে মেজাজ। চামড়ায় দুটো ফুটো হয়েছে। ছোট ছোট ফুটো, তেমন খারাপ দেখাচ্ছে না। কাজ করতে করতে ওর খিদে পায়, কিন্তু খাবার কথা এখন ভাবা যাবে না। ফুল্লরা ঘরে নেই। হাঁড়িতে হয়তো আমানি আছে। শুকনো মরিচ ডলে গপগপিয়ে খেয়ে ফেলবে। ও রোদে বসে কাজ করছে। শরীর বেয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে, বুকের খাঁচা ওঠানামা করছে। ও সারাদিন উদোম গায়ে ঘোরে, ওর জামা নেই। শীতের দিনে রোদ ওঠার আগে পর্যন্ত গায়ে কাঁথা জড়িয়ে রাখে। রোদ উঠলে গায়ে কিছু নেই। এ নিয়ে ওর মনে দুঃখ নেই। বরং জামা থাকলে যন্ত্রণা। শিকারের সময় গাছের কাঁটায় বেঁধে যায়, কাঠ চেরার সময় ঘামে ভিজে ওঠে, দীর্ঘপথ হেঁটে গাছের ছায়ায় বসলে খুলে রাখতে হয়। তার চাইতে না থাকতেই আনন্দ। নগরে ঢুকলে ও গায়ে একফালি কাপড় জড়িয়ে নেয়। ফুল্লরা ঘরে ফিরলে ও ফুল্লরাকে বলবে কলাপাতার ছাই দিয়ে কাপড়টা সেদ্ধ করে কেচে দিতে। আজ হাটবার নয়। মাংস নিয়ে ফুল্লরাকে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে। কখন ফিরবে কে জানে? মানবসন্তানদের এত করুণ অবস্থা যে মাংস খাবার কড়ি নেই। অনেকে কাকুতি-মিনতি করে তবেই না বেচতে পারে ও। কালকেতু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওর হাতের কাজ শেষ। চামড়াটা দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে ও শুয়োর দুটো দেখতে যায়। দিন দিন ওগুলো মোটা-তাজা হচ্ছে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রাণী দুটো কাদায় পা রগড়ে ময়লা খাচ্ছে। জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে কালকেতু। ক্ষুদ্রাকায় লেজ দেখতে ওর মজা লাগে। ওগুলো বাচ্চা হলে লেজ ধরে মাথার ওপর দিয়ে বাঁই বাঁই ঘোরাবে।

গাঁয়ের রামপ্রসাদ ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। লোকটার মুদির দোকান আছে, আয় মন্দ নয়। কাউকে এক কড়ি বাকি দেয় না। বাকি চাইতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে।

কেমন আছ কালকেতু?

ভালো। আপনি?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমার আর কি? দিনকাল একরকম গেলেই বাঁচি।

মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন শুনলাম।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। এজন্য তোমার কাছে এলাম। আমাকে দুজোড়া খরগোশ ধরে দিও।

জ্যান্ত খরগোশ কী করবেন?

মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেব।

দামটা সঙ্গে সঙ্গে দেবেন তো?

আমি কি বাকি রাখি? রামপ্রসাদ চটে ওঠে।

জানব কী করে? আগে তো কখনো খরগোশ বিক্রি করিনি।

কালকেতু নির্বিকার উত্তর দেয়।

বেশি কথা শিখেছ দেখছি।

ঠেকে শিখেছি। দেখতে পাচ্ছি বাকির কড়ি আদায় করতে আমার বউয়ের আর একটা জন্ম লাগবে।

হয়েছে, আর কথা বাড়িয়ো না বাপু। নগদ কারবার, খরগোশ দেবে কড়ি নেবে। কালকেতু মোচে তা দিয়ে মাথা নাড়ে। রামপ্রসাদ চলে যায়। ও মনে মনে ঠিক করে যে পাখি ধরার জালটা পাততে হবে। গতকাল লবণিয়ার কাছ থেকে লবণ বাকি এনেছে। ফুল্লরা মাংস বেচতে পারলে সে দামটা শুধতে হবে। নইলে ঐ মানবসন্তান গালি দিয়ে ওর চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করবে। ওর মুখ যখন ছোটে খিস্তির চোটে কেউ দাঁড়াতে পারে না। কোনো শব্দ নেই যা ও উচ্চারণ করতে পারে না। আবার দরকারের সময় একদম গদগদ। পা ধরতে পারে। বেটা নিজেরটা বোঝে বেশি, তার স্বার্থের বাইরে কোনোকিছু ঘটলে সাপের মতো ফুঁসে ওঠে। এমনই লোক তারাকান্ত, জীবনভর নুন বেচেই কাটাল। কিন্তু কখনো কারো গুণ গাইল না। কালকেতু শুয়োর দুটো তাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফেরে। বাড়ির সামনে ভবানির সঙ্গে দেখা। ও কালকেতুর বাড়িতে এসেছিল। বেচারা নিরীহ, কারো সাতে-পাঁচে নেই। ঠাণ্ডা মেজাজ তার, সাত চড়ে রা নেই। কালকেতুকে দেখে বোকার মতো একগাল হাসে। ভবানির মতো মানবসন্তানের জন্য ওর দয়া হয়।

কী খবর ভবানি?

তুমি নগরে যাবে শুনলাম।

হ্যাঁ, আরো তিন-চারদিন পর।

আমিও যাব তোমার সঙ্গে। কতগুলো চাঙাড়ি বানিয়েছি, ওগুলো বিক্রি করব।

যেও, ভালোই হবে। দুজনে গল্প করতে করতে গেলে ভালোই লাগবে।

ভবানি আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কালকেতুর মনে হয় লোকটা এতটা সরল না হলেও পারত। আর একটু বুদ্ধিসম্পন্ন হলে মানাত। চাঙাড়ি বিক্রি করে তেমন কিছু রোজগার

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করতে পারে না। সংসারে বড়ই অভাব। ভবানি চলে যায়। কালকেতু শুয়োরজোড়া খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেয়।

একটু পর ফুল্লরা ফিরে আসে। সব মাংস বিক্রি হয়েছে, তবে অর্ধেক নগদ অর্ধেক বাকি। কিন্তু ওর মন ভালো নেই। কালকেতু ফুলেল তেলের কথা শুনে রাগ ঝেড়েছে। ওর মুখ গম্ভীর, দৃষ্টিতে প্রচণ্ড অভিমান। তুবড়ি বারান্দার ওপর ছুড়ে ফেলে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে, চোখ দিয়ে জল গড়ায়। কড়ি রোজগার করে এনেছে, তবু কি এক শিশি তেল জুটবে না? কালকেতু ফুল্লরাকে দেখে খুশি হয়। তাড়াতাড়িই ফিরেছে বলতে হবে। এখন ভাত রান্না শেষ করলে হয়। কাছে এসে ফুল্লরাকে দেখে অবাক হয়ে বলে, ও ফুল্লু কাঁদ কেন?

কাঁদব না? তুমি আমাকে মোটেই ভালোবাস না?

ভালোবাসা?

কালকেতুর চক্ষু বিস্ফারিত হয়। এত নরম শব্দে ওর কোনো আস্থা নেই। ও জানে সংসারে নারী-পুরুষের প্রয়োজন, দুজনে ঘর বাঁধে, মিলেমিশে থাকে মানবজীবন টিকিয়ে রাখার জন্য। এর জন্য আবার ঐসব প্যানপ্যানানি শব্দ কেন? কিন্তু মুহূর্তর মধ্যে ও লাফিয়ে উঠে বুকের ছাতি প্রসারিত করে বলে, ভালোবাসা? হ্যাঁ, ভাত খেতে যেমন ভালোবাসি, তোমাকে আমি তেমনই ভালোবাসি গো।

ফুল্লরা ঠোঁট ওলটায়, মরণ! কেবল খিদে। মিনসে তুমি পেটের কথা ভুলতে পার না?

না, পারি না, একদম পারি না। চারটে ভাত বসাও। সেই কখন থেকে উদরে আগুন। জ্বালা সইতে পারি না গো।

পারব না। আমানি আছে তাই দিয়ে এই বেলা চলবে।

ভালো হবে না ফুল্লু বউ।

কী করবে শুনি?

গলায় দড়ি দেব। রাঁড়ি হওয়ার জ্বালা বুঝবে?

ফুল্লরা মুখ বেঁকিয়ে বলে, তাও বলবে না যে এক শিশি তেল আনবে।

ঘরের খুঁটি উইপোকা কেটেছে?

কাটুক। ভেঙে পড়ুক।

আষাঢ় মাসে ঘরে চাউল থাকে না।

তোমার তালের আঁটির গ্রাস হবে না এই তো?

কেবল চটাং চটাং কথা। ঠিক আছে ভাত আমি রাঁধব। দেখি পারি কি না।

রাঁধ গে।

ফুল্লরা দুপদাপ ঘরে ঢুকে যায়। কালকেতু উনুন জ্বালাতে বসে পুরো বাড়ি ধোঁয়ায় ভরে ফেলে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

৭

কালকেতু শিকারে যাচ্ছে। ওর হাতে অস্ত্র।

ওর অস্ত্র তীর-ধনুক। পিঠের ওপর তীর বোঝাই তূণ। ওর জিঘাংসা প্রবল, হত্যার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ইদানীং সেটা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। বনের পশুপাখি ওকে দেখলে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটতে থাকে।

কালকেতু পুরো শরীরে সরষের তেল মালিশ করেছে। রোদে চকচক করছে শরীর। ঘাড়ের পেছনে মোট বেঁধে নিয়েছে। ওকে একজন বীরের মতো দেখাচ্ছে, যুদ্ধজয়ের নেশায় ছুটে যাওয়া বীর। সামনে শত্রু ঘায়েল না করে ফিরে আসবে না এমন প্রতিজ্ঞা চোখেমুখে। ওর সঙ্গী নীলরতন, বাসুকি আর তারিণী।

প্রথমেই ওরা বনের মধ্যে জাল পাতে। রামপ্রসাদের জন্য খরগোশ ধরতে হবে। বেড় দিয়ে খরগোশ তাড়া করবে নীলরতন। বাসুকি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। ওগুলো জালে ঢুকলে ভিতু প্রাণীগুলোকে আটকাবে কালকেতু। যেগুলো ঢুকবে না সেগুলোকে তীরের ঘায়ে ধরাশায়ী করবে ও। এই কাজটা ও পছন্দ করে না। পশুর পেছনে উদ্দাম ছুটে শিকার করা ভালো লাগে। কিন্তু এ কাজটা না করেও উপায় নেই। রামপ্রসাদের কাছ থেকে বেশ কিছু কড়ি আদায় করবে। তাই কিছুটা সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যয় করতে হবে। ও নাগেশ্বর গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। পাশ দিয়ে গায় দৌড়ে যায়। ওদিকে ও খেয়াল দেয় না। একটা বনরুই ঘোরাফেরা করে। প্রাণীটি নাগেশ্বর গাছের কোটরে পিঁপড়ে ধরার চেষ্টা করছে। কালকেতু একবার তাকিয়ে হাসে। গায়ে রুই মাছের মতো বড় বড় আঁশ, সজারুর মতো চেহারা, ধরতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে গোল হয়ে যায়। ও উপেক্ষার হাসি হাসে এ ভেবে যে, প্রাণীটি এখনো ওকে খেয়াল করেনি। পিপড়ে ধরার চেষ্টায় অন্যদিকে নজর নেই। এক সময় ও বিরক্ত হয়ে যায়। খপ করে প্রাণীটিকে ধরে ঘাড় মটকে দূরে ছুড়ে ফেলে। রক্তে হাত লাল হয়ে যায়, ও ঘাসে মুছে ফেলে। দূরে কাড়া-পড়া পিটাচ্ছে তারিণী। সেই শব্দে ছুটে আসছে খরগোশ। হুড়হুড় করে জালে ঢুকে যায় দশ-বারটা। কালকেতু দ্রুত হাতে দড়ি দিয়ে মুখ বেঁধে ফেলে। একটি পর্ব শেষ। এখন ওর পরিশ্রমের পালা।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নির্মেঘ আকাশ, রোদের প্রচণ্ড দাপট। গাছপালার ফাঁক-ফোকর বলে রোদের তেজ কম। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক কুক্কুভ উড়ে যায়। ও কপালের ঘাম মোছে।

তোরা এগুলো খাঁচায় ভরে নে, আমি চললাম।

দেখো ছুটতে ছুটতে আবার বিঞ্জু বনে চলে যেও না।

ভয় কি? গেলামই বা?

ফিরতে পারবে তো?

কালকেতু বাঁকা হাসি হেসে বলে, আমি ভাঙর-মোতি নই। ঘটে কিছু আছে।

কালকেতু আর দাঁড়ায় না। ও খুব দ্রুত চারপাশে চোখ বুলিয়ে নেয়। এপাশ থেকে ওপাশে একটা শৃগাল দৌড়ে যায়। কোথাও হরিণ নেই, বাঘ নেই, কালসার, গায় কিছুই নেই। ওর মেজাজ খারাপ হতে থাকে। মাথার ওপর শঙ্খচিল ওড়ে। হাতের কাছে একটা সজারু পেয়ে ও ঘাড় মটকে দূরে ফেলে দেয়।

যত্তসব। আজ দগ্ধা তিথি। এক্কেবারে অশুভ দিন।

কালকেতুর ভেতরটা গরগর করে। ও পর্কটি গাছের ছায়ায় বসে। অনেকটা পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেছে। মাথায় ঘূর্ণিচক্কর দিচ্ছে। পর্কটি গাছের কাণ্ডে কাঠবিড়ালকে লাফালাফি করতে দেখে মুহূর্তে মেজাজ বিগড়ে যায়। কোমর থেকে কাঠ-দা খুলে কয়েকটাকে টুকরো টুকরো করে মাটিতে পুঁতে রাখে। ও এলোপাতাড়ি গাছ কাটে, ঝোপ কাটে এবং একটা কালসার দেখতে পেয়ে ওটার পেছনে ছুটতে শুরু করে।

আজ তোর একদিন কি আমার একদিন, ছাড়াছাড়ি নেই। সারাদিন লাগলেও ছাড়ব না।

তীরের মতো ছোটে ও। থুপি-থুপি ঘাস পায়ের নিচে মাড়িয়ে যায়, কাঁটাঝোপে হাত-পা ছেঁড়ে, গাড়িতে পা পড়ে গোড়ালি মচকে যায়। ও তখন কালসারের আশা ত্যাগ করে। কিন্তু উন্মক্ত হয়ে ওঠে। শরীরে জ্বালা, পায়ে ব্যথা কোনোকিছুই ওর ভ্রুক্ষেপে আসে না।

হাতের কাছে যা পায় একাধারে তার নিধন শুরু করে। মারা পড়ে শৃগাল, সরীসৃপ, সজারু, বনবিড়াল, বেজি, গোনস, ভালুক এবং গণ্ডক। জিঘাংসায় দিশেহারা হয়ে যায় ও। যা ওর কাম্য তা হাতের মুঠোয় পায়নি। কালসারটা কোন্ ঝোপের আড়ালে যে লুকিয়ে গেল তা ও হদিসই করতে পারল না। কাঠ-দা সিদ্ধান্তে আসে যে ক্ষমতাবান মানবসন্তান কোনো বিরোধিতা সহ্য করে না। বিরোধিতা পেলে তারা নৃংশস হয়ে ওঠে। এটাই তাদের ধর্ম। নৃশংস হয়ে জয়ী হওয়াটাই এখন ওর কাঙ্ক্ষিত। যাদের হাতে অস্ত্র থাকে তারা বিরোধিতা সহ্য করবে কেন? যে অস্ত্রধারী সেই প্রভু।

কালকেতু রক্তমাখা কাঠ-দা ঘাসে মুছে নিয়ে কোমরে বেঁধে নেয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কাল আবার দ্বিগুণ বিক্রমে চালাবে। পিছু হটতে রাজি নয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটার দৃশ্য ক'জনই বা দেখতে পায়? যারা রক্ত ভালোবাসে তারা এ দৃশ্য দেখে উৎফুল্ল হয়, অনাবিল আনন্দে ওদের হৃদয়

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভরে থাকে। কালকেতুর এখন তেমন অবস্থা। এই দৃশ্য দেখলে ওর আনন্দ স্তব্ধ হয়ে থাকে। কারণ স্তব্ধতার মধ্যে ও আনন্দকে ধরে রাখতে চায় দীর্ঘ সময়। গান গেয়ে কিংবা শিস বাজিয়ে ও তা প্রকাশ করতে পারে না। ওর দড়ি খুলে সেগুলো বেঁধে নেয়। পিঠের ওপর ঝুলিয়ে দপদপিয়ে হেঁটে ও ওদের কাছে আসে।

তিনজনই ভাং খেয়ে নেশায় চুর হয়ে তুমুল কলরবে বন মাতিয়ে রেখেছে। কালকেতু কান খাড়া করে শুনে খেপে যায়। ওরা কালকেতুর বিরুদ্ধে খিস্তিখেঁউড়ের তুবড়ি ছুটিয়েছে। ওর কান গরম হয়ে ওঠে।

দমাদম ওদের পাছায় কতগুলো লাথি দিয়ে বলে, শুয়োরের বাচ্চারা মৌজ করার জায়গা পাও না?

নীলরতন রক্তচক্ষু তুলে তাকায়। বলে, তুমি আমাদের ভগ্নিপতি, তোমার শ্বশুর আমাদের বাবা। মাইরি বলছি, বেশি তেজ দেখিয়ো না।

দেব শেষ করে।

কালকেতু কোমর থেকে কাঠ-দা খুলতে চায়। তারিণী আর বাসুকি ওর পা জড়িয়ে ধরে। ওরা কিছুটা প্রকৃতিস্থ।

রাগলে কি চলে দাদা? এই আধমরারা তো এমন করেই তোমার সেবক।

তোরা জো হুকুমের দল, মাথা নুইয়ে থাকবি। মাথা তুলবি কি কুপিয়ে শেষ করে ফেলব।

নীলরতন ওর পা জড়িয়ে ধরে, বনে এলে তুমি রাজা হয়ে যাও। ক্ষমা করে দিও।

কালকেতু এক ঝটকায় পা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, ওঠ, দাঁড়া তোরা। ফের যদি বনে এসে নেশা করবি তো ধড়ে মুণ্ডু থাকবে না কারো।

তিনজনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ তোমাকে বীরের মতো লাগছে। কত পাখি মেরেছ। আমরা সবাই কুটে-বেছে মাংস বানিয়ে দেব।

নীলরতন চোখ বন্ধ করে গদগদ ভাষায় বলে, তুমি এমন রাজা হলে তোমার দাস হলেও সুখ। আমাদের আর কী? আমরা তোমার হাসিমুখ দেখলেই বর্তে যাই।

আজ বুঝি বন তছনছ করে ফেলছ? এ শুধু তুমিই পার। তোমার মতো আর কেউ নেই।

ইচ্ছে করে বনের সব ফুল গেঁথে তোমার গলায় মালার পাহাড় গড়ে দেই।

কালকেতুর মেজাজ ঠিক হতে শুরু করে। এত স্তুতিবাক্যে কে না প্রীত হয়? ও তো সামান্য ব্যাধ, নিচ কুলে জন্ম, দরিদ্রের সংসার। বউ হাটে-বাটে কিংবা বাড়ি বাড়ি মাংস ফেরি করে। জনমভর ওর সঞ্চয় শুধু পাপ, পুণ্য আর হলো কৈ? কালকেতু দরাজ দিলে বাড়ি ফেরে। খুশি আর ধরে না। মানবসন্তানরা এমন করে তোয়াজ করে না বলেই তো মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

https://boierhut.com/fb

রামপ্রসাদকে খরগোশ দিয়ে মেলা কড়ি বাগিয়ে ঘরে ফিরলে অত পাখি দেখে ফুল্লরার চক্ষু চড়ক গাছ, মাগো এত?

হ্যাঁ দৌদি, আজ দাদা রাজা হয়ে ঘরে ফিরেছে। তোমার আর দুঃখ কী? নাও ধরো। কী সুন্দর রংবেরঙের পাখি। পালক দিয়ে আমি পাখা বানাব।

ওরা তিনজন পাখি কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাংসের ভাগ নিয়ে তবে ওরা যাবে। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত কালকেতু একথালা কাঞ্জি নিয়ে খেতে বসেছে।

পরদিন ও আবার শিকারে যায়। আজ আর জাল পাতা নয়। সরাসরি আক্রমণ, কচুকাটা হয়ে যায় ছোট প্রাণীগুলো। বড় একটা কালসার মেরে আজ ও ক্ষান্ত হয়। কৃতিত্বে, গর্বে কালকেতুর বুকের ছাতি প্রসারিত হয়, নাকের ফুটো ফুলে ওঠে। আজ আর নীলরতনের সঙ্গে ভাগ নেই। ওরা হুকুমের দাস হয়ে পিছু পিছু ছুটছে। কালকেতুর শরীর বেয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরে। কালসারটা মাটির ওর নিথর পড়ে আছে, চোখ বোজা। আজ বনে কাড়া পড়ার শব্দ নেই। অল্পক্ষণের মধ্যে পশুপাখির চলাচল স্তব্ধ হয়ে গেছে। অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারদিক। কালকেতুর মনে হয় বাতাস থেমে গেছে, সূর্যের আলো নমনীয়, গাছের পাতা নড়ে না, ও আজ এই সাম্রাজ্যের অধিপতি। ওর হুকুম ছাড়া কোনোকিছু ঘটবে না।

নীলরতন?

কালকেতুর কণ্ঠে প্রভুত্ব, ও শাসন চায়। নীলরতন ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে।

এখন থেকে আমাকে আর তুমি করে বলবি না।

বলব না।

ভাং খেয়ে সামনে আসবি না?

আসব না।

আমার হুকুম ছাড়া নড়বি না?

নড়ব না।

নীলরতন থরথর করে কাঁপে। ও বুঝতে পারে বনে কালকেতু সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায়। এখন কালকেতু নিষ্ঠুর, ভয়াবহ এবং অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ও শুধু পশুপাখি নয়, অবলীলায় খুন করতে পারে মানুষও। নীলরতন চোখ বুজে ফেলে। ও দেখতে চায় না কালকেতুর পরিবর্তন। মানতে চায় না ওর শাসন। কিন্তু এই মুহূর্তে উপায় নেই। না মানলে হয়তো ধড়-মুণ্ডু আলাদা করে মাটিতে পুঁতে চলে যাবে ও।

চল, ঘরে ফিরি।

https://boierhut.com/fb

কালকেতুর হুকুমে ওরা কালসারটার দুপায়ের ভেতর দিয়ে বাঁশ ঢুকিয়ে কাঁধে তুলে নেয়। জন্তু বয়ে নিয়ে যাবার সময় ওরা মুখে এক ধরনের হুম হুম শব্দ করে। আজ ওদের বুকে ভয়, মুখ দিয়ে শব্দ হয় না। যেতে যেতে কালকেতু নিজেকে প্রশ্ন করে—

তুমি কী চাও কালকেতু?

সাম্রাজ্য।-

তুমি কী চাও কালকেতু?

প্রভুত্ব।

তুমি কী চাও কালকেতু?

হুকুমের দাসের পারিষদ।

তুমি কী চাও কালকেতু?

অগণিত প্রজা।

আর কী চাও কালকেতু?

গলা বোঝাই ফুলের মালা।

প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পেরে ও কাট-দায়ে হাত রাখে। তারপর হাঁক দিয়ে ডাকে, নীলরতন?

ওরা তিনজনে থামকে দাঁড়ায়, মুখে কথা নেই। ওরা এখনো বন পার হয়নি, তাই সাহস নেই। গাঁয়ে ফিরলে হয়তো ওদের সাহস বাড়বে। কালকেতু প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমি ব্যাধ। প্রাণী হত্যা আমার অধিকার, এতে কোনো অন্যায় নেই।

ওরা তিনজনে বেগে মাথা নাড়ে, ঠিক বলেছেন।

আমার অধিকারের বিরোধিতা আমি সহ্য করব না।

নিশ্চয়ই না।

ওরা প্রবলবেগে মাথা নাড়লে বাঁশের মধ্যে কালসারের মৃতদেহ আন্দোলিত হয়। সেদিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসে কালকেতু।

নিজেকে বলে, তোমার কি মনে হয় তুমি এখন একজন পরিপূর্ণ মানবসন্তান?

এখনো নই। আমার অনেক পাওনা রয়েছে।

তুমি কি তা পাবে কালকেতু?

পেতেই হবে, তা আদায় করে নিতে হবে।

কীভাবে?

ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক।

ধন্য, ধন্য তুমি কালকেতু।

https://boierhut.com/fb

কান-দিগন্তের হয়ে ধন্য ধন্য শব্দ চরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়। ওর মনে হয়

ওর মাটিতে পা পড়ছে না, ও হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে।

বিরাট টেবিলের মাথায় সভাপতির আসনে বসে কালকেতু শুনতে পায় ধন্য ধন্য শব্দ। সভাকক্ষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে ধ্বনি। হুকুমের দাসের পারিষদ ও পেয়েছে। এদের দিয়ে যে কোনো কাজ করানো সম্ভব। কে বলে কালকেতু পূর্বের জীবনের কথা ভুলে যায়? কিছুই ভোলে না। দরকার মতো বিশেষ জায়গায় স্মরণ করে সেখান থেকে সাহস সঞ্চয় করে। নগর গড়ার স্বপ্ন তো ওর অনেক দিনের। এখন ও সেই নগরের অধিপতি। তেমন কেউ তো নেই যাকে ও নিজের যোগ্য ভাবতে পারে। ওর কাকে ভয়?

ও একে একে পরিষদের সদস্যদের মুখের দিকে তাকায়। প্রত্যেকের চেহারার বলিরেখা সন্ত্রস্ত, চিন্তাক্লিষ্ট, উদ্বিগ্ন; যে যার পদ আঁকড়ে থাকার চিন্তায় মগ্ন। কেউ কালকেতুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। খাদ্যসমস্যা নিয়ে কালকেতু জরুরি সভা ডেকেছে। কোন কোন দেশের কাছে চাল চাইবে সে আলোচনা আছে, কাকে কোন দেশে পাঠালে কাজ হবে সেটাও ঠিক করতে হবে। সে অনুযায়ী সভার কাজ সেভাবেই এগুচ্ছে। ভিনদেশ থেকে চাল সংগ্রহের চেষ্টা সফল হবে বলে কালকেতু মোটামুটি উৎফুল্ল। নগরের একটি লোকও না খেয়ে মরবে না। এটা কালকেতুর প্রতিজ্ঞা। সভার প্রায় শেষ পর্যায়ে মালু মিস্ত্রির মাথাটা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ইদানীং ও নগরের আবাদযোগ্য জমি নিয়ে কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনা করছে। ওরা সারের ওপর কর বাড়িয়েছে এটা ওর পছন্দ হয়নি। কৃষকের হাতে ভালো জাতের গরু এবং লাঙল দিতে পারলে, উপযুক্ত পরিমাণে সার ও পানির ব্যবস্থা করতে পারলে তো নিজের দেশের খাদ্যের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারবে, ভিনদেশের কাছে চাইতে হবে কেন? মালু মিস্ত্রির বুক ভারী হয়ে থাকে। ও দেখেছে যারা ভিনদেশে খাদ্যশস্য চাইতে যাবে, বিদেশ ভ্রমণের লোভে ওদের চোখ চকচক করে। ঐ লোভী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নিজের ওপর প্রবল ঘৃণা হয় মালু মিস্ত্রির। ইচ্ছে করে এই মানবজীবন শেষ করে ফেলতে। ও স্ত্রী ছেলেমেয়ের কথা ভুলে যায়। ভেতরের অন্তর্গত সম্ভ্রমে প্রবল ঘা পড়ে। দেখতে পায় দিগন্তজুড়ে নিরন্ন মানুষের ছবি। টলে ওঠে মাথা। কালকেতু কী নিয়ে যেন রসিকতা করেছে, ও সেটা শুনতে পায় না। প্রবল হাসির ঢেউ গড়িয়ে যায় সদস্যদের চোয়ালে। ও তখন টেবিল চাপড়ে বলে, স্যার একটা কথা? ওর কথা কেউ শুনতে পায় না। কালকেতু প্রবল অহঙ্কারী স্বরে বলে, আমি সাহায্যের নামে এই নগরের জন্য অর্থ আনি। নগরকে ঢেলে সাজাব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগর হবে এটি।

মালু মিস্ত্রি আবার কথা বলার চেষ্টা করে। উত্তেজনার তোড়ে সেটাও অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তখন ও চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ায়, স্যার?

সবার দৃষ্টি ঘুরে যায় ওর দিকে। ও হাত-পা নেড়ে কথা বলে। ওর মুখ দিয়ে থুতু ছিটায়।

https://boierhut.com/fb

স্যার, আমাদের নিজেদের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এ পলিমাটি উর্বর ভূমিগুলোতে যথাযথ কর্ষণের অভাবে ধানের ফলন তেমন হয় না।

কালকেতুর চোখ দিয়ে আগুন ঝরে। ধমক দিয়ে বলে, আপনি বসুন।

মালু মিস্ত্রি দাঁড়িয়ে থেকে গলগলিয়ে বলে যায়, শুধু ভিনদেশের কাছে হাত পাতা নয়। আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ভিক্ষার অন্ন আমরা আর গলা দিয়ে নামাতে চাই না।

কী বললেন? সেপাই।

কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনী এসে মালু মিস্ত্রিকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। ও তখন সমানে চেঁচাচ্ছে, আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আমাদের ইতিহাস ভুলে যাওয়া উচিত নয়। একসময় আমাদের গোলা ভরা ধান ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল। আমাদের মসলিন ছিল, রেশম ছিল।

কালকেতুর বিস্ময় কাটে না, স্ট্রেঞ্জড, ও কি পাগল হয়ে গেল?

ভাঁড়ু দত্ত সোৎসাহে বলে, জি স্যার কিছুদিন ধরে ঐ রকম লক্ষণই টের পাচ্ছিলাম আমরা। কেমন আবোলতাবোল কথা বলত।

কৈ আমাকে তো বলেননি?

আপনাকে বলা হয়নি।

ভাঁড়ু দত্ত চোখ নিচু করে।

ও ইদানীং কেমন মোটা মোটা বই পড়ত। অবশ্য একসময় নিজে পাঠশালার সেরা ছাত্র ছিল।

কালকেতু গম্ভীর হয়ে থাকে। কী যেন ভাবে, মাথার ভেতরে বজ্রপাতের ধ্বনি। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। যে নিজের মতো করে কথা বলবে তাকে হজম করে ফেলতে হবে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশের পত্রিকায় মালু মিস্ত্রির ছবিসহ সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে।

কালকেতু ভুরু কুঁচকে তাকায় কেমন?

ওর মতো বড় অর্থনীতিবিদ নাকি আমাদের মতো দু-দশটা দেশে নেই।

তাই নাকি? কালকেতুর কণ্ঠে প্রবল ব্যঙ্গ। তা হলে ও আমার পরিষদের উপযুক্ত নয়। আমার দরবারে প্রতিভাবানদের ঠাঁই নেই।

আপনি পড়বেন স্যার লেখাটি?

পড়ব? দেশে পাঠযোগ্য কিছু নেই বলেই তো আমি পড়ি না।

জি স্যার, ঠিক।

সবাই একযোগে মাথা নাড়ে। কালকেতু কিছু বলে না। ঘরজুড়ে নীরবতা। একসময় ও বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শুনুন, আমি ঠিক করেছি ভূমিহীনদের জমি দেব। ভাঁড়ু দত্ত লাফিয়ে ওঠে, খুব ভালো আইডিয়া স্যার। ও জানে কিছুদিন আগে এমন একটা প্রস্তাব দিয়ে মালু মিস্ত্রি সবার উপহাসের পাত্র হয়েছিল।

আপনি স্যার সব সময় চমৎকার প্ল্যান দেন।

কারো মুখে গদগদ ভাব। কালকেতু তৃপ্তির হাসি হেসে বলে, সারাক্ষণই তো নগরের কথা ভাবি। অনেক রাতেই আমি ঘুমুতে পারি না। নগরের জন্য কী করব এই চিন্তা আমাকে পাগল করে দেয়।

স্যার আপনি আছেন বলেই তো এই নগর এবং আমরাও বেঁচে আছি।

শুনুন ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার দায়িত্বটা ভাঁড়ু দত্ত আপনাকেই নিতে হবে, সেজন্য আমার পরিষদের একটা রদবদল প্রয়োজন।

জি স্যার। তাই করুন।

ভাঁড়ু দত্ত ফ্যাল ফ্যাল করে কালকেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই সুযোগে জমি এবং একটা মোটা টাকা আদায়ের দায়িত্ব কালকেতু ওকেই দিল। পরক্ষণে কালকেতুর মুখটা ফুল্লরার মুখ হয়ে যায়। ফুল্লরা যেন এক অদ্ভুত হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ভাঁড়ু দত্তের দিকে। ভাঁড়ুর চোখের তারা কাঁপে। পরিষদের অন্য সদস্যদের বুকের ধুকধুকি বেড়ে যায়। সবাই নিশ্চুপ বসে থাকে। ঘরের ভেতরের প্রবল অস্বস্তি তাড়ানোর জন্য কালকেতু মাথা নেড়ে হেসে বলে, শুনুন, আমি ঠিক করেছি আগামী বসন্তকালে আমরা একটি বসন্ত উৎসব করব।

সবাই একবাক্যে বলে, চমৎকার হবে।

স্যার আমাদের মৃণালিনী চমৎকার গায়।

কালকেতু আঙুল উঁচিয়ে ধমকের সুরে বলে, মনে রাখবেন, কে ভালো গায় তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। সুন্দরী মেয়ে চাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। লাবণ্যে ঢল ঢল মুখ এবং চমৎকার ফিগার। আমি শ্রবণ-সুখের চাইতে দৃষ্টি-সুখকে বেশি প্রাধান্য দেই।

সবাই থতমত খেয়ে যায়। এতকাল তো জানা ছিল গুণের কদর বেশি। তা ছাড়া গান যে ভালো গাইবে তারই তো দাম হওয়া উচিত। কিন্তু এই নতুন ধরনের কথায় কারো মুখ দিয়ে কথা সরে না। কেউ কোনো আপত্তিও জানায় না। ভাঁড়ু দত্ত খুশি। কালকেতু বেশ নতুন ধরনের কথা বলতে পারে। এমন লোকই তো চাই যে সবকিছুকে জগাখিচুড়ি বানাবে। যতদিন ক্ষমতায় থাকা যায় ততদিনই মজা, ততদিনই স্বর্গসুখ। সভা ভেঙে গেলে কালকেতু নিজস্ব কক্ষে প্রবেশ করে। ভাঁড়ু দত্ত পিছু পিছু যায়। বাকিদের হাঁটু কাঁপে, মুখ পাংশু বিবর্ণ। আগামী রদবদলে নিজের পদটি থাকবে তো? কালকেতু এভাবেই রদবদল করে। কখন যে কে কীভাবে লাথি খায় খবরই পাওয়া যায় না। কালকেতুর নিজস্ব গোপন সংস্থাটি অত্যন্ত সক্রিয়। একবার একটি ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেলে সেই সংস্থার একজনের ফাঁসি হয়েছিল। পরিষদের সদস্যরা নিজেদের বিপদ কাটিয়ে ওঠার সময় প্রত্যেককে এত বেশি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে, মালু মিস্ত্রির ব্যাপারটা ওদের মাথা থেকে নেমে

https://boierhut.com/fb

যায়। ওরা কেউ মালু মিস্ত্রির কথা ভাবে না। কিংবা ভাবতে চায় না। কিংবা অপরের জন্য ভাবাটিকে ওরা আবেগের বাড়াবাড়ি মনে করে।

৮

অফিসে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় মজিদ। আটের কলামে বক্স করে ছাপা হয়েছে খবরটা। দুর্নীতির দায়ে মালু মিস্ত্রি গ্রেফতার। পরিষদ সদস্যদের দপ্তরের রদবদল। ভাঁড়ু দত্তকে ভূমির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মজিদ খবরের কাগজ হাতে নিচে চুপ করে বসে থাকে। কারণ, একই সঙ্গে আরো একটি খবর ছাপা হয়েছে যে, ভূমিহীনদের জমি দেওয়া হবে। অর্থাৎ ভাঁড়ু দত্তের পোয়াবারো। সেইসঙ্গে আখের গোছাবে ফুল্লরা। কত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে কালকেতু। কেউ বুঝতেই পারবে না যে, কোথাকার পানি ও কোথায় গড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এসবের বাইরে মালু মিস্ত্রির ব্যাপারটা ওকে মর্মাহত করে। এই একটি লোককে স্পষ্টবাদী বলে জানে নগরের অধিবাসী। শুধু তাই নয়, লেখাপড়া জানে, পড়াশোনা করে। দুর্নীতি নয়, সবটাই ভাঁওতা। ভেতরে কালকেতুর কোনো কূটচাল আছে। পরক্ষণে ও ভাবে, আক্ষেপ করে লাভ নেই। যারা প্রভু থেকে ক্রীতদাস হতে চায় তাদের এমন সাজাই প্রাপ্য। এরা নিজেরাই খাল কেটে কুমির আনে। মালু মিস্ত্রি তো জেনেশুনেই নিজেকে বিকিয়েছিল। তা ছাড়া কালকেতুর কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করাই সঙ্গত। মাঠে থাকে বাইশজোড়া পা এবং একটি ফুটবল। কালকেতুর মাঠে আছে বাইশজোড়া ফুটবল এবং একটি পা। ওর খেলার নিয়মকানুন নেই। ও যাকে খুশি তাকেই এক লাথিতে গোলে পাঠিয়ে দেয়। সে বল আর মাঠে ফেরত আসে না।

কাগজ পড়া হলে ও একপাশে রেখে অফিসের কাজে মন দেয়। কিন্তু বেশিক্ষণ কাজ করা হয় না। বশীর এসে হাজির হয়। অফিসের কাজে কয়েকদিন আগে বাইরে গিয়েছিল ও। ফিরে এসেছে ভুইল্যা ভর্তি কয়েক প্যাকেট ফ্ল্যাগ সিগারেট নিয়ে। ও মজিদকে একটা শলাকা দেয়। বলে, টেনে দেখুন তো। জানেন মজিদ ভাই, এই শুকনো নেশা দারুণ। টানলেই বুঝবেন। নগরের অলিতে গলিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে। পান-বিড়ির দোকান থেকে শুরু করে অভিজাত দোকানেও পাওয়া যায়। এক কাঠির দাম এক টাকা।

ভুইল্যা নাম হলো কেন?

তা তো বলতে পারব না। স্থানীয় লোকেরা বলছিল আমিও সেটাই শিখেছি। তবে আমার মনে হয়, খেলে সব ভুলে যাওয়া যায় তো সেজন্যই বোধহয় ভুইল্যা।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কী দিয়ে তৈরি?

নিম্নমানের সিগারেটের তামাকের সঙ্গে গাঁজার পাইল করে বানানো।

খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে?

তা কি হয়? লুকিয়ে চলছে। আড়াই টাকা দাম লেখা ফ্ল্যাগ সিগারেটে দশটি কাঠি ভরে দিয়ে দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি এই ব্যবসা করে দুপয়সা কামাব।

বশীর উঠে গেলে মজিদ শলাকাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এখানেই এটা ধরানো উচিত। ঘরে গিয়ে টানলে রঞ্জনা টের পেয়ে যাবে এবং হৈচৈ করবে। ও দিয়াশলাই জ্বালিয়ে ধরায়। দুটো টান দিতেই প্রবল কাশিতে ওর গলা ভরে ওঠে, মুখ তেতো হয়ে যায়।

কাশি থামলেও আবার চেষ্টা করে, আবার, না, হয় না। ইয়াসিন সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, কর্মবীর পারছেন না, না?

মজিদ কাশির তোড়ে কথা বলতে পারে না।

বুঝেছি কর্মবীরের সব কর্ম কাগজে-কলমে, অন্যত্র নয়। আরে মশাই এনজয় করতে শিখুন। এসব না পারলে জীবনযাপন মিথ্যা।

কাশতে কাশতে মজিদের চোখে পানি এসে যায়। ও বাম হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে, আসলেই পারলাম না।

নথি লিখলেই আর পাণ্ডুলিপি দেখলেই চলবে?

ইয়াসিনের ব্যঙ্গ ও গায়ে মাখে না। ইয়াসিন তো জানে না আসলেই জীবনের বাকি জায়গাগুলোয় ও পরাজিত হয়ে যায়। এনজয়মেন্ট? কীভাবে? ইয়াসিন কি জানে ওর ঘরে রঞ্জনার মতো বউ আছে? যার শরীর এক দূরাগত স্বপ্ন? যাকে পেতে হলে অন্য কারো কথা ভেবে দেখার কথা বলতে হয়।

হয়েছে, অনেক হয়েছে। ফেলে দিন। আপনার চোখ লাল হয়ে গেছে। তা ছাড়া বস জানতে পারলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

মজিদের বিবমিষা হয়। ও শলাকাটি দরজা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে বাথরুমে গিয়ে চোখে পানি দিতেই ঝিমঝিম ভাব কেটে যায়। ও আবার প্রুফ দেখায় মগ্ন হয়। কিছু কিছু জায়গা আছে যেটা ওর একদম নিজস্ব। যেখানে কেউ প্রবেশ করে ওকে উলটেপালটে দিতে পারে না।

পিয়ন এসে খবর দেয় হামিদুর রহমান ডাকছে। আবার হামিদুর রহমান। এই লোকটা আজ ওর পেছনে লেগেছে। মজিদ মনে মনে যত বিরক্তই হোক সেটা প্রকাশ করতে পারে না। পিয়নকে যেতে বলে ও আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর হামিদুর রহমানের ঘরে আসে।

স্যার?

বসুন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ও বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে। হামিদুর রহমান নিজের কাজ করে যায়। ও অপমান বোধ করে। হামিদুর রহমান যেন ইচ্ছে করে ওর ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। যেটা প্রতি মুহূর্তে ওকে দংশন করবে। একসময় হামিদুর রহমান মুখ তুলে তাকায়, এই পাণ্ডুলিপিটা সংশোধন না করে ছাপা যাবে না। আপনি এটার ভাষা ঠিক করবেন এবং তথ্যগত দিকটাও দেখবেন। দরকার হলে অংশবিশেষ নিজে লিখে দেবেন।

পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে চমকে ওঠে ও। এটা ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের। যার ধবধবে সাদা চেহারা এবং ঠিকমতো পড়াতে না পারার জন্য ওরা রাঙামুলা ডাকত।

আর শুনুন, এই ফাইলটা—

এটা তো স্যার ইয়াসিনের দায়িত্ব—

জানি। ও ঠিকমতো করতে পারেনি। আপনি দেখে দেবেন।

মজিদ বিমূঢ় হয়ে হামিদুর রহমানের মুখের দিকে তাকায়। লোকটার চোখে সামান্য টেরার ভাব আছে। সেজন্য অনেক কিছু বোঝা যায় না। মুচকি হেসে হামিদুর রহমান বলে, সবাই সব কাজ করতে পারে না।

মজিদের হঠাৎ করে মনে হয়, ইয়াসিনের জন্য প্রশ্রয় আছে হামিদুর রহমানের অথচ ফাঁকিবাজি এবং আড্ডা দেওয়া ছাড়া খুব কম কাজই করে ইয়াসিন। ওর একটাই গুণ যে, যখন-তখন সময়-অসময়ে হামিদুর রহমানকে জি হুজুর করতে পারে। অনায়াসে হামিদুর রহমানের পায়ের তালু জিভ দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে পারে। এসব ইয়াসিনের কোনো কিছু বাধে না। টিকে থাকাটাই ওর কাছে প্রধান কথা। সেটা যেভাবেই হোক না কেন ওর আপত্তি নেই। এই তিলোত্তমা নগরীতে কালকেতু হামিদুর রহমানদের মতো মানুষ গড়ছে, তাদের লালন-পালন করছে। এরা নিজেরা যেমন-তেমন মানুষই পছন্দ করে। একজন সত্যিকার খাঁটি মানুষ এদের দুচোখের বিষ। দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল মজিদের, কিন্তু ওর দুঃখ হয় না। ও নিঃশব্দে নথি হাতে বেরুতে যাবে তখুনি হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকে জনৈক যুবক। ওকে দেখে আঁতকে ওঠে হামিদুর রহমান। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়। অস্ফুট আর্তনাদ করে, শমসের তুমি? ওর হাতে রিভলবার। ও দুপা এগিয়ে এসে বলে, একটুও নড়াচড়া করবেন না। নড়াচড়া করবেন কি গুলি করে দেব। এই কাগজটায় আপনাকে সই করতে হবে।

ও একটা স্ট্যাম্প টেবিলের ওপর রাখে। হামিদুর রহমান চেয়ারের সঙ্গে সিঁটিয়ে আছে। যুবকটি মজিদকে লক্ষই করে না। হামিদুর রহমানের ওপর বলপ্রয়োগ করে। ওর ডান হাতে রিভলবার, বাম হাত দিয়ে হামিদুর রহমানের কাঁধ থামচে ধরে আছে।

সই করুন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হামিদুর রহমানের হাত কাঁপে থরথর করে, মুখে কিছু বলে না। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের মাথার আলো ঝলসে যায়। ও হাতলবিহীন চেয়ারটা উঠিয়ে দড়াম করে মারে যুবকের পিঠে। ও মেঝেতে পড়ে যায়। মজিদের চিৎকারে আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে জাপটে ধরে যুবকটিকে। তখন সক্রিয় হয় হামিদুর রহমান। পরবর্তী ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। পুলিশ এসে নিয়ে যায় শমসেরকে।

সবাই যখন হামিদুর রহমানের ঘরে ভিড় করে মজিদ তখন পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে।

কী ব্যাপার স্যার?

পারিবারিক সমস্যা।

আপনি চেনেন ছেলেটিকে?

হ্যাঁ, আমার আত্মীয়ের ছেলে। পাগলাটে। বাড়ি নিয়ে ওর বাবার সঙ্গে আমার একটি গণ্ডগোল আছে। সেটা ও জোর করে লিখিয়ে নিতে চাইছিল।

যাক, খুব বাঁচা বেঁচে গেলেন। গুলিটুলি করে দিলে তো হয়েই গিয়েছিল।

হামিদুর রহমান সাহস ফিরে পায়। অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, তা করতে পারত না। অত সাহস নেই। মজিদ পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শোনে, কে যেন বলছে, ভাগ্যিস মজিদ সাহেব ছিল।

হামিদুর রহমানের কণ্ঠ জোরাল এবং চড়া, আমিই ঐ ছেলেকে ঠিক করে ফেলতে পারতাম। হাফপ্যান্ট পরা বয়স থেকে ওকে আমি চিনি।

মজিদের হাসি পায়। ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া হামিদুর রহমানের চেহারা ভেসে ওঠে। ওর মনে হয় এর ভেতর গভীর কোনো রহস্য আছে। হামিদুর রহমান যত সহজে ব্যাপারটি বলল তা অত সহজ হলে মুখচোখের চেহারা অমন বদলে যাবে কেন? কেন শমসেরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর মতো হয়ে যায় দৃষ্টি?

মজিদ এসে আবার প্রুফ দেখায় মগ্ন হয়। কিন্তু মাথা থেকে চিন্তা তাড়াতে পারে না। যুবকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল ও সুস্থ নয়। ও বোধ হয় নেশাগ্রস্ত ছিল। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল, আপনার অফিসের চারদিকে বিস্ফোরক রাখা আছে। চেঁচালে বিস্ফোরণ ঘটবে। কৈ কিছুই তো হয়নি, তা হলে মিথ্যা বলেছে। ধরা পড়ার পর ওকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। চোখ লাল, অস্বাভাবিক দৃষ্টি। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় মজিদ। ঠিক মতো প্রুফ দেখতে পারে না।

ইয়াসিন এসে ঢোকে, খুব একটা নাটক করলেন আপনারা। ওর পেছনে আরো অনেকে এসেছে। অর্থাৎ হামিদুর রহমানের ঘর থেকে জটলা শেষ করে ওরা এখানে এসে ঢুকেছে।

আপনার সাহস তো কম নয় মজিদ সাহেব? ছেলেটি যদি আপনাকে গুলি করে দিত?

মজিদ কিছু বলার আগেই পাশ থেকে আর একজন বলে, তখন কি আর অত কিছু ভাবার সময় ছিল? বেশি কিছু ভাবলে সাহস কোথায় উবে যায়। চা খাওয়ান মজিদ ভাই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মজিদ ভাইয়ের প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা ঘটনা ঘটে। আমার মনে হয় কি জানেন, হামিদুর রহমানের মেয়ের সঙ্গে ঐ ছেলের প্রেম ছিল।

হতে পারে। যে গল্পটি বলল সেটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।

বস যত সাহসের কথাই বলুক না কেন, মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল ভীষণ ভয় পেয়েছে।

কথায় বলে না, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে? এনারও হয়েছে তাই। মজিদ সাহেব শুইয়ে দিয়েছেন, উনি এসে লাথি মারলেন।

মজিদ অবাক হয়ে ইয়াসিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই লোকটি এখন কেমন অবলীলায় এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা বলছে। হামিদুর রহমানকে উদ্ধার করতে একটুও বাধছে না। আবার সামনে গেলে তেল দিতে দিতে মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে। পিয়ন চা দিয়ে যায়। সবাই চা খায় এবং কথার তুবড়ি ছোটায়। ওদের কথা শুনতে শুনতে মজিদ ক্লান্তি বোধ কলে। এমন অবসন্ন আর কখনো যায়নি।

আমরা সবাই এতকথা বললাম আপনি কিছু বললেন না তো মজিদ সাহেব?

কয়েক জোড়া চোখ একসঙ্গে ওর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে। ও প্রবল অস্বস্তিতে বলে, কী বলব?

এই যে এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন।

কী যে বলেন, এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।

অ্যাকসিডেন্ট হলেও, আপনিই তো ঘটিয়েছেন।

ওনার সঙ্গে অবশ্য বেশি কথা বলা যাবে না। ওনার বিনয়ের তুলনা হয় না।

ঠিক আছে আমরা উঠি। আপনি কাজ করুন।

যেমন দল বেঁধে এসেছিল সবাই, তেমনিভাবে বেরিয়ে যায়। মজিদ চেয়ারে মাথা এলিয়ে দেয়। কপালের দুপাশের শিরা দপ্‌দপ্‌ করে। ওর এখন আর কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না। এই তিলোত্তমা নগর ওর মাথায় ভর করে। নিজেকে ভারমুক্ত করার জন্য খবরের কাগজটা খুলে বসে। বড় বড় হেডিঙে ছাপা হয়েছে, কালকেতুর ভিনদেশে সফরের খবর। ও পৃষ্ঠা উলটে যায়। পত্রিকার কালো অক্ষরগুলো পোকা হয়ে যাচ্ছে। কিলবিলিয়ে উঠে আসছে ওর শরীর বেয়ে। তখন ওর একটি খবরের দৃষ্টি আটকে যায়। নগরের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলেছেন, "এদেশে বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ সমাজের ওপরতলা পাচ্ছে। বৈদেশিক সাহায্য শুধু আমাদের অর্থনীতিকেই বিকৃত করেনি, বরং ব্যবসায়ী, ইন্ডেন্টর, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও রাজনীতিকদের যোগসাজশে জাতীয় রাজনীতিকেও বিকৃত করেছে।"

লেখাটুকু পড়ে ও চেয়ারে আবার মাথা এলিয়ে দেয়। যারা এসবের হোতা তারা ইনটেলিজেন্ট, স্মার্ট, প্রতিভাবান বলে বিবেচিত। তাদের স্মার্টনেসের অন্তরালে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সমাজ। প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার সাহায্য ঋণ হিসেবে আসে। তবুও উন্নয়নের চাইতে দারিদ্র্য বাড়ছে। কারণ,

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অর্থ একশ্রেণীর লোকের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে। যদি দরিদ্র জনগণের মধ্যে শুধুমাত্র সাহায্য হিসেবে অর্থের বিতরণ হয় তবে মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে বছরে প্রায় তিন শ' ডলার। অথচ এই দেশে গড়পড়তা মাথাপিছু আয় এক শ' ষাট ডলারের মতো। এটা আমাদের দেশের মানুষের পুরো বছরের পরিশ্রমের ফল, এর সঙ্গে রয়েছে ঋণ, অনুদান সাহায্য ইত্যাদির যোগফল। এই ফাঁকের অন্তরালে কাজ করে অবৈধ মুদ্রা পাচার, খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য সামগ্রীর আমদানিকারক ও রফতানিকারক, শিপার্স, পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী শোষণ, প্রতারণা।

মজিদ চোখ বুজলে এইসব চিত্র স্পষ্ট দেখতে পায়। তখন ওর খুব খারাপ লাগে। বেশি খারাপ লাগলে ওর চোখ লাল হয়ে যায়। ওর লাল চোখ দেখলে মন্টি খুব ভয় পায়। কেঁদে ফেলে। অথচ ও তো জানে অর্থনৈতিক এতকিছুর একটাই লক্ষ্য, তা হলো দারিদ্র্য দূর করা। কিন্তু তার বদলে সমাজে বৈষম্যের পাহাড় ক্রমাগত বাড়ছে। একদল তলিয়ে যাচ্ছে পঙ্কে, অন্যদল সাঁতার কাটছে রঙিন পানিতে, ভাবছে এই স্বর্গ দেশ নয়, অন্য কোনো জায়গা। দেশ কি ওরা তা চেনে না। দেনার প্রয়োজনও নেই। বোঝে কেবল নিজেরটুকু এবং গোটা কয়েক মানুষের স্বার্থ। অথচ এ কয়জন মানুষের হাতেই ক্ষমতা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের কিছু কথা ওর ডায়েরিতে টুকে রাখে, "আমরা যদি বুঝে থাকি যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ, তবে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে।" কোটেশনের পাশে ও নিজের বক্তব্য লেখে এই বলে যে, করবে কে? কে আছে? যিনি এইসব কথা বলছেন তার সততা কতটুকু? তিনি কি আন্তরিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করেন? করলে নগরজুড়ে এই অচলাবস্থা কেন? সবাই যদি কাগুজে বাঘ হয় তা হলে বাঘ খুঁজতে যে নগর উজাড় হয়ে যাবে?

এইসব ভাবনার পর মজিদ নিজের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করে। সকালের ঘটনার পর যে অবসন্নতা ওকে পেয়ে বসেছিল এখন সেটা নেই। ও নিজেকে অতিক্রম করতে পেরেছে। একটু পর ও খেয়াল করে যে অফিস ছুটি হয়ে গেছে, চারদিক ফাঁকা, পিয়নটিও নেই। দারোয়ান চাবি হাতে ঘোরাঘুরি করছে। মনে পড়ে রঞ্জনা ওকে আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিল। গত রাত থেকে মন্টির জ্বর। ও বাড়ির কথা একদম ভুলে গেছে। তড়িঘড়ি বের হওয়া উচিত। অথচ ওর একদম উঠতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে হয় চেয়ারের সঙ্গে মিশে যেতে, আর কোনোদিন যেন উঠতে না পারে। তিনটে বেজে গেছে, পেটে প্রচণ্ড খিদে। বারবার থুতু এসে মুখ ভরে যায়। মনে হয় রঞ্জনা ঠিকই বলে। আসলে ওর অনেক বয়স, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। যে যৌবন নিয়ে ও শমসেরের গায়ে চেয়ার ছুড়ে মারে, সে যৌবন মিথ্যে। আসলে ও অথর্ব ও অক্ষম। এই ক্ষণিকের জ্বলে ওঠার মধ্য দিয়ে কি স্থায়ী অর্জন সম্ভব? না, কিছুতেই না। ও ধীরেসুস্থে অফিস থেকে বের হয়। পথে

https://boierhut.com/fb

একটা ফার্মেসিতে ঢুকে মন্টির জন্য ক্রিস্টাফেন ডি সিরাপ কেনে। অন্তত এটুকু দিয়ে রঞ্জনাকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে। ঘরে ফিরে আবার বুড়ো হয়ে যেতে ওর ভালো লাগবে না।

বিকেলে ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মজিদ। বেশিরভাগ সময়ই ও দিনে ঘুমোয় না। আজ দুচোখ জুড়ে ঘুম এসে গেল। একটানা ঘণ্টা দু-তিন ঘুমিয়ে যখন উঠল তখন সন্ধ্যা। রঞ্জনা মন্টিকে নিয়ে ব্যস্ত, জ্বর বেড়েছে। রঞ্জনা ওর সঙ্গে কথা বলছে না। আজ ও অস্বাভাবিক শান্ত। বসে থেকে মেয়ের মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে।

ওষুধটা খাইয়েছ?

না।

কেন?

জবাব নেই। ও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে। মজিদ চুপসে যায় যে রঞ্জনা আজ মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। মাঝে মাঝে ও এমন করে, পলিসি বদল আর কী? সাত ডাকেও একটি কথা বলবে না। মজিদ উঠে পানি গরম করে শিশির পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে ওষুধ বানায়। মেয়েকে এক চামচ খাইয়ে দেয়।

এতক্ষণে ওর মাথা হালকা লাগছে। দিনের ঘটনা ওকে তেমন তাড়িত করে না। মানুষের অকৃতজ্ঞতার জন্য ও তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। ধরে নেয় বিনিময় মূল্য প্রত্যাশা না করলেই সবচেয়ে শান্তিতে থাকা যায়। ওর ঘড়িটা চুরি যাবার পর বাড়িতে এখন ঘড়ি নেই। কটা বাজে ও বুঝতে পারে না। ও বেশ ভালো মুডে রঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করে, রঞ্জনা বেড়াতে যাবে?

রঞ্জনা চোখ গরম করে, মনে সুখ থাকলে তো বেড়াতেই যাবে। মেয়েটার জ্বর, এর জন্য কোনো চিন্তা তো নেই?

রঞ্জনার ব্যঙ্গ আর ওকে দমাতে পারে না। মন খারাপও করে না। ঘুম ওর মধ্যে ওষুধের কাজ করেছে। ও দেখতে পায় ওষুধ দেওয়ার পর মন্টি ঘুমিয়ে গেছে। জ্বরও নিরানব্বইতে নেমে এসেছে। ও নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ে। একটা রিকশা নিয়ে রঞ্জনার ভাইয়ের বাসায় আসে। এ বাসার সঙ্গে রঞ্জনার সম্পর্ক খুব খারাপ। ও নিজে মাঝেমধ্যে আসে, লৌকিকতা বজায় রাখে। আজ বাড়ি খালি, রঞ্জনার ভাই করিম একা। সামনের ঘরে বসে কাগজ পড়ছে।

কেমন আছেন ভাইজান?

আমাদের খবর ভালো না। বস।

মজিদ বেতের চেয়ারে বসে। বিয়ের পর থেকে এই চেয়ারগুলো ও দেখে আসছে, কোনো রদবদলই নেই। নীল রং উঠে খাবড়া হয়ে আছে। গদির কাপড়গুলো বিবর্ণ। করিমের মাথায় বিশাল টাক, চকচক করে। কাগজটা ভাঁজ করে সামনের টেবিলে রাখে, ভুরু কুঁচকে আছে। হাঁটু চুলকিয়ে

https://boierhut.com/fb

একটা মশা মারে। চেহারায় একই সঙ্গে ক্লান্তি এবং বিরক্তির ছাপ। মজিদ উসখুস করে জিজ্ঞেস করে, ভাবী কোথায়? ছোটন খোকনদের দেখছি না।

তোমার ভাবীর বাবার বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ও ছোটন খোকনদের নিয়ে মানিকগঞ্জ গেছে। আমিও গিয়েছিলাম। একদিনের বেশি থাকতে পারিনি।

কী হয়েছে? মজিদ উদ্বেগ প্রকাশ করে। করিম রাশভারী লোক।

যতটুকু তার ওজন, তার চেয়ে বেশি পোজপাজ করে। মজিদ বিরক্ত করে। মজিদ বিরক্ত হয়। কোনো খারাপ খবর নেই তো?

হ্যাঁ আছে। করিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তোমার ভাবীর তিন ভাই বাসে আমার বাসায় আসছিল। পথে বাসটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে তিনজনই মারা যায়। একেবারে স্পট ডেড।

ওহ্!

মজিদ অস্ফুট আর্তনাদ করে। ওর মনে হয় এভাবেই ওর দিনগুলো স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়। এখানে না এলে হয়তো এই দুঃখজনক খবর ওর শুনতে হতো না। বেশ বেড়ানোর মন নিয়ে বেরিয়েছিল, এখন সবটাই মাটি। খারাপ লাগতে শুরু করলে ওর মাথা আবার কেমন করে। করিম চিৎকার করে কাজের ছেলেটাকে ডাকে। ও এলে বলে, মন্টু কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আর সরষের তেল দিয়ে আমাদের মুড়ি মাখিয়ে দে। কড়া করে চা বানাবি। বুঝলে মজিদ? সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। ভাবা যায় না। সহ্য করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। ওহ্ কী যে কষ্ট পেয়েছি।

মজিদের গলা শুকিয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, হবেই। অতবড় দুর্ঘটনা সহ্য করা কি সহজ! সেই যে আমি একবার সোহাগপুর যাওয়ার পথে—

করিম ওকে থামিয়ে দেয়। বলে, তোমার তো এমন অভ্যেস ছিল না মজিদ যে, অন্যের দুঃখের কথা শুনলে নিজেরটাও বলতে শুরু কর?

মজিদ লজ্জা পেয়ে চুপ করে যায়। ছিঃ ছিঃ এটা করা উচিত হয়নি। কিন্তু সব মানুষই তো অন্যের দুঃখের সান্ত্বনা দিতে এমন করেই কথা বলে। কই তাদেরকে তো কেউ এমন করে থামিয়ে দেয় না। ওকে কেন দেয়? মজিদ বিব্রত হয়ে বসে থাকে। করিম একবারও রঞ্জনার কথা জিজ্ঞেস করে না। ও নিজেও কী বলবে বুঝতে পারে না। কী বললে কথাগুলো মানুষের মতো মনে হয়? কী বিচিত্র এই সম্পর্কের টানাপোড়েন!

তোমার ঘড়িটা দেখছি না? নষ্ট হয়েছে নাকি? আমার সাধ্য অনুযায়ী সবচেয়ে দামি ঘড়িই তো কিনেছিলাম।

কদিন আগে চুরি হয়ে গেছে।

কীভাবে? তোমরা এত কেয়ারলেস থাক না? করিম রেগে যায়। তার রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বোনের বিয়ের সময় প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে ঘড়িটা কিনেছিল। মজিদ চুপ করেই থাকে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করিম গলা চড়িয়ে বলে, রঞ্জনা কী করে? ওটা একটা অপদার্থ।

ওর কোনো দোষ নেই। দোষ আমার।

তুমি ওকে মাথায় উঠিয়েছ। তোমার ভাবী ওকে টাইট করে রেখেছিল।

এ জন্যই রঞ্জনা অমন হয়েছে। ভাইয়ের সংসারে না থাকতে হলে ও হয়তো স্বাভাবিক মেয়ে হত।

কী বললে? রঞ্জনা স্বাভাবিক নয়?

না। আপনারা ওকে পাগল বানিয়েছেন।

তুমি এত বড় কথা বললে?

আমি দুঃখিত যে কথাগুলো আপনাকে বলতে হলো। আপনাদের দীর্ঘদিন মানসিক পীড়নে ও অপ্রকৃতিস্থ। এ দায়ভার এখন আমাকে বহন করতে হচ্ছে। তোমার কি মনে হয় তুমি ভুল করেছ?

সে বিচার আমি করি না। তবে আমি মেনে নিয়েছি।

করিম একদৃষ্টে মজিদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পুরু লেন্সের চশমায় তাকে বেশ বয়স্ক মনে হচ্ছে। কিছু কি অনুতপ্ত হয়েছে সে? মজিদ বুঝতে পারে না। তবে তার গলায় এখন আর সেই ঝাঁজ নেই। দৃষ্টির তীব্রতাও নমনীয় হয়ে এসেছে। করিম অন্তর্গত ভাবনায় তাড়িত হচ্ছে। মজিদ ভাবে এটুকু তার লাভ যে, বিয়ের এত বছর পরে হলেও ও করিমকে নিজের মুখোমুখি করাতে পেরেছে। এতে রঞ্জনার কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না ঠিক, কিন্তু একজন মানুষ যদি তার ভুল বুঝতে পারে, তবে সেটা মজিদের লাভ।

মন্টু চা-মুড়ি নিয়ে আসে। মজিদ বাটি টেনে নিয়ে খেতে শুরু করে। করিম চুপচাপ বসে থাকে। মজিদ বুঝতে পারে যে তাকে খেতে বলার অনুরোধ করা বোকামি। এখন কোনোকিছু তার গলা দিয়ে নামবে না। ওর মনে হয় না, শুধু হেরে যাওয়া নয়। আজ এই একটি জায়গায় ওর জিত হয়েছে। ও আজ বিজয়ী।

মনের আনন্দে চা-মুড়ি খেয়ে ও উঠে পড়ে। রাস্তায় বেরিয়ে শিস বাজায়। একজন মানুষের ম্লান মুখ ওকে এভাবে আনন্দ দেবে ও কি তা কোনোদিন ভেবেছিল?

ঘরে ফিরে রঞ্জনাকে দুর্ঘটনার কথা বলতেই ও উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে। ওর দৃষ্টিতে, চেহারায় এমন উজ্জ্বল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মজিদ কোনোদিনই দেখেনি। এ যেন শত্রুর ওপর বিজয়ের উল্লাস। ভাই ভাবীর প্রতি রঞ্জনার ঘৃণা যে কত গভীর আজই তার একটা পরিমাপ করতে পারে মজিদ। ও মনে মনে আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে, এর ফলে রঞ্জনা হয়তো কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে। খুশিতে রঞ্জনা ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, উহ্ এতদিনে একটা শান্তি পেলাম। আমার ওপর যে অত্যাচার করেছে আল্লাহ্ তার শোধ নিয়েছে। আমি মুখ বুজে সয়েছি আর রাতে আল্লাহকে ডেকেছি। কত রাত যে চোখের পানিতে বালিশ ভিজে গেছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মজিদ এই নতুন রঞ্জনাকে দুচোখ ভরে দেখে। ওর উল্লাসে একাত্ম হতে না পারলেও বাধা দেয় না। করিমের সঙ্গে কী কথা হয়েছে সে কথা আর রঞ্জনাকে বলা হয় না। এটুকু ওর নিজের জন্য থাক। এক বিছানায় দুজনে দুধরনের আনন্দ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে যায়। ভোররাতে ঘুম ভাঙে মজিদের। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে বৈঠকখানায়। দরজা খুলে দেয়। বাইরে অন্ধকার। দুদিন ধরে রাস্তার বাতিগুলো নষ্ট। ভাঙাচোরা রাস্তায় হাঁটতে কখনো পা মচকে যায়। তবু উপায় নেই। এসবের মধ্যেই তো দিনযাপন। এই তিলোত্তমা নগরের খানাখন্দগুলো চোখে পড়ে না কালকেতুর। এটুকু ভাবতেই মজিদের আনন্দ উবে যায়। কিসে তিলোত্তমা এই নগরী? সমস্যায় নয় কি? কোনটা থেকে শুরু করবে? পানি সমস্যা, রাস্তাঘাটে আবর্জনার স্তূপ, যানবাহনের সমস্যা, স্কুলে ভর্তি সমস্যা, দফায় দফায় বাজার চড়ে যাওয়া, টেলিফোন না করলেও হাজার টাকার বিল আসা, ঘুষ দিয়েও কোনো কাজ করতে না পারা, পত্রিকা খুললে প্রতিদিন হত্যা-ধর্ষণের খবর পাঠ করা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সুযোগ-সুবিধা না পেয়েও ট্যাক্স পরিশোধ করা? কত ভাবা যায়, কত? নাগরিক হিসেবে মাসের বিশ দিন শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত থাকতে হয় ওকে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা এই নগরে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সঙ্গতি রেখে জীবনযাপন করা যায় না। মজিদ উঠে ঘরের বাতি জ্বালে এবং ডায়েরিটা বের করে লেখে : এতকিছুর পরও আমি সবচেয়ে ভালোবাসি হাজার মানুষের মুখ দেখতে এবং সবচেয়ে বিব্রত হই নেংটিপরা মানুষ দেখে।

ডায়েরি কোলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে ও। এই নগরে চারদিকে আর্তচিৎকার, যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বৃদ্ধি রোধ করো। এই ভয়াবহ সমস্যা নাকি অদূর ভবিষ্যতে এই নগরকে গ্রাস করবে। মজিদের মনে হয় বাজারে, লঞ্চঘাটে কিংবা জনসভায় লাখ লাখ মানুষ দেখতে ওর ভালো লাগে। ও এই চিৎকার শুনতে চায় না।

বাতি বন্ধ করে ও আবার বিছানায় আসে। তখন আঁধার কাটতে শুরু করেছে। ও কি এখন এই মুহূর্তে আর একটি সন্তান উৎপাদন করবে? যে ঐ লক্ষ মানুষের একজন হবে? যে এই নগরের মাথা হবে? যাকে নিয়ে আর্তচিৎকার উঠবে কালকেতুর কণ্ঠে? মশারির ভেতর ঢুকতেই রঞ্জনা খন্ খনে গলায় বলে, কী ব্যাপার কোথায় গিয়েছিলে?

বৈঠকখানায়।

কী করছিলে?

এমনি এসেছিলাম।

ডায়েরি লেখনি?

হ্যাঁ লিখেছি।

যত্তসব ভূতে পাওয়া নেশা।

রঞ্জনা!

https://boierhut.com/fb

মজিদ রঞ্জনার গায়ে হাত রাখে।

কিছু বলবে?

মজিদ ওকে কাছ টানে। রঞ্জনা দ্রুত হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, শরীর খারাপ ঝামেলা করো না।

ঠিক আছে, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও। আহ্, কি যে আদিখ্যেতা। রঞ্জনার খনখনে কণ্ঠ মজিদকে প্রবলভাবে আহত করে। ও হাত সরিয়ে নিতে নিতে ভাবে, আজ রাত কালকেতুর। কালকেতুর জয় হোক।

ওর দুচোখ জ্বলে ওঠে। রঞ্জনাকে কিছু বলতে পারে না। বুকের কোথায় যেন রঞ্জনার প্রতি ভালোবাসা ওকে পীড়িত করে। ও বালিশে মুখ গোঁজে। বালিশের ওয়াড়ে রঞ্জনা সুতো ফুলপাতা এঁকে রেখেছে। তার ওপর মুখ রাখলে মজিদের গায়ে আঁকাবাঁকা রেখা চিত্রিত হয়।

৯

ঘরের মেঝেতে হাজারখানেক শাড়ি ছড়িয়ে গুম হয়ে বসে থাকে ফুল্লরা। কোনটা পরবে ঠিক করতে পারে না। আজ ওকে এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় বক্তৃতা করতে হবে। ভিনদেশ থেকে লোকজন আসবে। এসব ব্যাপারে ও কিছু জানে না। বক্তৃতা লিখে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট লোকজন। ও শুধু পড়ে যাবে। এসব ওর ভালো লাগে। বক্তৃতা নিয়ে ওকে ঘামাতে হয় না। ওকে ভাবতে হয় পোশাক, মেকআপ, চুলের স্টাইল নিয়ে। এসবের ওপর ওর ব্যক্তিত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। আর নিজেকে আকর্ষণীয় করে সাজাতে না পারলে নারীজন্মই ব্যর্থ মনে হয়। রূপের যেটুকু ঘাটতি আছে সেটুকু তো এসব দিয়েই পূরণ হয়। ফুল্লরার মতে জীবনটা তো চটক দিয়েই চলা। চটকেই চোখ ঝলসায়, মন ভরে।

অনেকক্ষণ ধরে শাড়ি বাছাই করার পর ঠিক করে আজ ও নিজেকে সাদা দিয়ে সাজাবে। সঙ্গে থাকবে মুক্তোর গয়না। সাদা কখনো কখনো ওর ভীষণ প্রিয় রং হয়। ব্যাধ জীবনে যখন পুকুরঘাটে হাঁড়িপাতিল মাজতে বসত তখন মাথার ওপর একটা সাদা ফুলগাছ ছিল। ভারি মিষ্টি গন্ধ ছিল। ফুল পড়ে বিছিয়ে থাকত পুকুরঘাটে। ও প্রায়ই ফুল কুড়োতে বসত। কিছুতেই পা দিয়ে মাড়াতে পারত না। সেই ফুলগুলো এখন এই মুক্তোর মালার মতো ঝকঝক করে ওঠে ওর চোখের সামনে। ভোলার হাজার চেষ্টা করলেও ভোলা কি যায় সেসব দিন। এখন ফুল্লরার কত শাড়ি! তখন খুঁয়া পাতায় শাড়ির জন্য শখ করেও আদায় করা যেত না। কালকেতু এসব কেনার পক্ষে ছিল না। একদম কাঠখোট্টা শক্ত স্বভাবের লোক ছিল। এখন কালকেতুর পোশাক-আশাকের দিকে নজর

https://boierhut.com/fb

হয়েছে। দামি দামি সুন্দর পোশাক পরে। ভিনদেশ থেকে ধুয়ে আসে সেসব পোশাক। এখন তো ওরা মর্ত্যের স্বর্গে বাস করে। জীবনেই ওদের চাওয়া-পাওয়া মিটে গেছে।

ওরা আর ভিন্ন জীবন চায় না। কালকেতু স্পষ্ট গম্ভীর গলায় বলে, ভাগ্যবান মানুষের এক জীবনেই সব পাওয়া হয়। ওদের জন্য স্বর্গ-মর্ত্য নেই। এইসব মানুষকে কেউ ধর্মের আফিম খাওয়াতে পারে না, এইসব মানুষের জন্য কোনো কার্ল মার্ক্সের দর্শন দরকার হয় না। এরা নিজেদের চমৎকারভাবে ম্যানেজ করতে পারে।

ফুল্লরা সাদা ঝলমলে শাড়িটা পছন্দ করে বাকিগুলো বেশ যত্নসহকারে ভাঁজ করতে থাকে। এসব করার জন্য পাঁচজন মহিলা আছে তবু এই মুহূর্তে ও এটা করছে। কারণ ওর ভালো লাগছে, কারণ ব্যাধ জীবনের স্মৃতি ওকে নস্টালজিক করছে। নেংটি পরা কালকেতুকে দেখে এক ভিনদেশবাসী বিদ্রূপ করেছিল। সে কথা কালকেতু ভুলতে পারে না। বারবারই সে গল্প ফুল্লরার কাছে করে। মধ্যরাতে রতিক্রিয়ার পর কালকেতুর গমগমে কণ্ঠে এই গল্প ও অনেকবার শুনেছে। দুজনে তখন নগ্ন, দুজনের চামড়া ঘামে ভেজা এবং অনুভূতিতে মাদকতা। এই সময় কালকেতুর কেন সে গল্পটি মনে পড়ে ফুল্লরা তা বুঝতে পারে না। এখন এই অগণিত শাড়ির রাজ্যে কালকেতু তার গল্প নিয়ে এসে দাঁড়ায় : জানো, দূর দেশে যাব বলে ঠিক করলেও আমার আর ভবানির দূর দেশে যাওয়া হয় না। সফরখানে এসে বিচিত্র লোকজনের সঙ্গে মিশে এবং পণ্যসামগ্রী বিক্রি হয়ে যাওয়াতে আর নগরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা সাতদিন সফরখানা কারিয়ে দেই। এটা বাণিজ্যে যাবার আস্তানা। এখান থেকে বণিকরা ডিঙি ভাসায় দূরদেশে। কত দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসে, দূরদূরান্তে লোকজন যায়। আমি ভ্রমণ ভালোবাসি। দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটতে আমার ক্লান্তি নেই। পথের কষ্ট কষ্ট মনে হয় না। আমার বিবেচনায় দেশ দেখাটা জরুরি। যেভাবে হোক এই জরুরি কাজটি সম্পন্ন করা চাই। তুমি তো জানো আমি কোনোদিন ডিঙি চড়ে কোথাও যাইনি। যাবার ইচ্ছে থাকলেও সাহসে কুলোয়নি।

দীর্ঘপথ হেঁটে আমরা সফরখানে আসি। পথে দুই জায়গায় থেমে আমরা চিঁড়ে-গুড় খাই। ভবানি চাঙাড়িগুলো একসঙ্গে দড়িতে বেঁধে পিঠের ওপর ঝুলিয়েছে। আমি নিয়েছি হরিণের চামড়া, পাখির পালকের রঙিন পাখা আর এক পুঁটলি শুকনা মাংস। সফরখানের কিছু লোকের কাছে এই মাংসের ভীষণ কদর। আমরা দুজনে কথা বলতে বলতে পথ হাঁটি। ভবানি আমাকে সমীহ করে, সেজন্য ওর মুখে কথা কম থাকে। ভবানি জানে আমি কথার তুবড়ি ছোটাতে ভালোবাসি। কত বিচিত্র চিন্তা, বিচিত্র তথ্য, বিচিত্র স্বপ্ন, বিচিত্র নেশা আমার মাথার মধ্যে ঘোরে। জানো ফুল্লরা, ভবানি আমাকে বলে, কালকেতু তুমি আমার অপরিচিত। শুয়োর কেনার পর থেকে তুমি একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছ। অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছ। এই পরিবর্তন ভালো কি মন্দ আমি তা বুঝি না। আমি শুধু শঙ্কিত হই, নিজের ভেতর কুঁকড়ে থাকি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভবানির কথা শুনে আমি হো হো করে হাসি। বুঝতে পারি ও আমাকে ঠিকই বুঝতে পেরেছে। শুয়োর কেনার পর থেকে আমি আমার চারপাশের সবকিছু অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছি। আমার ভেতরে গর্জন, প্রবল গর্জন, দুকূল ভেঙে ফেলতে চাই।

যাক যা বলছিলাম, এবারে সফরখানে আসা আমার সার্থক হয়েছে। জমজমাট পরিবেশ। লোকজনে ভরে আছে ময়দান। পণ্যের বিকিকিনি চলছে। পণ্য ডিঙিতে উঠে চলে যাচ্ছে। আমার সবকিছু মোটা দামে বিকিয়েছে। ভবানিও চাঙাড়ি বিক্রি করে আশাতীত দাম পায়। আরো দূরে গেলে হয়তো এত দাম আমরা পেতাম না। আসা-যাওয়ার পথে পড়ে এই স্থান। প্রতিবারই দেখেছি ম্লান, জনশূন্য। গুটিকয়েক লোক ইতস্তত গাছতলায় রাত্রিযাপন করে। ওরা এখানকার স্থানীয়। এবার আমার এত ভালো লাগে যে ফিরতে মন চায় না। দুজনে মিলে গাছতলায় কাটাই, সামান্য আহার করি, সারাদিন ঘোরাফেরা করি। এর-ওর সঙ্গে আড্ডা দেই। পাশা খেলি।

একদিন ভিনদেশি এক বণিকের সঙ্গে আমার হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। বণিক বলে, শুনেছি বড়ই দরিদ্র গ্রাম তোমাদের? ফসল বুঝি তেমন ফলে না?

আমি বলি, অনেক ফলে। তবে ভূমির চাইতে লোক বেশি তো এইজন্য টানাটানি হয়।

লোকটি বলে, ঠিকমতো খেতে পাও তো?

আমি রেগে বলি, পাই বৈকি। নইলে শ্বাস ফেলছি কেমন করে?

তা ঠিক, তা ঠিক।

বণিক দ্রুত মেনে নেয়। কারণ তখন আমার চোখ লাল হতে শুরু করেছে, চোয়াল শক্ত হতে শুরু করেছে। বণিক চুপ থেকে একটু পরে বলে, তোমাদের ভালো কাপড় নেই বুঝি?

কেন থাকবে না? খুঁয়া গাছের পাতার সুতোয় আমরা সুন্দর কাপড় বানাই। ভিনদেশে সে কাপড়ের দারুণ কদর। বণিকেরা জাহাজ থামিয়ে কাপড় কেনে।

বণিক মুচকি হেসে মাথা নাড়ে, তোমাদের অনেক কিছু আছে দেখছি।

আমি তেড়ে উঠি, তুমি হাসছ কেন?

বণিক মুখ ভেঙচায়, কেন, হাসলে কি হয়? নেংটি পর, খেতে পাও না জেনে হাসতেও পারব না?

কী বললে? আমি মারতে উঠি। ভবানি দ্রুত সামনে এসে দাঁড়ায়।

করো কী কালকেতু? এখানে মারামারি সাজে? আমাদের কে আছে যে ঠেকাবে?

ভিনদেশি বণিক হা-হা হসে। বলে, ঠিক বলেছি তোমাদের কে আছে যে ঠেকাবে? এত ছোট যে পিঁপড়ের মতো পায়ে চেপে মারব! বণিকের উদ্ধত কণ্ঠে অহঙ্কার, থুঃ পেটে ভাত নেই, পাছায় কাপড় নেই, তেজ ঠিকই আছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি বণিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটো ঘুষি লাগিয়ে দেই। ভবানি আমাকে জাপটে ধরে। আমি শুধু বলি, আমাকে ছেড়ে দাও ভবানি, আমি ওকে তেজটুকু দেখিয়ে ছাড়ব। ততক্ষণে আশপাশে লোক জমে গেছে। বণিকও আমার দিকে তেড়ে আসতে চাইছিল। অন্যরা ওকে থামিয়ে দেয়, সে জন্য ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়ায়নি।

রাত্রিবেলা আমি আর ভবানি গাছতলায় শুয়ে থাকি। কারো চোখে ঘুম নেই। বণিকের কথাগুলো আমাদের মগজ কাটে। এমন করে কেউ বলতে পারে আমরা ভাবতেই পারি না। গ্রামটি শুধুই দরিদ্র এ খবর ওরা পায়, আর কোনো খবর রাখে না।

ভবানি?

বলো।

আমরা কালই এখান থেকে চলে যাব।

ঠিক আছে। আমি তো যেতেই চাচ্ছি তুমি কেবল ফুর্তি করছ। আমরা গরিব মানুষ। আমাদের কি এতকিছু সাজে?

আমি রেগে যাই। ভবানিকে ধমক দিয়ে বলি, মেলা বক বক করো না। আমরা কী সেটা আমি বুঝব। আমি গরিব থাকতে চাই না। ধন চাই, মান চাই, সব চাই।

ভবানি আস্তে আস্তে বলেছিল, এতকিছু কেমন করে পাবে তা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই না। আমার ভয় করে। তোমার কণ্ঠ শুনলে আমি এক অলৌকিক ধ্বনি শুনতে পাই। সেটা আমার ভালো লাগে না।

আমি ভবানির কাঁধ খামছে ধরে হা-হা হাসি। সে হাসির শব্দে গাছ থেকে ঝটপটিয়ে উড়ে যায় পাখি। ভবানি ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। ওর ভয় আমি উপভোগ করি। এখন এই ভীতু প্রাণীগুলো দিয়েই তো আমি নগর গড়ে তুলেছি।

প্রবল এক হাঁচিতে ফুল্লরার ভাবনার জাল ছিঁড়ে যায়। ও ঘড়ি দেখে। এখনো অনেক সময় আছে। তড়িঘড়ি তৈরি হওয়ার দরকার নেই। এক অলস ভাবনায় ওর বর্তমান সময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ও দেখতে পায় কালকেতুকে। এ কালকেতু অন্য মানুষ। আবারো একটা হাঁচি আসে। কীভাবে ভেতরে ঠাণ্ডা প্রবেশ করল ও বুঝতে পারে না। হাঁচির শব্দে আয়া এক গ্লাস জল ও ট্যালবেট নিয়ে আসে। ফুল্লরা মুহূর্তে তা খেয়ে ফেলে। এ ব্যাপারে কালকেতু ভীষণ নির্মম। ফুল্লরার শরীর খারাপ হোক ও কখনো তা চায় না। কালকেতুর কথা ভাবতেই এক মৃদু ভয়ের ঝাঁকুনি ফুল্লরার শরীরে বয়ে যায়।

ও দেখতে পায় দরিদ্র কালকেতু দারিদ্র্যের অপমানে আরো নৃশংস হয়ে ওঠে। ও ধন চায়। পশু হত্যার বিনিময়ে বিপুল ধন। বনের পশুপাখির মধ্যে হাহাকার ওঠে।

https://boierhut.com/fb

দেখতে দেখতে আষাঢ় মাস এসে যায়। প্রবল বৃষ্টিপাতে শিকার সম্ভব নয়। বেশিরভাগ সময় কালকেতুকে ঘরে থাকতে হয়। চনমনিয়ে রোদ উঠলে কুড়োল দিয়ে কাঠ চেরে। ভিজে কাঠে রাঁধলে সে ভাতে ধোঁয়ার গন্ধ হয়। কালকেতু খেতে পারে না। ও সময়-সুযোগমতো কাঠ চিরে রান্নাঘরের মাচার ওপর মজুদ রাখে। বর্ষায় ফুল্লরার কষ্ট হয় না রাঁধতে। কালকেতু মনের সুখে তালের আঁটির গ্রাসে উদর পূর্তি করে।

একদিন শুয়োর নিয়ে ঘরে ফিরে এসে কালকেতু দেখে ফুল্লরা কাঁদছে। ও অবাক হয়।

কাঁদছ কেন ফুল্লু বউ? বিষ-পিঁপড়ে কামড়িয়েছে?

বিষ-পিঁপড়ের কামড়ে ফুল্লরার শরীর ফুলে যায়। ও সইতে পারে না। কালকেতুর সোহাগে ওর ফোঁসফোঁসান দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

কী হয়েছে বলো না। জলহরির ঘাটে পড়ে গিয়েছ?

ও প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না।

তবে কাঁদছ কেন?

ফুল্লরা কথা বলতে পারে না, ওর বুক ফেটে যায়।

বলো না কী হয়েছে?

আজ তোমার তালের আঁটি হবে কী দিয়ে? খুদকুঁড়ো কিছু নেই!

নেই?

কালকেতুর মুখ কালো হয়ে যায়। ফুল্লরা আবার চোখে আঁচল চাপা দেয়। গত পরশু ছয় ব্যঞ্জন রেঁধে দিয়েছে। আজ একদম শূন্য। কালকেতুর মুখমণ্ডলে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ।

ঘরে মটরকালাই নেই? দুটো রেঁধে দাও।

ও মুখ নিচু করে রাখে। মটরকলাইও শেষ। যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ খায় কালকেতু। না ফুরনো পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

দেখি সইয়ের কাছে পাই কি না।

ফুল্লরা চোখ মুছতে মুছতে উঠোন পেরিয়ে যায়। কালকেতু খুঁটিতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। বৃষ্টির জন্য শিকারে সুবিধে নেই। ঘরে চাল বাড়ন্ত। না, এভাবে চলবে না, চলা উচিত নয়। ওর হৃদয় ফুঁসে ওঠে। ফুল্লরা যদি চাল জোটাতে না পারে তা হলে শুয়োর পুড়িয়ে খাবে, তবু খাওয়া চাই। মেদসর্বস্ব ভারী দেহে শুয়োরগুলো লোভনীয়। কালকেতুর জিহ্বায় পানি আসে। ওর মনে হয় মানবসন্তানের উচিত জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধন করা। নইলে মানবজীবন বৃথা। ফুল্লরা তখন সইয়ের ঘরে বসে অনুনয় করে, দুই সের চাল দিতেই হবে নইলে মিনসে উপোস দেবে। মিনসে উপোস দিলে আমার বুক ফেটে যায়।

সইয়ের চোখেমুখে কৌতুক, ইস্ দরদে বুক উথলে উঠছে দেখছি।

https://boierhut.com/fb

দিবি না সই?

দেব, আগে আমার মাথার উকুন বেছে দে।

ফুল্লরা সইয়ের মাথার উকুন বাছে। বাইরে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ে।

বারবার ওর চোখে পানি আসে। শেষে সই ওর আঁচলে দুই সের চাউল বেঁধে দেয়।

ঠিকমতো ধার শোধ দিস। বুঝিসই তো এক...

ফুল্লরা কথা না শুনে পা বাড়ায়। যে কথাগুলো ও অন্যকে বলে সে কথা আজ ওকে শুনতে হল। তবু ওর বুকে স্বস্তি, মিনসের তালের আঁটির ব্যবস্থা হলো।

আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ও ঘরে ফেরে। কালকেতুকে চাউল দেখায়। তারপর রাঁধতে বসে। কালকেতু রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কাঠ-দা ধার করে। ফুল্লরা হাসতে হাসতে বলে, বর্ষা গেলে আমাকে একটা খুঁয়া পাতার সুতোর শাড়ি কিনে দিও।

কালকেতু উত্তর দেয় না। বরং রেগে যায়, মেয়েমানুষের কেবল বায়না। শখ ছাড়া কিছু নেই। দুমুঠো চাল জোগাড় করে মাথায় উঠে গেছে।

যেন আমি কিছু করি না? কী কথা বলছ না যে? খাটতে খাটতে হাড়মাংস কালি হয় আমার।

কালকেতুর হাতের কাজ দ্রুত হয়। এমন একটি ভাব করে যেন শুনতে পায়নি। মুখে কিছু বলে ফুল্লরাকে চটাতে চায় না। এই ভেবে মনে মনে খুশি হয় যে ও বেশ কিছু গুণ অর্জন করেছে যা দিয়ে ও নিজেকে বদলাতে পারবে। ওর ধারণা মানবসন্তানের উচিত নিজেকে অনবরত পালটে ফেলে সুবিধামতো অবস্থানে চলে যাওয়া।

পেট ভরে ভাত খেয়ে শুতে যাবার আগে ওর মনে হয় ফুল্লরা চণ্ডীর মতো হতে পারে না? চণ্ডীর মতো শক্তিশালী? তা হলে তো ধার শোধের জ্বালা থাকে না। তবে ফুল্লরা বলে, ঋণ থাকলে আমার গলা দিয়ে ভাত নামে না।

কালকেতু হাসে। ফুল্লরাকেও বদলাতে হবে। এত ভালো থাকলে কিছু করা যাবে না। বিছানায় শুয়ে ও ফুল্লরাকে জড়িয়ে ধরে, তোমাকে আমি চণ্ডীর মতো দেখতে চাই ফুল্লু বউ।

মিনসের কথার কী ছিরি? চণ্ডীর সঙ্গে চটকানো!

চটকানো কোথায়? সত্যিকথা যে আমি চাই। আমি কুড়োল দিয়ে বেটির মাথা গুঁড়িয়ে দেব। একদিন ধরে এনে পাখির দাঁড়ে ঝোলাব।

ছিঃ ছিঃ। কী সব উদ্ভট কথা। আমি আর একটি কথা শুনতে চাই না।

ফুল্লরা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

মিনসের মাথা ঠিক নেই। ওর প্রচণ্ড ভয় করে। ভয়ে ও ঠক ঠক করে কাঁপে। রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ওঠে কালকেতু। ও দেখে ওর ধড় এবং মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেছে। বিশালকায় এক চিল এসে ওর মুণ্ডু নিয়ে চলে যাচ্ছে। মাটিতে ওর ধড় লাফায়। ভয়ে ও ফুল্লরাকে জড়িয়ে

https://boierhut.com/fb

ধরে। অন্ধকারে হাতড়িয়ে ফুল্লরা ঘড়া থেকে জল ঢেলে কালকেতুকে দেয়। ও ঢকঢক করে খেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়।

ঘরের পেছনে শুয়োরজোড়া ঘোঁত ঘোঁত করে। এই শব্দ কালকেতুর ভালো লাগে, ওর ভয় কেটে যায়। কখনো ঘুমের মধ্যে বোবা ধরলে কালকেতু চিৎকার করে। এমন ওর প্রায়ই হয়। শুয়োরগুলো বেড়ার পাশ থেকে শব্দ করে ওঠে, তখন ও থমকে যায়। ওর ভয় কাটতে থাকে।

তুমি না কত সাহসের কথা বল তবে এমন ভয় পাও কেন?

ফুল্লরার প্রশ্নে কালকেতু উত্তর দিতে পারে না। একা হলে এবং অন্ধকার হলে ও ভয় পায়। কেন ও তা বুঝতে পারে না। কিছু কিছু জিনিস ওর বুদ্ধির অগম্য থাকে।

ফুল্লরার কাপড় গোছানো শেষ হয়। আয়া এসে খবর দেয় যে, ভাঁড়ু দত্ত এসেছে। ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

ফুল্লরা ভাঁড়ু দত্তকে বসতে বলে প্রসাধনীতে মনোযোগ দেয়। ভাঁড়ু দত্ত একটি নতুন ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছে। নগরে যে একমাত্র কাপড়ের মিলটি হবে তার পঞ্চাশ ভাগ শেয়ার ফুল্লরার। অন্য পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা ভাঁড়ু দত্তই বলছে। ফুল্লরা চোখ বন্ধ করে থাকলেও ক্ষতি নেই। মুখে পাফ বুলোতে গিয়ে ওর হাত থেমে যায়। ভাবে, সবই তো কালকেতুর জন্য হচ্ছে। কালকেতু বড় শক্ত হাতে এদেরকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে। টুঁ শব্দ করার জো নেই। টুঁ শব্দ করবে কী তো আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হবে। মাঝে মাঝে ফুল্লরার নিজের জীবনটা ম্যাজিকের মতো মনে হয়। ছাব্বিশ বছর ধরে কালকেতুর সঙ্গে ঘর করছে, কিন্তু কখনো ঠিকমতো বুঝতে পারল না মানুষটাকে। এখনকার সম্পর্কটা তো একদম গৎবাঁধা, হৃদ্যতা নেই, উষ্ণতা নেই। এমন দিন যায় যখন দুজনের কোনো কথাও হয় না। কথা বলার ইচ্ছাও হয় না। তখন কালকেতু ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকায়। সে দৃষ্টিতে ও অন্য রমনীয় ছায়া দেখে। বুঝতে পারে কালকেতু আজ ওর মধ্যে নেই, এই ঘরেও না। এখন আর ঝগড়াতে রুচি নেই ফুল্লরার। ঐ পর্ব ও অনেক আগে শেষ করে দিয়েছে। এখন ওর খারাপ লাগলে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে কিংবা শাড়ি-গয়না, ব্যবসা, মিটিং ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করে। তাতে দহন কমে। ঘুম হয়। মানুষের সাহচর্য ওকে আনন্দ দেয়। মিটিঙের সময় ঘনিয়ে আসছে। গুরুত্বপূর্ণ সভা। ফুল্লরা তাড়াতাড়ি নিজেকে তৈরি করতে চায়, কিন্তু আবারও কালকেতু এসে সামনে দাঁড়ায়।

আষাঢ় শেষ হয়ে গেলে কালকেতু বনে যায়। আবার প্রবল জিঘাংসায় হত্যা শুরু করে। বনের পশুপাখি কংস নদীর ধারে দেবীকে পুজো দেয়। পুজো দিয়ে ওদের দুঃখের কথা বলে। কালকেতুর হাত থেকে রক্ষা করতে বলে। দেবী ওদের অভয়দান করেন।

পরদিন কালকেতু বনে এলে দেবী মায়া বিস্তার করেন। তিনি কালকেতুর শিকারদৃষ্টি হরণ করে নিলেন। ওর চোখে আর কোনো শিকার পড়ে না।

https://boierhut.com/fb

কালকেতু পাগলের মতো বনে ছুটাছুটি করে। নীলরতন, বাসুকি, তারিণী সবাই হতভম্ব। কী হল? সারাদিন বনে ঘুরে বেড়িয়ে ঘরে ফিরে মেজাজ খারাপ হয় ওর। কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে। ফুল্লরা আর মাংস ফেরি করতে যায় না। দিন দিন ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। লবণিয়া এসে কথা শোনায়, কালকেতু ঘরে আছ?

ও মাথা নিচু করে বসে থাকে। ফুল্লরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। লবণিয়া তারাকান্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে বলে, কালকেতু লবণের দামটা দাও?

কালকেতু ওর হাত জড়িয়ে ধরে, আর দুটো দিন সময় দাও ভাই।

আমার তো অবস্থা বোঝ। সময় দেব কী করে? এমন বাকিতে ব্যবসা করলে ব্যবসা লাটে উঠবে না!

কালকেতুর মুখ কালো হয়ে যায়। ও উত্তর দিতে পারে না। এমন করে ওর অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে ও কি ভাবতে পেরেছিল। তারাকান্ত যেতে যেতে গালাগাল করে, ছোটলোক...। ঋণশোধের মুরোদ নাই তো ঋণ করে খাবার ইচ্ছা কেন? লবণ ছাড়া খেলেই হয়।

তেলি এসে বাড়িতে হৈচৈ করে। মাত্র পাঁচ দিন আগে ফুল্লরা এক শিশি তেল এনেছে। কালকেতু একটু রেগেই বলে, কদিনেই এমন ব্যস্ত হয়ে গেলে?

তেলি তেড়ে ওঠে, আমার বাপের সম্পত্তি নেই যে মানুষকে বিলোব। দাম দেওয়ার মুরোদ নেই তো খাওয়ার শখ কেন? এ জন্য ব্যাধগুলোকে দেখতে পারি না। এগুলোর হাতে অস্ত্র থাকলে হবে কী আসলে ভব্যতা জানে না।

তেলির কথা শুনে কালকেতুর গায়ে আগুন জ্বলে। চিড়বিড়িয়ে ওঠে রক্ত, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। ও দাঁত কিড়মিড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে, সময় এলে দেখে নেবে। যারা ওকে কথা শুনিয়েছে ওদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে ভিটে ছাড়া করবে। বুঝবে কত ধানে কত চাল। ব্যাধ হলে হবে কী, ওদের বোঝা উচিত যে, যার হাতে অস্ত্র সেই প্রভু।

তেলির চলে যাওয়ার দিকে কালকেতু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

রামপ্রসাদ ওর কাছে গোধা চায়। একটা জ্যান্ত গোধা এনে দিলে অনেক কড়ি দেবে। কিন্তু কোথায় পাবে কালকেতু? বনের পশুগুলো কোথায় যে উধাও হল। ওর চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। কাঠ-দা ঘরের চালে গুঁজে রাখে। অপমানজনক পাওনাদারদের গালাগালি। তেল লবণ মসলার ধার দুই কুড়ি ছাড়িয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে দুই আড়ি ধান এনেছিল সেটাও শেষ। কালকেতু দুঃখের অপার সাগরে ভাসে।

ফুল্লরা ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, আমরা কি মরে যাব?

কালকেতু কথা বলে না। ও কিছুটা দিশেহারা, কিছুটা বিভ্রান্ত।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফুল্লরা ফোঁস ফোঁস শুরু করলে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। অসম্ভব বিরক্তি, তিক্ততা ইত্যাদি নিয়ে বনের দিকে হাঁটে। বন থেকে নানা ফল পেড়ে খায়। কংস নদীতে নেমে পিপাসা মেটায়। স্নান করে। ফল খেয়ে পেট ভরে গেলে ওর ঘরের কথা মনে হয়। ফুল্লরা কী খাবে? ফুল্লরা ভাত-কাঁদুনি, ভাত না পেলে ওর ভীষণ কষ্ট হয়। কালকেতুর চোখে জল আসে।

কিছুক্ষণ আগে ও এক মায়া হরিণের পেছনে ছুটেছিল। কিন্তু খানিকটা যেতেই মনে হয় হরিণ নেই, ওটা ছায়া। ওর দেখার ভুল। এত বছরের ব্যাধ জীবনে এমন ভুল কখনো হয়নি। ও আবার শিকারের আশায় বনে ঘুরতে থাকে। তখন দেবী পরিশ্রান্ত কালকেতুর সামনে স্বর্ণ-গোধিকা হয়ে দেখা দেয়। কালকেতু পিছু ধাওয়া করে। মনে মনে ভাবে, এই গোধা রামপ্রসাদকে দিতে পারলে প্রচুর কড়ি পাওয়া যেত। কিন্তু ও এখন সে চিন্তা করতে পারে না। উদরের জ্বালা বড় জ্বালা। কালকেতু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, বনে বনে ঘুরে অনেক কষ্ট সয়েছি, আর নয়। তোকে পুড়িয়ে আজ আস্ত খাব। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই।

কালকেতু তীর ছোড়ে না। বহু কসরত করে জলদড়ি দিয়ে স্বর্ণ-গোধিকা বেঁধে ফেলে। চার-পা বেঁধে বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে ও বাড়ি ফেরে।

ফুল্লরা ঘরে ছিল না। ও গোলাহাটা গেছে ধারের আশায়। কালকেতু গোধিকাকে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফুল্লরাকে খুঁজতে বের হয়। পড়শিকে ফুল্লরার কথা জিজ্ঞেস করলে পড়শি বলে, ফুল্লরাকে গোলহাটের দিকে যেতে দেখেছি। কালকেতু ছোটে সেদিকে। পথে দুজনের দেখা। কালকেতুকে শূন্য হাতে ফিরতে দেখে ফুল্লরার মাথায় বাজ পড়ে। গোলাহাটি গিয়ে দোকানিদের কাছ থেকে ও কিছু আদায় করতে পারেনি। ওর প্রচণ্ড দুঃখ হয়। ভাবে সবই কপালের লিখন। নইলে স্বামী বেঁচে থাকতে আমাকে অন্নের জন্য বিধবার মতো ছুটোছুটি করতে হয়। এত দরিদ্র পতি যে, সম্বল চিন্তায় নিজেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। যে ঘরে অন্নবস্ত্র নেই তেমন ঘরে বিয়ে দিল বাবা আমার। আর তো জ্বালা সয় না। কালকেতু ওর পথ আগলে দাঁড়ায়, ফুল্লু বউ?

শূন্য হাতে ফিরলে?

ফুল্লরা কেঁদে ফেলে। কালকেতু মরমে মরে যায়। বলে, তুমি ঘরে যাও। আমি রামপ্রসাদের ওখান থেকে আসি।

এদিকে সোনারঙের মোহিনী-রূপিণী দেবী পাটের দড়ি ছিন্ন করে ষোড়শী রমণীর রূপ ধারণ করেন। উজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ঘর আলো করে বসে থাকেন। ফুল্লরা ঘরে ফিরে তাকে দেখে তো মূর্ছা যাবার উপক্রম।

তুমি কে? কার ঘরের বউ? সত্যি কথা বলো কোথা থেকে এসেছ?

https://boierhut.com/fb

ফুল্লরার সঙ্গে তামাশা করার ইচ্ছে হয় দেবীর। বলে, ইলাবৃত দেশের মেয়ে আমি, জাতিতে ব্রাহ্মণী। বাল্য বয়স থেকেই একা একা ঘুরে বেড়াই। ঘরে আমার সাত সতিনের জ্বালা। ঘরে তিষ্ঠুতে পারি না। ফুল্লরা তুমি অনুমতি দিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

ফুল্লরার চোখ বড় হয়ে যায়, মুহূর্তে উবে যায় ক্ষুধার জ্বালা। বলে, তুমি এত অপূর্ব সুন্দরী। তোমার অঙ্গে এত ঝলমলে অলংকার। মনে হয় উর্বশী নেমে এসেছে আমার ঘরে। কে তুমি? উমা নাকি রম্ভা, তিলোত্তমা, কমলা, ইন্দ্রানী? সত্যি করে বলো কেন তুমি বাড়ি ছাড়লে? কে তোমাকে এখানে আনল? তোমার বিরহে তোমার পতি যদি মরে যায় তবে কী করে সইবে দুঃখ? শাশুড়ি-ননদের সঙ্গে যদি ঝগড়া করে থাক তাও বলো? আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ওদের বোঝাব।

দেবীর রঙ্গ করার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। বলে, শোনো ফুল্লরা ব্যাধের দুঃখ দেখেই তো তোমার ঘরে এলাম। আমার ধনসম্পদ দিয়ে আমি ব্যাধকে তুষ্টি করে রাখব। তোমারও দুঃখ ঘুচে যাবে।

ফুল্লরার গলা শুকিয়ে যায়। তবু কণ্ঠে কান্না ঢেলে বলে, তোমার পরিচয়টা দাও।

দেবী বিনয়ে নুয়ে যায়। কণ্ঠে কান্না ঢেলে বলে, আমার পরিচয়ের কথা কী বলব? পতি আমার জনম ভিখারি। গঙ্গা নামে আমার সতিন আছে। স্বামী তাকে মাথায় ধরে রেখেছে। রাত-দিন ভাঙ খায়, আমার দিকে কোনো খেয়াল নেই। স্বামীর গরবে গরবিনী গঙ্গা আমাকে রাত-দিন গালাগালি করে। সতিনের ঘরে বিয়ে দিয়েছে পিতা, তাই বাপের বাড়িও ছেড়েছি। আর ফিরব না। আমি তোমার ঘরে থাকব। তোমার খাওয়া-পরা সব জোগাব। তোমার স্বামী বনে গেলে আমি তার সঙ্গে থাকব, পশু মেরে শুমার করে দেব। তোমরা সুখের মুখ দেখবে।

ফুল্লরা ফুঁসে ওঠে। রুষ্ট কণ্ঠে বলে, তোকে ভালোয় ভালোয় বলছি স্বামীর ঘরে ফিরে যা, নইলে পরিণাম ভালো হবে না। মূঢ়মতি তুই, নিজ পতি ছেড়ে লোকসমাজে মুখ দেখাবি কী করে? স্বামী নারীর গতি, নারীর বিধাতা। স্বামী পরম ধন, তাকে ছাড়া জীবনে সুখ হয় না। পতির ঘর ছেড়ে পরের কাছে এসেছিস তাতে কি মান বাড়বে? সতিন কোন্দল করে তো হয়েছে কী? দশগুণ শুনিয়ে দিবি। অভিমানে ঘর ছাড়বি কেন? রাগের চোটে বিষপান করলে নিজের প্রাণ নষ্ট হবে। সতিনের কী এসে যায় তাতে?

ফুল্লরার রুষ্ট ভাষণে দেবী মনে মনে হাসে। তবুও কৌতুক করার লোভ সামলাতে পারে না। বলে, ফুল্লরা সুন্দরী, আমি তোমার স্বামীর দুঃখ দেখে কষ্ট পেয়েছি। আমি একজনের মেয়ে এবং একজনের বউ, নিজের ভালোমন্দ বুঝি। তোমার উপদেশে আমার কিছু হবে না। আমি তো বনের মধ্যে একা একা বসেছিলাম, তোমার স্বামী আমাকে বেঁধে এনেছে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে আমি অন্যত্র যাব না থাকব। তোমাদের ভালো করার জন্য এখানে এসেছি। উলটো আমাকে কড়া কথা শোনাচ্ছ। তুমি যাই বলো আমি ব্যাধকে ছেড়ে যাব না। নিজের ধন দিয়ে তার দুঃখ ঘোচাব।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেদিন দেবীর এমন গভীর প্রত্যয়নিষ্ঠ কথায় ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। আজ সেকথা ভাবতে ওর হাসি পায়। ও যে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে গেছে সে কথা দেবীকে বুঝতে দেয়নি। বেশ সাহসের সঙ্গেই ঘটনার মোকাবেলা করেছিল। সোনালি জরির কারুকাজ শোভিত জামদানি শাড়িটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। আজকের সভায় ঠোঁট কতটুকু খুলে হাসবে তা ও পরীক্ষা করে নেয়। এটা ও নিয়মিত করে। এই ধরনের হাসি ও অনেক কষ্ট করে আয়ত্ত করেছে। সভা-সমিতিতে ও মাপা হাসির বাইরে যায় না। আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাসিকে ভীষণ মেকি মনে হয়। মুখমণ্ডলের রেখার কুঞ্চনের মধ্যে সজীবতা নেই। ওর হৃৎপিণ্ডে ধুকধুক করে ওঠে। চেহারার উজ্জ্বলতা কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? একসময় মেকাপেও কোনোকিছু লুকানো যাবে না? আপাতত চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে। মেকি হাসিতে ওকে কেমন ডাইনির মতো দেখাচ্ছে এই বোধে আক্রান্ত হলে ও খুব মর্মাহত হয়। অনেক চেষ্টায় নিজেকে উৎফুল্ল করতে পারে না। বাইরের ঘরে ভাঁড়ু দত্ত অপেক্ষা করছে। ও দ্রুত করিডোর পেরিয়ে আসে। বাইরে গাড়ি তৈরি। ও গাড়িতে ওঠে। ভাঁড়ু দত্তের ভিন্ন গাড়ি। মসৃণ রাস্তায় গাড়ি গড়িয়ে যায়। ফুল্লরা চিন্তাযুক্ত থাকে। নিজের মেকি হাসির ভূত কিছুতেই তাড়াতে পারে না। ও বিষণ্ন হতে চায় না। বিষণ্ন হলে সুখের কমনীয়তা নষ্ট হয়। মেকাপেও তা ঢাকা পড়ে না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। চেষ্টা করেও নিজেকে চিন্তামুক্ত করতে পারছে না। পরে ও বক্তৃতার বিষয়টি ভাবার চেষ্টা করে। পৃথিবীজুড়ে যে নারী দশক হচ্ছে এই নগরীতে তার উদ্বোধন করতে যাচ্ছে ও। বিদেশি অতিথিরাও থাকবে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কয়েক সহস্র নারী-মুখ। সেদিন ও দেবীকে বলেছিল স্বামী নারীর গতি, নারীর বিধাতা কী মূর্খ ছিল ও। কী বোকা। এখন বুঝতে পারে কত মিথ্যে এ কথা। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করার সময় এখনকার মেয়েদের ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলে। বলে, অর্থনৈতিক দিক থেকে মেয়েদের স্বনির্ভর হতে হবে। সংসার মানে নারী-পুরুষের যৌথ দায়িত্ব। সেখানে দুজনের অধিকার সমান। কেউ কারো চাইতে খাটো নয়। পরক্ষণে নিজের ভেতর চমকে ওঠে ও। এই কথাগুলো তো ওর নিজের জীবনের কোথাও সত্য নয়। ও নিজেই তো কালকেতুর পায়ের নিচে মাথা দিয়ে রেখেছে। এই জীবন, অর্থ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা সবই তো কালকেতুর জন্য। ও তো এর থেকে মুক্ত হতে পারছে না। এখন চাইলেও পারবে না। তা হলে কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনী ওকে খুন করে ফেলবে। লাশও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফুল্লরা অনুভব করে ওর মাথা ধরেছে। আসলে ও এইসব কিছু ভাবতে চায় না। ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে মুখে রাখে। চুষলে মাথা ধরা কমে।

গাড়ি সভাস্থলে পৌঁছে যায়। বিশাল প্যান্ডেল। অজস্র বেলুন, অসংখ্য ফুলের মালা, আকাশে উড়ে যায় শত শত কবুতর, অজস্র রঙিন শাড়িতে উজ্জ্বল নারীরা, কত শত ক্যামেরাম্যান। ফুল্লরা একমুহূর্ত চোখ বুজে দাঁড়ায়। গভীর করে শ্বাস নেয়। এই স্বপ্নপুরী থেকে কেমন করে নিজেকে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সরিয়ে নেবে? সে তো এক অসম্ভব কথা। জয় কালকেতু। প্রবল করতালি হচ্ছে চারদিকে। সমুদ্রের গর্জনের মতো ঢেউ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে চারদিক থেকে। শব্দের এমনই মাদকতা। ফুল্লরার বিষণ্নতা কেটে যায়। ও নিজের স্বর্গে প্রবেশ করে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে ওঠে। মাইকে ঘোষিত হচ্ছে ওর আগমন। গান গাইছে যুবতীরা। ফুল্লরা স্বপ্নের চেয়ারে বসে। এই নগরীতে কালকেতুর পরই ওর স্থান।

এই জনমের সার্থকতা বিবেচনা করে ও উদার দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখে। ওর পৃথিবীর শেষপ্রান্তে কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনী সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ঘিরে রেখেছে সভামঞ্চ। কেউ ফুল্লরার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনী অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং প্রভুভক্ত।

১০

অফিসে যেতে দেরি হয় মজিদের। ঘরে ঢুকতেই খেয়াল করে তারিকের টেবিল ঘিরে অন্যরা আড্ডা দিচ্ছে। কিছুটা উত্তেজনা সে আড্ডায়। তিন-চারটে খবরের কাগজ টেবিলে ছড়ানো।

বশীর চেঁচিয়ে বলে, মজিদ ভাই আজকের কাগজ দেখেছেন?

দেখেছি।

মজিদ ধীরে-সুস্থে নিজের টেবিলের দিকে এগুতে গেলে ওরা বাধা দেয়। ঐ দিকে যাবেন না, আমাদের এখানে এসে বসুন কিছুক্ষণ।

সাহানা হত্যার কথা বলবেন তো? এ আর নতুন কী? এই নগরীতে এইসব প্রতিদিনই হচ্ছে।

মজিদ ওদের সঙ্গে একটা চেয়ার নিয়ে বসে।

মজিদ ভাই ঠিকই বলেছেন। কিছুদিন আগে এসিডে পুড়ে গেল রোকেয়ার মুখ, খুন হলো গৃহবধূ চাঁপা। এখন আবার সাহানা। তাও আবার বিখ্যাত সাংবাদিক তবিরুদ্দীনের মেয়ে। আহা বেচারা!

এ ছাড়া কত ঘটনা ঘটে যায় তার খবর আমরা জানি না।

ঠিকই বলেছ। যৌতুকের নামে, সম্পত্তির নামে, প্রেমের নামে, যৌন লালসার নামে অহরহ খুনের খবর তো আমরা প্রতিদিনই পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখছি।

এই নগর কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছে মজিদ ভাই।

মজিদ ঠাণ্ডা গলায় বলে, সবচেয়ে ভয়াবহ বিরজা হত্যাকাণ্ড। সম্পত্তির লোভে তার স্বামীকে এবং বছর দুয়েক পরে পাঁচটি সন্তানসহ বিরজাকে কী করে খুন করল। মানুষ কীভাবে স্থির ঠাণ্ডা মাথায়

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এমন হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে আমি ভাবতে পারি না। ভাবলে আমার ইচ্ছে হয় আমার চৌদ্দ পুরুষের জীবন এই নগরী থেকে নির্বাসিত হোক। সত্যি, কী ভয়াবহ।

হঠাৎ করেই সবই চুপ হয়ে যায়। একসময় বশীর আস্তে আস্তে বলে, সত্যি আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না। আজকের পত্রিকার ঘটনাটাই কি কম ভয়াবহ। স্বামীর পরকীয়া এবং যৌন লালসার কাছে একটি নিষ্পাপ মেয়েকে জীবন দিতে হলো।

তারিক চেঁচিয়ে ওঠে। কে এর বিচার করবে? এই নগরীতে তেমন কেউ কি আছে যে শক্ত হাতে এই বিচারের হাল ধরবে?

হাল ধরবে কী রে? বরং বিচারের নামে প্রহসন হবে। আমরা সবাই সেই প্রহসনের দর্শক।

ঠিকই বলেছিস। অথচ এই নগরী পত্তনের সময় মেয়েটির বাবা বুনো শূকরের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। খুঁজে পাওয়া যায়নি তার লাশ।

আহারে! সেই দুঃখের দিনের কথা আমরা কী করে ভুলে গেলাম।

চেঁচিয়ে ওঠে মজিদ, ভুলব না? কী দৃষ্টান্ত আছে আমাদের সামনে যে ভুলব না? কী ঘটছে এখন? দেখতে পাও না আইনের আওতা থেকে সবাই পার পেয়ে যায় বলে কেউ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। টাকার জোরে আইনের ফোঁকর গলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অপরাধী। ফলে অন্যের চোখে সে হয়ে যাচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। অপরাধীরা আইন লঙ্ঘন করতে ভয় পায় না। সে জানে অপরাধের শাস্তি শেষ পর্যন্ত শূন্য।

মজিদের কণ্ঠ খুব উঁচুতে থেকেই শেষ হয়। কিন্তু প্রত্যেকে অনুভব করে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে প্রবল বাতাস এসে ভরিয়ে দিয়েছে ঘর। ওদের হাঁটু কাঁপে ঠক ঠক করে। ওদের জিভ শুকনো, মুখে কথা নেই। প্রত্যেকে সিগারেট জ্বালায়। ওরা একটা অবলম্বন চায়। মজিদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, এই যখন অবস্থা তখন এই নগরীতে নারী দশকের সূচনা হল। কাদের নিয়ে? মুষ্টিমেয় কয়জনকে নিয়ে। শতকরা নব্বইজন রয়ে গেল অবহেলিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অধিকার বঞ্চিত। দেখি ফুল্লরা কী বক্তৃতা করেছে?

মজিদ কাগজটা নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আবার হাত গুটিয়ে নেয়।

কি নেবেন না?

থাক। কী আর পড়ব? সবই তো অর্থহীন গৎবাঁধা কথা। আমাদের জীবন সবটাই মূল্যহীন।

খেয়াল করেছে ইদানীং ফুল্লরা বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, কালকেতুর পরই তার স্থান।

হো-হো করে হাসে বশীর, এই নগরী ওদের বাপের সম্পত্তি। বেশ আছে দুজনে।

বেশ আছে কি না তুমি কী করে জানলে?

https://boierhut.com/fb

জানার তো উপায় নেই। ওদের কর্মকাণ্ড দেখে বলছি। যে পুরুষ স্ত্রীর বাইরে সুন্দরী রমণীতে যাতায়াত করে তার ঘরে আর যাই থাক, স্বস্তি থাকে না।

সবাই মিলে হাসাহাসি করলে মজিদ অস্বস্তি বোধ করে। যাই কাজ করি, বলে ও উঠে পড়ে। বাকিরা তখন অশ্লীল রসিকতায় মেতে উঠেছে। ওদের বিষয়ের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। ওরা এসব আলোচনায় দারুণ মজা পায়।

নিজের চেয়ারে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মজিদ। কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে এলে শ্বাস ফেলা স্বাভাবিক হয়ে যায়। কোনো উৎকণ্ঠা বা অস্বস্তি তাড়া করে ফেরে না। বুঝতে পারে যে আজ আর হামিদুর রহমান ওকে খোঁজেনি। ও আয়েশ করে চেয়ারে বসে সিগারেট জ্বালায়। বশীরের ঘরে আড্ডা তুঙ্গে উঠেছে। হাসির শব্দ এবং খিস্তিখেঁউড় ভেসে আসছে। ওরা বেশ কাজ ফেলে আড্ডা দিতে পারে। ওর দরজার কাছে সেদিনের পড়ে যাওয়া ছেঁড়া ঘুড়িটা বাতাসে লুটায়। ঘুড়িটা কেউ ওখান থেকে ওঠায়নি। ঝাড়ুদারও ঝাড়ু দিয়ে নিয়ে যায়নি। ঘুড়িটা ছিঁড়ে আরো টুকরো হয়েছে। মেঝেতে ঘষা খেয়ে পতপত শব্দ হয়। মজিদ নথি খুলে বসে। জরুরি দুটো নথি ছাড়তে হবে। পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত একটা সভা ডাকতে হবে। তখন পিয়ন কুদ্দুস আসে।

স্যার, একটা কথা।

ও মুখ না তুলেই বলে, বলো।

কুদ্দুস টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়, আমার দুঃখের কথা স্যার, আপনাকে ভালো করে শুনতে হবে।

মজিদ তাকিয়ে দেখে কুদ্দুসের মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। ওকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। গত সাতদিন ও ছুটিতে ছিল।

কী হয়েছে কুদ্দুস?

আপনি তো জানেন স্যার আমার সাত মেয়ে। অনেক কষ্টে বড়টার বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের সময় কথা হয়েছিল জামাইকে সাইকেল কিনে দেব। দুমাসেও পারিনি। গতকাল রাগ করে সোনাবরুকে আমার কাছে রেখে যায়। সাইকেল না দিলে মেয়েকে নেবে না। এদিকে মেয়ের মা বলল, মেয়ের পেটে বাচ্চা। আমি বলছি নষ্ট করে ফেলতে। মেয়ে কিছুতেই রাজি না। বলে, দরকার হলে ও ঝি-গিরি করবে। তবু নিজের সন্তান নষ্ট করতে পারবে না। বলেন তো স্যার এতগুলো মানুষের মধ্যে আর একটা বাচ্চা আমি কেমন করে পালব?

কুদ্দুস হাত দিয়ে চোখের পানি মোছে।

মজিদ কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অন্যমনস্কভাবে বলে, তোমার মেয়ের নাম সোনাবরু। সুন্দর নাম রেখেছ তো।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাম দিয়ে আর কী হবে স্যার। প্রথম মেয়ে আমার, কত আদরের। বাপ হয়ে ওর জন্য তো কিছুই করতে পারলাম না, জামাইটাও চামার স্যার। মেয়েটাকে ঠিকমতো কাপড়ও দেয়নি। একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে আমার কাছে এসেছে। খালাআম্মার একটা পুরনো শাড়ি আমাকে দেবেন স্যার?

পুরনো শাড়ি? ঠিক আছে একটা দেব।

কুদ্দুস গদগদ হয়ে চলে যায়।

দুপুরে বাড়ি ফিরে খাবার টেবিলে বসে রঞ্জনাকে বলতেই রঞ্জনা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, কেন দেব?

গরিব মানুষ, এই মুহূর্তে মেয়েকে একটা শাড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য নেই।

তাতে কি হয়েছে? তাই বলে আমাকে দিতে হবে? আমাকে তো কেউ দেয়নি।

এসব কথা মনে করতে নেই রঞ্জনা।

ইস্ এত ভালোমানুষি ফলাতে হবে না।

রঞ্জনাকে কোনো কথা বলেই সুবিধে হয় না। জানে, কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। মজিদ চুপ করে থাকে। কুদ্দুসের জন্য খারাপ লাগাটা প্রবল হয়ে ওঠে।

রঞ্জনা রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে বলে, তা ছাড়া তুমি তো জানো না পুরনো কাপড় দিয়ে এলুমিনিয়ামের হাঁড়িপাতিল পাওয়া যায়।

একটা হাঁড়ি তোমার না হয় কমই থাকল? মজিদ চোখ না তুলে বলে।

রঞ্জনা রেগে যায়, তোমার সঙ্গে কথা বলা মুশকিল। তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করছ। অফিসের পিয়নের জন্য তোমার দরদ উথলে উঠেছে। ও পানির গ্লাস ঠিক করে রাখে। ভাতের থালা ঠেলে ফেলে চেঁচিয়ে বলে, খাওয়াটাই মাটি করলে। ইচ্ছে করলে তোমার পিয়নের মেয়েকে ঘরে এনে রাখো না। দরকার মতো শুতেও পারবে।

ছিঃ রঞ্জনা, নিজেকে ছোট করো না। মজিদ মৃদু ধমক দিয়ে বলে। তারপর অনুরোধ করে, প্লিজ খাও। আর কিছু বলব না।

রঞ্জনা ততক্ষণে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে। ভাতের থালায় পানি ঢেলে দেয়। মাছের টুকরো সে জলে ভাসে। মজিদ মুখ তোলে না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে অবস্থাটা। তারপর ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করে। খোঁচা খোঁচা দাড়িসর্বস্ব কুদ্দুসের মুখ ওর মগজে আটকে থাকে। ও ওকে একটা শাড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কীভাবে রাখবে কথা? খেয়ে দেয়ে বৈঠকখানায় এসে সোফায় বসে। কাগজ পড়ার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি পৃষ্ঠা দেখে। না-দেখা সোনাবরুর মুখ ভেসে ওঠে। ভাবে, ওর দুঃখ আমার মতো নয়। আমার মতো ওর বুক থেকে রক্ত ঝরে না। ওর গভীর বিশ্বাস আছে। এ জন্য ও বাচ্চা নষ্ট করতে রাজি হয়নি। ও তারাবানুর মতো শক্তিশালী। জীবনের দুঃখগুলো পায়ে মাড়িয়ে যায়। আমিও তো এমন করে জিততে চাই। ওদের মতো মানুষ

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হতে চাই। কিন্তু পারি না। রঞ্জনার জন্য ওর অনেককিছু ছেড়ে দিতে হয়। ও টেবিলের ওপর পা উঠিয়ে দেয়। দিনটা বেশ গুমোট। রঞ্জনার সাড়াশব্দ নেই। ও কি ঘুমিয়ে গেল? অদ্ভুত মেয়ে ও। রাগ করলে চট করে ঘুমিয়ে যায়। এই এক শান্তি। যতটুকু তুলকালাম কাণ্ড করে ততটুকু রাগ ধরে রাখতে পারে না। মজিদ নিঃশব্দে শোবার ঘরে আসে। রঞ্জনা ঘুমিয়ে গেছে। মন্টি ওর বুকের কাছে গুটিসুটি শুয়ে আছে। ওর জ্বর ভালো হয়ে গেছে, এখন বেশ হাসিখুশি। মজিদ পুরনো কাপড়ের গাট্টি থেকে রঞ্জনার একটা শাড়ি বের করে খবরের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে নেয়। কাজের মেয়েটাকে দরজা বন্ধ করতে বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। ইউনুসের দোকানটা ওর একটা আশ্রয়স্থলের মতো। প্রয়োজনমতো যে কোনো কাজেই লাগে। আজো শাড়ির প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আমার এ জিনিসটা তোর কাছে রাখবি। কাল সকালে অফিস যাবার সময় নিয়ে যাব।

ইউনুস একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে দেয়।

তুই সাড়ে সাতটার আগে দোকান খুলিস তো?

কি যে বলেন স্যার, সূর্য ওঠার আগেই আমি দোকান খুলি। জিনিসটা দিতে ভুলিস না কিন্তু। আমার মনে না থাকলে তুই কিন্তু আমাকে মনে করিয়ে দিবি।

খুব পারব, কোনো অসুবিধে হবে না আপনার। ঘড়িটার কোনো খোঁজ পেলেন স্যার?

খোঁজ তো করিনি।

করেননি স্যার?

ধুর, একটা ঘড়ির জন্য কে আবার থানায় দৌড়াদৌড়ি করবে?

তাই বলে ছেড়ে দিলেন?

মজিদ হো-হো করে হাসে। বলে, কাউকে তো ধরিনি, ছাড়ব কেমন করে। শোন, মানুষ খুন হলে তারই বিচার হয় না। আমার তো একটা সামান্য ঘড়ি। আসলে কি জানিস, ঘড়ি উদ্ধারে জন্য যে পয়সা ব্যয় হবে তা দিয়ে নতুন ঘড়ি কিনতে পারব। ইউনুস হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মজিদ ঘড়ির ব্যাপারটা এত সহজে উড়িয়ে দেবে ও ভাবতেই পারে না।

এক প্যাকেট স্টার দে।

স্টার নিয়ে বাসায় ফিরে আসে ও। ঘড়ির মতো ছোট জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোর চাইতে অনেক বড় বোঝা ওর মাথার ওপর চেপে আছে, সেসব নিয়ে তো কারো কাছে যেতে পারে না। ওর জন্য থানা একটা ক্ষুদ্র জায়গা। এইসব ভাবতে ভাবতে ও রঞ্জনার পাশে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না। রঞ্জনার চুল থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে। বিয়ের পর রঞ্জনা ভাইয়ের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। যাকে অবলম্বন করে ও এ কাজটি করেছে তার ওপর কি ওর পরিপূর্ণ নির্ভরতা আছে? ইচ্ছে করলেই রঞ্জনাকে ও ছুঁতে পারে না, ইচ্ছে করলেই রঞ্জনার কাছে কোনো কিছু চাইতে পারে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

না, ভালোবাসার কথা নেই, সুখদুঃখ বোধ নেই, তা হলে রঞ্জনা ওর জীবনে কী? সামাজিক অর্থে শুধু স্ত্রী, সম্পর্কের যে গভীরতা স্বামী-স্ত্রীর সংজ্ঞা নিরূপণ করে তার থেকে রঞ্জনা অনেক দূরে। মজিদ ওর বাবা-মাকে দেখেছে, চাচা-চাচিকে দেখেছে, এমনকি দাদা-দাদির বুড়ো বয়সও দেখেছে। সবটাই ওর কাছে মধুর স্মৃতি। একের সঙ্গে অন্যের যেন শত জনমের বন্ধন, যে বন্ধন স্বর্গীয় এবং মহিমাদীপ্ত। কিন্তু রঞ্জনা তেমন বন্ধন অনুভব করে না। ওর জন্য রঞ্জনার আকুল-করা দৃষ্টি নেই, প্রচণ্ড মমতার অনুভব নেই, ও শুধু রঞ্জনার বেঁচে থাকার অবলম্বন।

মজিদ হাত বাড়িয়ে ওর চুল স্পর্শ করে। ঘন কালো চুলের গোছা রেশমের মতো মসৃণ। নিমীলিত চোখের তারায় চুমু দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু সাহস হয় না। হয়তো জেগে গিয়ে রাগারাগি করবে। যেসব শব্দ ব্যবহার করবে সে অনলে পুড়ে যাবে ক্ষণিকের ভালো লাগা। রঞ্জনার পিঠে হাত বুলোয়। হয়তো সেই স্পর্শে রঞ্জনা পাশ ফিরতে গিয়ে জেগে যায়। মজিদের চোখে চোখ পড়ে। মজিদ মৃদু হাসে, ঘুম তাড়িয়ে দিলাম?

রঞ্জনা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়, ওর চোখে ঘুমের আমেজ। মজিদ ওর ভুরুতে আঙুল রাখে, উঠবে না?

রঞ্জনা মৃদু হাসে। সে হাসিতে বুক ভরে যায় ওর। মনে মনে বলে, রঞ্জনা এমন করে সব সময় হাসো না কেন? ও আলতো করে রঞ্জনার গলা জড়িয়ে ধরে। রঞ্জনা বাধা দেয় না।

চলো না। চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি?

কোথায়?

তুমি যেখানে বলবে?

তোমার খালার বাসায়?

না, কদিন আগে তো গেলাম।

তা হলে নবীদের বাসায়?

ওর বউ বাপের বাড়ি গেছে।

তাই নাকি? আমি ভুলে গেছি।

রঞ্জনা খিলখিলিয়ে হাসে, তোমার ছোট ভাইয়ের কথাও ভুলে যাও।

মজিদ সপ্রতিভভাবে বলে, না ভাইয়ের কথা ভুলি না। ওদের বউদের কথা ভুলে যাই।

বুঝেছি, তুমি একদম সাধু ব্যক্তি।

ঠিক বুঝেছ, তাহলে চলো লেকের পাড়ে যাই।

সেই ভালো। চটপটি খাওয়াবে তো?

রাজি।

চলো ওঠো।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু রঞ্জনাকে সঙ্গে সঙ্গে উঠতে দেয় না মজিদ। ওকে বুকে টেনে নিতে নিতে ভাবে, সবটাই দুঃখ নয়। মাঝে মাঝে বিসর্গ উড়ে যায়। এই ফোঁটা দুটো না থাকলে দুঃখ আর দুঃখ থাকে না।

ঘড়ি নেই বলে পরদিন অফিস সময়ের বেশ কিছু আগেই ও পৌঁছে যায়। দু-একজন পিয়ন ছাড়া তখন কেউ আসেনি। ইউনুসের দোকান থেকে শাড়িটা আনতে ও ভোলেনি। যত্ন করে সেটি টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দেয়। দখিনের দরজা খুলে চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকে। দরজার সামনে একটা শালিক উড়ে এসে বসে, আবার চলে যায়, আবার আসে। হয়তো ওর কোনো ছুটি নেই, হয়তো আছে। ও মগ্ন হয়ে পাখি দেখে। পাখিটার এটা একটা খেলা হতে পারে, হয়তো ওর সঙ্গেই খেলছে। কে জানে! আজ ওর মন ভালো নেই। রাতে রঞ্জনা আগের মতো দুর্ব্যবহার করেছে। রাগে-দুঃখে ঘুমুতে পারেনি মজিদ। অথচ গতকাল বিকেলে লেকের ধারে বেড়ানোর সময় খুব উজ্জ্বল ছিল রঞ্জনা। লেকের টলটলে জলে পা ডুবিয়ে বসেছিল ওরা। গোলাপি শাপলা ছিঁড়তে নেমেছে রঞ্জনা, কিন্তু নাগাল পায়নি। যে ছেলেটি চটপটি এনে দিয়েছিল তাকে ও পাঁচ টাকা বখশিশ দিয়েছে। ছেলেটির মা নেই শুনে রঞ্জনাই টাকাটা দিতে বলেছে। কাল বিকেলে রঞ্জনা একদম অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। একদম ওর অপরিচিত একজন। পাশ দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছিল, তার মাঝেও ও গুনগুনিয়ে গান গেয়েছে। কোনো সংকোচ করেনি। সে সুর স্পর্শ করেছিল মজিদের হৃদয়ের গভীরতম স্থান। ও বারবার রঞ্জনাকেই দেখছিল। ও জানে ওর এইসব অনুভূতির কথা শুনলে অন্যরা হাসবে। তারিক তো নির্ঘাত বলবে, পয়সা দিন আপনার এই অনুভূতিকে আমরা সেলিব্রেট করব। অথচ ও জানে ব্যাপারটা ওর জন্য কত নির্মম। কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না যে রঞ্জনাকে ট্যাকল করা কত ডিফিকাল্ট। এমন পরিস্থিতি হলে ও মনে করে ও অন্যের বউকে দেখছে। অন্যের বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে যেমন নিরাপদ দূরত্ব থাকে তেমন দূরত্ব রঞ্জনার সঙ্গেও রাখতে হয়। এমন গুনগুনিয়ে গান গাওয়া রঞ্জনাকে কি ও কোনোদিন দেখেছে? ও চাপা স্বরে বলে, পুরো গানটা গাও। রঞ্জনা কথা রাখে। পুরো গান গেয়ে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দেয় মজিদের মুখের ওপর। মজিদ ভাবে, চটপটি এনে দেওয়া দশ বছরের বালকটি কি ওকে বদলে দিয়েছে? অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সোনাবরুর দুঃখ ওকে একটুও স্পর্শ করেনি। রঞ্জনা বারবার বলছিল, ঐ ছেলেটিকে ডাক একটু গল্প করি। কিন্তু ছেলেটি অন্যদের চটপটি দেওয়া নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে কথা বলার সময় ওর ছিল না। রঞ্জনা আনমনা হয়ে বলেছিল, ওর মতো বয়স আমারও ছিল এবং ঐ বয়সে সংসারের কাজে আমাকেও এমন ছুটোছুটি করতে হতো। মজিদ ভাবে, বড় বিচিত্র এই পৃথিবী। ঐ বালকটি কিছুক্ষণের জন্য রঞ্জনার দৃষ্টিতে আটকে গেল। মুহূর্তে ওর মধ্যে ও নিজের শৈশব দেখে নিল। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও ফিরতে চায়নি রঞ্জনা। আকাশে পূর্ণ চাঁদ ছিল, স্নিগ্ধ বাতাস ছিল, কণ্ঠে গান ছিল, দৃষ্টিতে স্বপ্ন ছিল, তবুও অনেক রাতে ঘুমাতে ভালো লেগেছিল। এখন মাথাটা আবার কেন ঝিমঝিম করছে। কাজের মেয়েটা ওকে রুটি এবং আলু ভাজি দিয়েছিল। ও খায়নি।

https://boierhut.com/fb

রোজই ও এইসবই খায়। কিন্তু আজ খেতে পারেনি, কারণ রঞ্জনা ওঠেনি। ও জেগে শুয়েছিল। সে কারণে মজিদের আরো বেশি রাগ হয়। এখন এক কাপ চা খাবার কথা ও ভাবে। রঞ্জনার কথাও ও ভাবে এবং নিজের দুঃখী জীবনের জন্য মায়া অনুভব করার মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে কুদ্দুস ঢোকে।

স্যার, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কী হয়েছে? কী খবর কুদ্দুস?

স্যার ভোর রাতের দিকে সোনাবরু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

চিৎকার করে কেঁদে ওঠে কুদ্দুস। অফিসে তেমন কেউ ছিল না। আশপাশ থেকে দু-চারজন পিয়ন ছুটে আসে।

বসো, কুদ্দুস তুমি এই চেয়ারে বসো।

মজিদ কুদ্দুসকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় ও খুব হকচকিয়ে যায়। ওর বুকে ব্যথা হয়। ও অসুস্থ বোধ করে। ওর মনে হয় ওর কিছুই করার নেই। ও কি করতে পারে কুদ্দুসের জন্য? কুদ্দুস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে ও হালকা হয়। অন্যরা ওকে ঘিরে ধরেছে। নানারকম কথাবার্তা বলে। মজিদ কুদ্দুসকে দেখে, উস্কখুস্ক চুল, লাল চোখ, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কপালের মাঝখানে বড় একটা কাটা দাগ, চেহারায় কোনো শ্রী নেই, লোকটি একজন পিতা এবং নিজের ব্যর্থতায় কাঁদছে। পরিবার পরিকল্পনা করার জন্য কালকেতুর এত চিৎকার সত্ত্বেও ও কালকেতুর কথা শোনেনি। ইচ্ছেমতো সন্তান উৎপাদন করেছে। মজিদের মনে হয়, আর কিছুদিন পর কালকেতু হয়তো উৎপাদনে সক্ষম দম্পতিদের জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ ঘটাবে কিংবা একের অধিক সন্তান যাদের হবে তাদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবে। এই নগরীর সৌন্দর্যের জন্য কালকেতুর নিজের ইচ্ছের রূপায়ণ চায়। কুদ্দুসের মুখটা মজিদ কিছুতেই ধরে রাখতে পারে না। ওটা একবার কালকেতু হয়ে যায়, একবার ফুল্লরা। এই নগরী এখন এই দুজনের দখলে। যা কিছু ভাবনাচিন্তা তার মধ্যে কালকেতু প্রবেশ করে। একসময় কুদ্দুস ওর জল ভেজা চোখ মজিদের মুখে ন্যস্ত করে, স্যার, কাঁদার তো সময় নেই আমার। আমি এসেছি অফিস থেকে কিছু টাকা সাহায্য নিতে। দাফন-কাফনের ব্যবস্থা তো করতে হবে।

কী হয়েছিল সোনাবরুর? তুমি না গতকাল ওর জন্য শাড়ি চাইলে?

বোঝেনই তো স্যার অভাবের সংসার। এতগুলো মেয়ের মধ্যে আবার একটা বাচ্চা। তাই মেয়েটাকে চাপ দিয়েছিলাম বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলতে। ও কিছুতেই রাজি হয় না। শেষে আমার খুব রাগ হয়েছিল। মেয়েটাকে দুটো চড় মেরেছিলাম। ওর মাও মেরেছিল। আমার অন্য মেয়েরাও ওর সঙ্গে রাগারাগি করেছিল। রাতে কেঁদেকেটে আর খায়নি। শুয়ে ছিল। বোধহয় ভোররাতের দিকে ঘটনাটা ঘটিয়েছে। সকালে ওর মা দরজা খুললেই দেখে বারান্দায় ঝুলে আছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কে একজন বলে, আহারে। অন্যজন চেঁচিয়ে ওঠে, জামাইটা কোথায়, বেটাকে ধরে এন পেঁদানি দেওয়া উচিত। আর একজন কুদ্দুসের ওপর চড়াও হয়, আপনিও বাড়াবাড়ি করেছেন। মারার কি দরকার ছিল।

তখন মজিদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। যারা মন্তব্য করছিল ওদের থামিয়ে দিলে বলে, এসব কথা থাক। কুদ্দুস তুমি সচিবের সঙ্গে দেখা করো। আমাদের তো অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম আছে। তোমারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কোনো সমস্যা হলে আমাকে খবর দিও। আমি নিজে গিয়ে দেখব।

কুদ্দুসের পেছনে পেছনে বাকিরা চলে গেলে ও ধপ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়ে। মাথা ঝিমঝিম করছে। কিছুই ভালো লাগে না। শালিকটা আর আসে না। অনেক লোক দেখে ওটা হয়তো চলে গেছে। মজিদের সঙ্গে ওর খেলা শেষ। ও জানালায় এসে দাঁড়ায়। দেবদারু গাছের ডালে একটা কোকিল চুপচাপ বসে আছে। এটা মেয়ে কোকিল, ধূসর রঙের পালকে বিচিত্র কারুকাজ। ওটা নীরব। ও ডাকে না, ডাকে ছেলে কোকিল। ওর চোখের লাল মণিতে পাতার ছায়া। কোথাও শালিক একটা, কোথাও কোকিল। কখনো সোনাবরুরা একা হয় বলে মরে যায়। মৃত্যু সহজ, বেঁচে থাকা কঠিন। মজিদ নিজের ভেতর কুঁকড়ে ওঠে। আজ আবার একটা সুতো-ছেঁড়া সবুজ রঙের ঘুড়ি ওর সামনে উড়ে এসে কাঁঠাল গাছে আটকে যায়। মাঞ্জা করা চিকন সুতো পাতার ফাঁকে আটকে থাকে। ওর ইচ্ছে করে ঐ সুতোর মাথা ধরে ছেলেবেলার মতো দৌড়ে যেতে। কোথায়? কতদূরে? নিশ্চয়ই দিগন্তের কাছাকাছি।

ও আবার চেয়ারে ফিরে আসে। এক চুমুক পানি খায়। পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করে। ভাবে আজকের দিনটা এক স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের ফোকরে ঢুকে গেছে, ওর মগজে সবুজ ফার্ন থেকে গজিয়ে ওঠে শিল্পকর্ম। ঠিক দিয়েগো রিভেরার মুরালের মতো। অনেকদিন আগে দিয়েগো সম্পর্কে পড়েছিল। 'চাপিনগোর কৃষি বিদ্যালয়ের দেয়ালে রিভেরা যে বিশাল মুরাল এঁকেছেন, ঋতুর পরিবর্তন, মাটি পৃথিবী আকাশ, তরুলতা উদ্ভিদ মঞ্জরি, চাষি—এতসব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে বিশাল এক নগ্ন নারীমূর্তি, ভূমিজননী। ক্লেশেন্ডে ওরোসকোর ছবিতে থাকে ভাঙাচোরা রেখা, কাটাকুটি করা, তেড়াবাঁকা, যন্ত্রণাময়, কোনাকুনি রেখার আঁচড়; কিন্তু দিয়েগো রিভেরার ছবিতে যখনই প্রকৃতি বা সাধারণ নারীপুরুষ আসে, তাতে গর্ভের আকারের দৃশ্য, প্রাকসৃজনপর্ব, যেন নরম বক্র বর্তুলরেখা। ডেট্রয়েট আর্টস-মিউজিয়ামে চার দেয়াল জোড়া তাঁর যে বিশাল মুরাল, কারখানা ও শ্রমিকদের দেখবার কলকারখানা, স্বয়ংবলে বন্ধনী ইত্যাদি সবকিছুই দেখানো হয়েছে, দেখানো হয়েছে এমনকি কারখানায় ঢুকবার আগে সারি সারি শ্রমিক যেভাবে তাদের কার্ড পাঞ্চ করে নিচ্ছে, কেমনভাবে তাদের কাজ করতে হচ্ছে আগুন-কীলক লোহা, নেহাই-হাঁপর ইত্যাদি নিয়ে, কিছুই বাদ যায়নি।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাবতে ভাবতে মজিদের মাথার ফার্ন ঋতু পরিবর্তনে ভিন্ন রং হয়ে যায়। ও ব্যাকুল হয়ে একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়। সেই ভাবনায় উঠে আসে সোনাবরু—ও যেন বিশাল নগ্ন এক নারীমূর্তি, ভূমিজননী। এই নগরীতে একজনও দিয়েগো রিভেরা নেই। তাই ভূমিজননীরা আত্মহত্যার শিকার। সে চোখের মণি নড়ে না, পাতা কাঁপে না, ওর ঠোঁট স্ফুরিত হয় না।

ওহ্।

অস্ফুট আর্তনাদে ও হাতের তালুতে মাথা চেপে ধরে। আমিও তো এমন এক অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষায় আছি। আমিও চাই বন্ধ হোক এই দিনযাপনের রক্তক্ষরণ। মজিদ উঠে বাথরুমে যায়। কল ছেড়ে চোখেমুখে পানি দিতে থাকে। কিছুতেই ও ঝুলন্ত সোনাবরুকে চোখের সামনে থেকে তাড়াতে পারে না। ওর কান্না পায়, ও কেঁদে ফেলে। চোখের জল এবং কালের জল এক হয়ে যায়।

স্যার টাকা পেয়েছি। পুলিশ কতক্ষণে লাশ ছাড়বে জানি না। নইলে আপনাকে একবার যেতে বলতাম।

ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে ভেব না। তোমার কোনো দরকার হলে আমাকে বলবে

জি, স্যার।

কুদ্দুস চলে যায়। আজ আর মজিদের কাজে মন বসে না। বারবারই মনে হয় রঞ্জনার এই শাড়িটা ওর গলার চারদিকে ফাঁস হয়ে আটকে আছে। এটাকে এখন ও কী করবে? মনে পড়ে তারাবানুর কথা। শাড়িটা ও তারাবানুকে দেবে। ছুটি হওয়ার অনেক আগে ও চুপচাপ অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। হামিদুর রহমানের কাছ থেকে ছুটি নেওয়া উচিত ছিল। হয়তো খুঁজতে পারে, না পেলে রাগ করতে পারে, কিছু এসে যায় না। ও উদাসীন বাউল হয়ে অফিসের চত্বর পেরিয়ে আসে।

ফুটপাতের যেখানে তারাবানু আর সুলেমানের সংসার ছিল সেখানে ওরা নেই। গাছের গোড়ায় পড়ে আছে কালো হয়ে যাওয়া ইট, কয়লা, ছাই, শুকনো কাঠ। একটু দূরে দুটুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়া শানকি, তরকারির খোসা, একগাদা সিগারেটের টুকরো এবং কয়েকটা স্টারের খালি প্যাকেট। মজিদ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যদি ওর দৃষ্টির সীমানার মধ্যে এই পরিবারটিকে ধরা যেত? যদি খুঁজে পেত ওদের নতুন ঠিকানা? হাতের মুঠোর মতো ছোট এই নগর, তবু একজন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ওর মনে হয় মানুষ, রিকশা, গাড়ি, বাস ওর চোখের সামনে হলুদ হয়ে গেছে। জন্ডিস-আক্রান্ত এই নগরীর কারো চেহারা ঠিকমতো চেনা যায় না। ওকেও অন্যরা চিনতে পারে না। শুধু ওর হাতের শাড়ির প্যাকেট বিশাল ওজনের বোঝা হয়ে যায়, যা বহন করার শক্তি ওর নেই।

https://boierhut.com/fb

ও যতদূর দৃষ্টি যায় তাকায়। তারপর গাছের গোড়ায় প্যাকেটটা ফেলে দেয়। ধীর পায়ে পেরিয়ে আসে ফুটপাত। তারাবানুকে শাড়িটা দিতে পারলে ওর মানসিক ভার লাঘব হতো। এখন ও কার কাছে যাবে? রঞ্জনা ওর হয় না। ওকে বোঝে না। আসলে ওর কেউ নেই। ও নিজের ভাবনা ছেড়ে সোনাবরুর কথা ভাবে। কী ভয়ানক অভিমানী মেয়ে। ও সন্তানের মৃত্যু চায়নি। ও সার্থকভাবেই ভূমিজননী হতে চেয়েছিল। কিন্তু কালকেতুর নগরীতে সাফল্য কোথায় যে একজন ভূমিজননী স্বর্ণপ্রসবিনী হবে? নগরজুড়ে তো কেবল ব্যর্থতা, হতাশা, অনুর্বরতা এবং চোরাকুঠুরির অন্ধকার। মজিদ ভাবে একজন দিয়েগো রিভেরা এই নগরীর জন্য অপরিহার্য। কবে তিনি আসবেন? কবে এই নগরের সবগুলো দেয়ালে দিয়েগো ভূমিজননী প্রতিষ্ঠিত হবে? কবে চারদিক থেকে সাফল্যের জোয়ার বয়ে আসবে? মন্টির কথা খুব করে মনে পড়ে মজিদের। ও বাড়িমুখো হয়। বাড়ি মানেই তো কেবল রঞ্জনা নয়। একটি শিশু আছে। ওর নিষ্পাপ চেহারায় জ্যোতি আছে। সে জ্যোতিতে নির্মিত হবে এই নগরীর সোনালি ভবিষ্যৎ।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি অনুভব করে মজিদ। বোঝে না একজন মেক্সিকান শিল্পী কেন এই মুহূর্তে ওর মাথায় ভর করল। ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, আমারে কি আপনের চাইতে বেশি বুড়া লাগে? মজিদের চমক ভাঙে। তাই তো, লোকটি আহত হয়েছে। ওর দাড়ি এবং মাথার টুপি দেখে ও কিছুটা সম্মানসূচক কথা বলেছে। বয়সের হিসেব করে বলেনি। মজিদ লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি বলে, না এমনি বললাম। চলেন। ও রিকশায় উঠে বসে। মনে মনে বলে, যৌবন এমনই অমূল্য জিনিস সেটা পেরুতে গিয়ে প্রত্যেক মানুষই কষ্ট পায়। যাক, এ এক ধনের মজার অভিজ্ঞতা। রিকশা চালায় বলে তো তার হৃদয় মরে যায়নি। পরক্ষণে ওর মনে হয় এতকিছুর পরও এই শহরে যৌবন নেই। যে রিকশাওয়ালা বয়স্ক হতে চায় না। সে নিজেও জানে না যৌবন কী? যৌবনের মর্ম বোঝে সেই শিল্পী যে উর্বরতা চায় এবং চেনে এবং চেনে স্রষ্টার সাফল্য। যৌবন যদি সৃষ্টি করতে না পারে সে মরা যৌবন দিয়ে কী হবে? সে যৌবন হবে এই রিকশাওয়ালার মতো অভিমানী পরগাছা যাকে টেনে বেড়ানোই সার, যার মধ্যে শক্তি নেই।

মজিদ বুঝতে পারে কেন এই মেক্সিকান শিল্পী আজ ওর মাথায় ভর করেছে। ও দিয়েগোকে অনুভব করে যৌবন এবং সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ভূমিজননী শব্দটি নিয়ে ও ছুটে যেতে চায় নগরীর দ্বারে দ্বারে। সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে চায়, তোমরা এই নগরীকে বাঁচাও। প্রবল অনুর্বরতা একে গ্রাস করছে। এই নগরীর শিশুদের নিষ্পাপ চেহারায় জ্যোতি ফুটিয়ে তোলার জন্য নগরের কেন্দ্রে সমবেত হও। সোনাবরুদের গর্ভের সন্তানদের ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ দাও।

ঠিক তখুনি পেছন থেকে একটি গাড়ি এসে ওদের রিকশায় ধাক্কা দিলে কংক্রিটের ফুটপাতে ছিটকে পড়ে মজিদ। গাড়ি রিকশাওয়ালাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। জ্ঞান হারাবার আগ পর্যন্ত মজিদ শুনতে পায় চারদিকে হট্টগোল। ধর, ধর আওয়াজ। হুইসেলের তীব্র শব্দ। ও কোনো একটা কিছু

https://boierhut.com/fb

মুঠি করে ধরার জন্য হাত বাড়ায়। শূন্য মুঠি কংক্রিকেটের দেয়ালে পিষ্ট হয়। মুখটা ভেসে ওঠে মুহূর্তের জন্য। ওর আর কিছুই মনে থাকে না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেদিন মিটিং শেষে ফিরে আসার পর ঘুম আসে না ফুল্লরার। চারদিকের এত আলো, মালা, করতালি, প্রশংসাধ্বনির মাঝেও বার বার নিজের কথাই মনে হচ্ছে। কত ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করে বক্তৃতা করেছে। বলেছে, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। এ ছাড়া নারী সমাজের রক্ষা নেই। নিজেদের ভালো নিজেদেরকেই বুঝতে হবে। অথচ নিজের শৈশব, কৈশোর, যৌবন তো তার আজকের বক্তৃতার বিপরীতে কেটেছে। নিজের যৌবন তো ক্ষুন্নিবৃত্তির যৌবন। মনে পড়ে সেদিন দেবীকে তাড়ানোর জন্য কত রকমের ছলচাতুরী করেছিল। নিজের বার মাসের দুঃখের কথা শুনিয়েছিল। কত কাকুতি-মিনতি, অনুনয় বিনয়। সে জীবনের সঙ্গে আজকের জীবনের কত তফাত। কালকেতুর বাইরেও এখন ও নিজে কোটি টাকার সম্পদের মালিক। ওর চারদিকে প্রাচুর্য এবং বিলাস। বিছানায় শুয়ে সেদিনের ঘটনায় হেসে গড়িয়ে পড়ে ও। কত অনুনয় করে ভেঙে পড়েছিল দেবীর সামনে। ভিখেরির মতো নিজের দুঃখের সাতকাহন গেয়েছিল। কী লজ্জা! ঘরে কেউ নেই তবু জিহ্বায় কামড় দেয় ও। বালিশ থেকে সুগন্ধ আসছে। ও কাত হয়ে শুয়ে বিছানার চাদরে আঁকিবুঁকি কাটে। সেদিনের সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাত।

সেদিন দেবীর গভীর প্রত্যয়নিষ্ঠ কথায় ভেঙে পড়ে ও। কেমন করে এই সুন্দরীকে বাড়ি থেকে তাড়াবে বুঝতে পারে না। পাগলের মতো নিজের বার মাসের দুঃখের কথা বলতে থাকে। এতে যদি কুপিত হয়ে সেই সুন্দরী চলে যায়, মনে তার এই আশা। তুমি সুন্দরী উর্বশী, উর্মিলা, কেমন করে যে আমার দিন কাটে তা তোমাকে কী করে বোঝাব। বৈশাখে শুরু হয় খরতর খরা, মাটিতে পা রাখলে পা পোড়ে। হাটে পসরা নিয়ে বসার জন্য গাছের ছায়া পাই না। বৈশাখে মাংস বিক্রি হয় না, সবাই নিরামিষ খায়। জ্যৈষ্ঠ মাস আরো ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড তাপে মাথার কাপড় চিরে যায়। পসরা রেখে জল খেতে যেতে পারি না। চিলে মাংস ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এই মাসে হাবিজাবি ফল খেয়ে উপোস করি। আষাঢ় মাসে নতুন মেঘের জল নামে। সম্পন্ন গেরস্থরা পর্যন্ত এই মাসে অচল হয়ে যায়। আমি মাংসের পসরা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরি। সামান্য যা খুদকুঁড়ো মেলে তাতে পেট ভরে না। নিজের ভাগ্যের কথা আর কী বলব? বড়ই অভাগী আমি। জোঁকে পায়ের রক্ত খেয়ে শেষ করে। শ্রাবণ মাসে রাতদিন বর্ষণ হয়। বেরুনোর উপায় থাকে না। ভাদ্রমাসে নদনদী একাকার হয়। চারদিকে জল আর জল। মাংসের পসরা নিয়ে ঘরে ঘরে যাই। দুঃখের দহনে হৃদয় পোড়ে। কত আর দুঃখের কথা বলব? এর মধ্যে স্বামী বিপথে গেল, বিধাতাও বিমুখ। আশ্বিনে অম্বিকা পূজার উৎসব শুরু হয়। মহিষ, ছাগল, মেষ বলি দেওয়া হয় ঘরে ঘরে। সব নারীপুরুষ ভালো ভালো কাপড়চোপড় পরে আনন্দ উৎস করে আর আমি অভাগী ফুল্লরা অন্নের চিন্তায় দিন কাটাই। এই সময় কেউ মাংস কিনতে চায় না। দেবীর প্রসাদের মাংস সবার ঘরে থাকে। কার্তিক মাসে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হিম নামে। হাড়ে ঠক ঠক করে শরীর। সবার শীত নিবারণের কাপড় আছে। আমি অভাগী ফুল্লরা কেবল হরিণের চামড়া গায়ে জড়িয়ে দিন কাটাই। পৌষে প্রবল শীতে বাপের নাম ভুলে যাই। মাঘ মাসে কুজ্‌ঝটিকায় শিকার মেলে না। অন্ধকারে মৃগ লুকিয়ে গেলে ব্যাধ কিছুই দেখতে পায় না। ফাল্গুনে পাথরবাটি বন্ধক দিয়ে খুদকুঁড়ো জোটাতে হয়। মধুমাসে সবখানে যখন আনন্দ-জীবজগতে সাড়া জাগে—নারীপুরুষে প্রেম উথলে ওঠে, আমার জন্য থাকে কেবল উদরের দহন।

বার মাসের দুঃখের কথা বলতে বলতে ফুল্লরা কেঁদে আকুল হয়। বলে, এতদিন শোনার পরও তুমি এখানে থাকবে উর্বশী?

দেবী মৃদু হেসে বলে, আমি তোমার দুঃখে বিচলিত হয়েছি ফুল্লরা। এখন থেকে সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

ফুল্লরা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে, তার মানে তুমি যাবে না?

দেবীর মুখের হাসি নিষ্প্রভ হয় না। ফুল্লরা বিমূঢ় হয়ে থাকে। বুঝতে পারে এত চেষ্টার পরও কালকেতু আসার আগে একে তাড়ানো যাবে না। না জানি কি বিপর্যয় আছে ওর ভাগ্যে। ও রেগে বেরিয়ে যায়। কালকেতুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথে বের হয়। কাপড়চোপড় ঠিক নেই। খোলা চুল বাতাসে ওড়ে। চেহারায় ক্রোধ। ফুল্লরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। গোলাহাটে গিয়ে ও কালকেতুকে খুঁজে বের করে। ওর অবস্থা দেখে কালকেতু দ্রুত কাছে আসে।

তোমার কী হয়েছে ফুল্লু বউ? ঘরে শাশুড়ি নেই, ননদ নেই, সতিন নেই তবু তোমার এ অবস্থা কেন?

বুঝতে পারছি এতদিনে বিধাতা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। আমার সামনে ঘোর দুর্দিন।

কী হয়েছে বলবে তো?

মিনসে তোমার মনে পাপ ঢুকেছে। মিনসে তুমি অন্য নারীতে ভজেছ। চলো দেখবে। ভাঙা কুঁড়ে ঝলমল করে বসে আছে সে।

দেবীকে দেখে কালকেতুর চক্ষু চড়কগাছ। এ কোথা থেকে এল? কালকেতু হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কে তুমি? উত্তর নেই। ও তখন অনুনয়ের স্বরে বলে, দেখ আমি ব্যাধ, অতিশয় নিচু জাতি। আমার ঘরের চারদিকে পশুর হাড়। তুমি ব্রাহ্মণী এ ঘরে প্রবেশ করলে স্নান করতে হবে। তোমাকে এখনো বলি, চলো বেলা থাকতে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। ফুল্লরাও সঙ্গে যাবে। আমি তীর-ধনুক সঙ্গে নেব। কেউ কিছু বলতে পারবে না। দেবী তবু কোনো কথা বলে না। কালকেতু বিপদে পড়ে। ও আবার বলে তুমি নিশ্চয় পথ ভুলে হঠাৎ করে আমার এখানে এসে পৌঁছেছ। ব্যাধের কুটিরে তোমাকে মানায় না। তুমি কোথায় রাত্রি কাটাবে? তোমার মোহিনী রূপে আমার লোভ নেই। তোমার সঙ্গে শতেক রাজার ধন। তোমার কী চোর-ডাকাতের ভয় নেই? লাজলজ্জা নেই? তোমার মনে পাপের নেশা ঢুকেছে কেন? তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমার ঘর ছেড়ে চলে যাও।

https://boierhut.com/fb

দেবী তবু অনড়। কালকেতু বিব্রত বোধ করে। ও জোড় হাত করে বলে, একা যুবতী তুমি ঘর ছেড়ে এসেছ। এখন কথার উত্তর দাও না। আমার বিপদ বাড়িও না বলছি। কাছেই গুজরাট রাজ্য। রাজার খপ্পরে পড়লে দুঃখের শেষ থাকবে না। হেনস্তার একশেষ হবে। ভগবানের দোহাই তুমি এ স্থান ত্যাগ করো।

দেবী মিটিমিটি হাসে। সে হাসি দেখে গা জ্বলে যায় কালকেতুর। ও তীর-ধনুক বের করে দেবীকে মারার জন্য তৈরি হয়। কিন্তু বিস্ময়ে লক্ষ করে যেন বাণ ছুড়তে পারছে না। হাতে তীর-ধনুক নিয়ে চিত্রার্পিত হয়ে যায়। ফুল্লরা ছুটে এসে ধনুক কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু কালকেতুর হাতে শরধনু আটকে গেছে। ফুল্লরা তা ছাড়াতে পারে না। দেবীর মায়ায় কালকেতু হতভম্ব হয়েছে। হতবুদ্ধি দম্পতি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তখন দেবী মৃদু স্বরে বলেন, শোনো কালকেতু আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তুমি শরধনু ছেড়ে এই মানিক অঙ্গুরি নাও। এই অঙ্গুরির মূল্য সাতজন নৃপতির ধনের সমান। এই আংটি ভাঙিয়ে বন কেটে তুমি নগর পত্তন করো। সব প্রজাকে ঘর, কড়ি ও চাল দেবে। সবাইকে পুত্রের মতো পালন করবে।

দেবীর কথা শুনে কালকেতু গদগদ হয়ে যায়। এ কি সত্য? নাকি মায়া? ওর বিশ্বাস হতে চায় না। আমার ঘরে কী জন্য পার্বতী আসবে? এই কি সম্ভব? ও তখন করজোড়ে বলে, যে রূপে তোমাকে সবাই আশ্বিনে পূজা করে সেই রূপ ধারণ করলে আমি আশ্বস্ত হতে পারি।

কালকেতুর কথায় দেবী হেসে মহিষমর্দিনী রূপ ধারণ করেন। ডান পা সিংহের ওপর, বাম পা মহিষের পিঠে। বাম হাত দিয়ে মহিষাসুরের চুলের মুঠি ধরে বুকে ত্রিশূল এঁকে দিলেন। বামদিকে কার্তিক, ডানে গণেশ। পাশে সরস্বতী। দেবীর মাথার মুকুট জ্বলজ্বল করে, জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চারদিক। এসব দেখে ব্যাধের ছেলে চোখ বন্ধ করে ফেলে। ভয়ে কাঁপে ঠক ঠক করে। ফুল্লরা মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন দেবী কালকেতুকে আশ্বস্ত করে আবার পূর্বের রূপ ধারণ করেন।

দেবী কালকেতুকে হাতের মানিক অঙ্গুরি দেন। ফুল্লরা কালকেতুকে বাধা দেয়। বলে, এই একটা ক্ষুদ্র আংটি দিয়ে কি হবে? আমাদের দরকার নেই এসবে। অল্প জলে গা ভিজিয়ে লাভ কী?

দেবী বলেন, কালকেতু দ্বিধা করো না। এই অঙ্গুরি নাও। এর মূল্য সহস্র কোটি।

কালকেতু দ্বিধা করে। ফুল্লরাও অনড়। নিতে হলে পাহাড় সমান ধন চাই, যা দিয়ে গোটা দেশ জয় করা যায়। ফুল্লরার ইচ্ছা বুঝতে পেরে দেবী বলেন, ঠিক আছে তোমাদেরকে আরো কিছু ধন দেব। কালকেতু খন্তা-শাবল নিয়ে আমার সঙ্গে চল। বনে মাটির নিচে সাত-ঘড়া ধন লুকানো আছে।

ফুল্লরার আনন্দ ধরে না। ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘরে অপেক্ষা করে। কালকেতু খন্তা-শাবল নিয়ে দেবীর পিছে পিছে বনে আসে। মাটির নিচে সাত-ঘড়া ধন শেকল বাঁধা, দেখে তো কালকেতুর চক্ষু

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

স্থির। দেবীকে পাহারায় রেখে ও এক এক ঘড়া ধন ঘরে রেখে আসে। ফুল্লরা ঘরে বসে সেগুলো সামলায়। ঘড়া টানতে টানতে ও ঘেমে যায়। শেষে দুই ঘড়া দুই কাঁধে নিয়ে দেবীকে বলে, মা এক ঘড়া ধন তুমি বয়ে দাও।

ব্যাধের অস্থির অবস্থা দেখে দেবী তো হেসে আকুল। ওকে সুস্থির করার জন্য নিজে এক ঘড়া ধন কাঁখে তুলে নেয়। ঘড়া নিয়ে আগে আগে হাঁটেন দেবী। কালকেতুর মনে হয়, দেবী ধনের ঘড়া নিয়ে পালিয়ে যাবে না তো? ওর মাথার ঠিক নেই। নিজেকেই আবার প্রশ্নে করে, এমন চিন্তা করা ঠিক হচ্ছে কি? ছিঃ ছিঃ! মা কী ভাববেন? কিন্তু মনের দ্বিধা তাড়াতে পারে না। কালকেতুর মস্তিষ্ক সংকুচিত হয়ে যায়—কোনো যুক্তি ওর মাথাতে আটকে থাকে না। ও ভাবে, সৎলোক খুব কম পাওয়া যায়। দেবী কী তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন? মানুষের সঙ্গে দেবীর এই তুলনা হয়তো ঠিক হচ্ছে না, তবুও ও ভাবে, ও যা ভাবছে সেটাই যুক্তিযুক্ত। এটাই নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হয় না। কালকেতু নিজেকে তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ঊর্ধ্বে ওঠাতে পারে না। কিন্তু বাড়ি এসে দেখে দেবী আগেই এসে গেছেন। ঘরের মেঝে খুঁড়ে সাত ঘড়া ধন রাখার ব্যবস্থা করে দেন তিনি। ব্যাধদম্পতি এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়।

কালকেতু গদগদ স্বরে বলে, আমি নতুন কলিঙ্গ পত্তন করব। নতুন কলিঙ্গ গড়ে তুলব।

দেবী স্মিত হাসিতে ভরিয়ে তোলেন কালকেতুর কুঁড়েঘর। বলেন, হ্যাঁ, তুমি হবে নগর অধিপতি। নগরের মাঝখানে আমার মন্দির গড়বে। আর প্রতি মঙ্গলবার পুজো চাই। অন্যথা যেন হয় না। মনুষ্যকুলে আমার প্রচার চাই। দিকে দিকে আমার কথা ধ্বনিত হবে।

কালকেতু দ্বিধা নিয়ে বলে, কিন্তু মা আমি নীচ ব্যাধ। আমার মন্দিরে পুরোহিত হতে কী কেউ চাইবে?

তাতে ভাবনা কী? তুমি কী আর ব্যাধ থাকবে? জানো না ধন দিয়ে নীচ উত্তম হয়। ধনের মাহাত্ম্যে উবে যায় জাতধর্ম, মান-অপমান। দেখবে দলে দলে লোক তোমার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। উত্তম যে ব্রাহ্মণ সেই এসে তোমার দান গ্রহণ করবে। এখন থেকে তুমি পশু হিংসা ত্যাগ করে সম্ভ্রান্ত জীবনযাপন করো।

দুজনে গড় হয়ে দেবীকে প্রণাম করে।

তুমি আমার প্রশস্তি গেয়ে গীত রচনা করবে কালকেতু।

কালকেতুর চোখ কপালে ওঠে, গীত? মা আমার কী ক্ষমতা?

দেবী হাত তুলে আশীর্বাদ করেন, তুমি জানো না তোমার কত ক্ষমতা।

দেবী নিমেষে অন্তর্হিত হন। কালকেতু আর ফুল্লরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে চিত্তের অস্থির তাড়না নির্বাপণ করে।

ফুল্লু বউ আমাদের আর দুঃখ নেই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমরা এখন থেকে রাজা।

আমাদের থাকবে হাজার হাজার প্রজা।

ফুল্লু বউ এখন থেকে তুমি পাটরানী।

আমি রানী তুমি রাজা, কী মজা!

ফুল্লরা হাততালি দিয়ে মাথা দোলায়।

আমি আজ হেম-থালে ভাত খাব। তুমি দশ ব্যঞ্জন রাঁধো ফুল্লু বউ।

ঘরে যে কিছু নেই?

আমি গোলাহাটে গিয়ে সওদা আনছি।

কালকেতু বেরিয়ে যায়। ফুল্লরা ঝাঁট দিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করে। ওদের ঘরের পেছনে দামে-ঢাকা জলহরি। তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট বাঁধানো। ঘাটের সামনে সামান্য জায়গায় জল টলমল করে। ফুল্লরা বাসনকোসন মাজতে বসে। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক কুক্কুভ উড়ে যায়। সজনে গাছের শাখায় কুরুবক ডাকে। ও টলটলে জলে নিজের ছায়া দেখে। কতদিন নিজের মুখ দেখা হয় না। রানী হলে কেমন দেখাবে ওকে? প্রজারা ধন্য ধন্য করবে তো? কাল থেকে স্নানের আগে কাঁচা হলুদ বেটে গায়ে মাখবে, খড়িমাটি দিয়ে চুল পরিষ্কার করবে। অযত্নে অবহেলায় চোখের নিচ কালো হয়ে গেছে। এখন থেকে রোজ চোখের নিচে কাঁচা আলুর টুকরো ঘষে দেবে। চোখের পাপড়ির ওপর শীতল ভাদালি পাতা বিছিয়ে শুয়ে থাকবে কতক্ষণ। নিম ডাল কাটিয়ে রাখবে। দাঁত মাজার জন্য কষ্ট হয়। এতদিন কেন যে শরীরের দিকে নজর দেয়নি? ফুলের মতো চেহারা না হলে কি পাটরানী হওয়া মানায়? বাসনকোসন নিয়ে উঠে আসার সময় ও একটা কুরুবক ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় পরে। হাত-পায়ের নখগুলো পরিষ্কার করতে হবে, কী যে ময়লা জমেছে। বাসনকোসন রান্নাঘরে রাখে ও। সাদা বেড়ালটা বাচ্চা দুটো নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে নেমে যাচ্ছে। সাদা রঙের বেড়ালটার বাচ্চাগুলো কালো, ছোট ছোট পায়ে উঠোন পেরিয়ে যায়। বেড়ালের ম্যাঁও ধ্বনিতে চমকে ওঠে ফুল্লরা।

কালকেতুর আসতে হয়তো দেরি হবে। ও পুরনো জিনিসপত্র রাখার ঝুড়িটা ঘেঁটে ছোট্ট আয়নাটা বের করে। আয়না-চিরুনি নিয়ে বারান্দায় বসে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়। অযত্নে কপালের ওপর থেকে অনেক চুল উঠে গেছে। কেন নিজের যত্ন নেয়নি ভেবে দুঃখে ফুল্লরার হৃদয় মথিত হয়। এখনই সময় নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার। প্রজারা যদি মুগ্ধ চোখে রানীর দিকে তাকিয়ে না থাকল তো রানীর মর্যাদা কি থাকে? আয়না কাঁকই তোরঙ্গে উঠিয়ে রেখে ও আঙিনায় ঘুরে বেড়ায় রূপচর্চার উপকরণগুলো জোগাড় করার চিন্তা করার সময় ওর অলংকারের কথাও মনে হয়। অনেক অলংকার চাই, অলংকার ছাড়া কি রানীকে মানায়। চন্দ্রহার, বাউলি, কেয়ূর, মল,

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মুকুট, অঙ্গুরি, কঙ্কন চাই। ভাবতে ভাবতে ওর মাথা গরম হয়ে ওঠে। নিজের দিকে ফিরে চাইবার সময় এখন। আর অবহেলা নয়, নিজের পাওনা ষোলআনা বুঝতে হবে।

দশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমুতে যায় ওরা। আজই প্রথম নোংরা কাঁথা-বালিশের দুর্গন্ধ কালকেতুর কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। অনাগত দিনের স্বপ্নে ঘুম আসতে চায় না ওদের।

ফুল্লু বউ বালিশ থেকে গন্ধ পাই, কাচো না কেন?

আর কেচে কী হবে? এগুলো তো ফেলে দেব।

ঠিক! এখন আমাদের চন্দন কাঠের পালঙ্ক হবে।

চন্দনের গন্ধে আমরা ঘুমুব। আমাদের আর কী হবে?

আমি জানি না, আমি বুঝতে পারি না ফুল্লু বউ।

কালকেতু ফুল্লরাকে জড়িয়ে ধরে। বেড়ার ওপাশ থেকে শুয়োরগুলো ঘোঁতঘোঁত করে ওঠে। ফুল্লরা অন্ধকারে মাথা ওঠায়, শুয়োরগুলোর থাকার ভালো ব্যবস্থা করা চাই।

করতেই হবে। ওগুলোই তো আমার শক্তি।

ঘরে কাজ করার জন্য লোক চাই। আমি আর কোনো কাজ করব না।

তাই হবে। কিন্তু ফুল্লু বউ হাড়গোড় ভরা শ্মশানের মতো এই বাড়ি ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে। ব্যাধের বাড়ি এমনই তো হয়।

ফুল্লরা ফোঁস করে ওঠে, ব্যাধ কী? এখন থেকে তো তুমি নগর অধিপতি। তুমি রাজার মতো কথা বল।

বেড়ার পাশ থেকে শুয়োরজোড়া ঘোঁত করে উঠলে কালকেতুর মনে হয়, ঠিক, রাজার মতো কথা বলা উচিত। স্বভাব বদলাতে হবে। ভুলতে হবে ব্যাধের কথা। শেষ রাতের দিকে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসার আগে ও ভাবে, সবই দেবীর ইচ্ছে।

আজ এই মুহূর্তে নিজেকে করুণা করে ফুল্লরা। দেবীর সামনে কেমন অবলীলায় নিজের বারমাসের দুঃখের কথা বর্ণনা করেছিল। সেদিন ওর মানসম্মানের কথা মনে হয়নি। পরিস্থিতি সামলানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। আজ একটা কথা বলতে ওকে অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হয়। কথার কী প্রতিক্রিয়া হবে সেটা বুঝতে হয়। কালকেতুর কথা চিন্তা করতে হয়। কালকেতুর আজকের যে অবস্থা তার জন্য কি কালকেতু একাই চেষ্টা করেছে? ফুল্লরার নিজের কোনো অবদান নেই? সেদিন যদি আংটি নেওয়ার ব্যাপারে ও অমন অনড় হয়ে না থাকত তা হলে কি দেবী আরো সাত ঘড়া ধন দিতেন? কিন্তু কালকেতু কোনোদিন তা স্বীকার করে না। ও এমনই। একচুল কৃতিত্বও অবলীলায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়। আর তুলে নিতে পারলে একদমই স্বীকার করে না। সে অংশ চেপে যায়, যেন কোনো একটা অসাধারণ কৃতিত্ব বাতাসনির্ভর করে হয়ে গেছে। কালকেতু এমনই। ওর চামড়া পুরু, আঁচড় পড়ে না, সেজন্য কোনোকিছু ওর বাধে না। যে পুরুষমানুষ সন্তান

https://boierhut.com/fb

দিতে পারে না তার আবার এত অহংকার কিসের? ওর সঙ্গে তো পঁচিশ বছর ঘর করা হল। আর কত? এখন আমি সন্তান চাই। একজন পরিপূর্ণ নারী হতে চাই।

ফুল্লরা উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসে। এখন মধ্যরাত। কালকেতু ফেরেনি। ওর জরুরি কাজ আছে। নেহাতই জৈবিক তাড়নায় নয়, একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় ফুল্লরা সঙ্গমের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেউ আমার সন্তানের পিতা হোক। আমি একজন সক্ষম পুরুষ মানুষের সঙ্গে মিলতে চাই। ফুল্লরা বালিশ বুকে চেপে ধরে। ওর কান্না পাচ্ছে। ও আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। মেকআপহীন মুখটা ওর কাছে কুৎসিত মনে হয়। বয়সের ছাপ পড়ে গেছে। চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখের নিচটা পুরু হয়ে উঠছে। দিনের বেলা মেকআপের আড়ালে এসব চোখে পড়ে না। এখন এই মধ্যরাতে নিজের দিকে তাকিয়ে ফুল্লরা শিউরে ওঠে। এখন কি সময় আছে সন্তান ধারণের? ও দুহাতে মুখ ঢাকে। কোনো মানেই হয়নি জীবনের পঁচিশটি বছর এমন বন্ধ্যা কাটিয়ে দেওয়ার। কালকেতুর অগোচরে আমি তো আর কাউকে আহ্বান জানাতে পারতাম। কালকেতু যদি নিজের স্বার্থের জন্য যে কোনো কাজ করতে পারে তা হলে আমি পারব না কেন? কেন আমি কালকেতুকে ছাড়াই একজন নারী হতে পারব না? আস্তে আস্তে ওর চেহারায় দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। ও ঘরসংলগ্ন ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরে আসে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে শেয়াল ডাকছে। এই নগরীতে শেয়ালের উৎপাত বেশি। কখনো রাজপ্রাসাদের কাছে চলে আসে। ফুল্লরা লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছে যে ও কোনো শেয়ালের ডাক শুনতে চায় না। কিন্তু হাজার শেয়াল তাড়ানো যায় না। ফাঁকেফোকরে অবলীলায় ঢুকে পড়ে। এখন ওর মনে হয় ওর বুকের ভেতরেও একটা শেয়াল ঢুকে পড়েছে। ও রেলিঙের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ে।

কাকে আমি চাই আমার সন্তানের পিতা হিসেবে? অসংখ্য মুখ ভেসে ওঠে। কত স্তাবক ওর চারপাশে। কারো দৃষ্টিতে মুগ্ধতা, কারো দৃষ্টিতে কামনা, কারো চকচকে দৃষ্টিতে স্বার্থ উদ্ধারের ছলনা। ফুল্লরা যে একদম এসব বুঝতে পারে না তা নয়। ওর বুক ঠেলে নিশ্বাস আসে। এমন কেউ কী নেই যে সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে ওকে ভালোবাসে? না, এই চারপাশের মানুষেরা কেউ ওকে ভালোবাসত। যে নিজের নামের সঙ্গে ওর নাম যুক্ত করে ওকে ডাকত, ফুল্লর-চন্দর। ও এখন এখন নামকরা লেখক। ফুল্লরা কখনো সেসব বই পড়ে দেখেনি। টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে ওকে দেখা যায়। টেলিভিশনে ওর নাটক হয়, কাগজে ওর ছবি ছাপা হয়। ও দারুণ জনপ্রিয়, এক নামে সবাই ওকে চেনে। এই মানুষটি ফুল্লরাকে ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিল। বলত, তোমাকে না পেলে আমি মরে যাব ফুল্লর-চন্দর। কিন্তু কই চন্দরের তো কিছু হয়নি, ও তো দিব্যি আছে। এই সমাজের অনেকের চাইতে দিব্যি ভালো আছে। ও কি খুব অবাক হবে ফুল্লরার ডাক পেয়ে? হ্যাঁ হবে। ফুল্লরা মনে মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। চন্দরকে উপেক্ষা করার পর থেকে গত পঁচিশ বছরে ওর সঙ্গে ফুল্লরার কোনো যোগাযোগ হয়নি। এমনকি চোখের দেখাও হয়নি। এখন কি চন্দর সাহস করবে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফুল্লরার ডাক উপেক্ষা করার? অসম্ভব হতেই পারে না। চন্দর না এলে এবং ওর কথা না শুনলে ও চন্দরের জীবন ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে, তুলোর মতো উড়ে যাবে ওর সাজানো সংসার। ফুল্লরার মরাল গ্রীবায় অহংকারের ঢেউ ওঠে। ওর সামনে থেকে অন্ধকার মুছে যায় এবং শেয়ালের ডাক শুনতে পায় না। লঘু পায়ে ঘরে ফিরে আসে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘুম পায়। ও বিছানায় এলিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড সুইচ টিপে নীল আলো জ্বালিয়ে দেয়। ভেলভেটের গাঢ় নীল পর্দায় ঘরটা উজ্জ্বল স্বপ্নপুরী হয়ে যায়। চন্দরের সঙ্গে ফুল্লরা সেই স্বপ্নপুরীতে প্রবেশ করে।

দুদিন পর চন্দনের সঙ্গে ওর দেখা হয়। চন্দরের দুচোখে বিস্ময়, নিজেকে গম্ভীর, সংযত রাখার চেষ্টা করে। ধরে নিয়েছে ফুল্লরা কোনো একটা ছলনার জাল পেতেছে, কিন্তু সেটা কী তা বুঝতে পারে না। ফুল্লরা সহজ ভঙ্গিতে ওর কাছে এসে বসে।

কেমন আছ চন্দর?

ভালো। আপনি ভালো তো?

আমাকে তুমি আপনি করে বলছ?

সেটাই তো স্বাভাবিক। আপনি এখন পরস্ত্রী এবং নগরের প্রথম মহিলা।

দোহাই লাগে তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো চন্দর।

চন্দর চুপ করে থাকে।

পঁচিশ বছর আগে আপনি আমাকে বোঝেননি।

পেছনের কথা থাক চন্দর।

অবশ্য আপনি আমাকে বুঝলে আজকে আপনার এই জৌলুসের জীবনযাপন করা হতো না।

ফুল্লরা অনুনয়ে ভেঙে পড়ে। ওর চোখে জল। চন্দর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে মৃদুস্বরে বলে, তোমার চোখের জল দেখতে কী আমি এখানে এসেছি ফুল্লর-চন্দর? মুহূর্তে ফুল্লরার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বলে, আমি জানতাম তুমি আমাকে এখনো ভালোবাস।

চন্দর নিশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, ঠিকই জানো। এই ভালোবাসা এত নিঃশব্দ যে পৃথিবীর কাউকে শেয়ার করা যায় না।

ফুল্লরা চন্দরের হাত নিজের মুঠিতে তুলে নেয়। তারপর গায়ে ঘষে বলে, ভাবতে ভালো লাগছে যে এই নগরীতে অন্তত একজন কেউ আছে যে আমাকে ভালোবাসে।

চন্দর আনমনা হয়ে বলে, তোমার বিয়ের পর অসংখ্য দিন আমি বোকার মতো তোমাদের বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তুমি ঐ বাড়িতে নেই জেনেশুনেও আমি নিজেকে ঠেকাতে পারতাম না। মনে হত আমাকে যেন নিশিতে পেয়েছে।

ফুল্লরা মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অনেকদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি ঠিকমতো খেতে পারতাম না, ঘুমুতে পারতাম না। কেন তুমি আমাকে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিলে? কেন তুমি আমার হলে না?

তোমার এই ভালোবাসার কথা আমাকে রূপকথার জগতে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের হৃদয়ে কী তোমার মতো সমুদ্রসমান ভালোবাসা থাকে?

আহ্ ফুল্লরা, যদি জানতে সেইসব দিনগুলোতে আমি কেমন পুড়েছিলাম! যদি জানতে কী কষ্ট দিয়েছি নিজের শরীরকে। অত অজস্র কবিতা লিখেছি আর ছিঁড়েছি। সত্যি, আমি তোমাকে বুঝিনি। ফুল্লরা মাথা নিচু করে বলে।

তুমি কী আমার উপন্যাস পড়েছ?

না, পড়ার সময় পাই না। কত কাজে যে জড়িয়ে গিয়েছি।

পড়লে দেখতে এই হৃদয়-দহন করা প্রেমের কারণেই আমার প্রেমের উপন্যাসগুলো এত জনপ্রিয়।

ওহ্ চন্দর তুমি আর বলো না। আমি সইতে পারছি না। এরপরও আমি তোমাকে ভুলতে চেয়েছি। আমি তোমার কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছি।

মুক্তি তো তুমি পাওনি চন্দর। নিজেই বলেছ যে প্রেমের উপন্যাসগুলো—

থাক এসব কথা। বল কেন ডেকেছ?

তোমার কাছে আমার একটি জিনিস চাইবার আছে। বলো দেবে?

আমি তোমাকে কী দেব? এই নগরের সবকিছুই তো তোমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলেই পেয়ে যাও।

না চন্দর, না। সব পাওয়া আমার হয়নি। তুমি আমাকে কথা দাও যে দেবে।

আগে শুনি কী?

আমি জানি তুমি ইচ্ছে করলেই পার? দাও, আমাকে কথা দাও, তোমার ভালোবাসার দোহাই।

আহ্ এমন করে বলো না! ঠিক আছে কথা দিলাম।

তুমি আমাকে একটি সন্তান দাও চন্দর।

চন্দর সোফা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। সমস্ত শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি। ওর জিহ্বা আড়ষ্ট। বুকের ভেতর থেকে প্রবল গর্জনে চিৎকার উঠে আসতে চায়। দুচোখে আতঙ্ক ছড়িয়ে বলে, এসব তুমি কী বলছ ফুল্লর-চন্দর? ঘরে আমার স্ত্রী-পুত্র আছে।

ফুল্লরা ওর হাত জড়িয়ে ধরে, তা হলে তো তুমি একজন পরিপূর্ণ পুরুষ। আমিও একজন পরিপূর্ণ নারী হতে চাই চন্দর।

না, না, এ কী করে হয়।

ফুল্লরার জলভরা চোখে প্রবল মিনতি, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ।

https://boierhut.com/fb

চন্দর বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কে এই নারী? কেন তার এই মিনতি? যে ফুল্লরাকে ও চিনত এ তো সেই ফুল্লরা নয়। ও কার সামনে দাঁড়িয়ে আছে? এই নারীকে কি ও চেনে?

কী ভাবছ চন্দর? ভাবছ কেন আমি তোমাকে ডেকেছি? কারণ তুমি আমাকে ভালোবাস। আমি একটি ভালোবাসার সন্তান চাই।

তোমার তো সন্তানের প্রয়োজন। ভালোবাসার সন্তান দিয়ে কী হবে?

ফুল্লরা চুপ করে থাকে। পুরুষ মানুষকে কী বোঝানো যায় যে নারী সন্তান দিয়ে কী করে?

চন্দর তখন চাপা কণ্ঠে বলে, জানি কেন তুমি সন্তান চাও। কারণ মা হয়ে তুমি তোমার ক্ষমতা দেখাতে চাও। তুমি এই নগরীতে একজন জননীর অহংকারী পদক্ষেপ ফেলতে চাও।

তুমি যেভাবেই বোঝ আমার আপত্তি নেই।

ফুল্লরা পুরো আত্মসমর্পণ করে আছে।

সামাজিকভাবে তোমার সন্তানের পিতা হবে কে?

ফুল্লরা একটু থমকে থেকে বলে, কালকেতু।

অর্থাৎ এই নগরীর প্রতিটি ক্ষেত্র তোমরা গ্রাস করতে চাও। কোনোটিই তোমরা বাদ দেবে না।

আহ্ চন্দর তুমি কেন এত সমালোচনামুখর। তুমি আমাকে কথা দিয়েছ। যৌবনে তুমি বলতে তুমি কথা দিলে তোমার কথার বরখেলাপ করো না। এই একটি ক্ষেত্রে তোমার সততা আমি বুকভরে বিশ্বাস করি।

চন্দর সোফায় মাথা হেলিয়ে দেয়। ওর শরীর কাঁপে। ফুল্লরা? ওর হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলেই ও এই নগরীর প্রথম নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। কিন্তু না? ঘরে আমার অঞ্জলি। তাকে কি ফাঁকি দেব?

কিছু বলছ না যে?

চন্দর চোখ বুজেই থাকে। কী বলবে?

ফুল্লরা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, তুমি ভয় পেয়ো না চন্দর। কালকেতু জানতেই পারবে না যে আমি কার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি।

আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি নিজেকে ঘৃণা করছি। কারণ শুধু কাপুরুষেরাই নিজের সন্তানকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

না, তুমি চাপিয়ে দিচ্ছ না। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি। তার ওপর তোমার কোনো অধিকার থাকবে না।

বললেই কী তুমি আমার পিতৃত্বকে অস্বীকার করতে পারবে?

আমি অস্বীকার করব না। শুধু আমি চাই না যে তুমি অধিকার নিয়ে দাবি করবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চন্দর নির্নিমেষ ফুল্লরাকে দেখে। বুঝে যায় যে ও সব দিক চিন্তা করেই এগিয়েছে। ওর যুক্তিতে ফাঁক নেই। নগরের জনসভায় ফুল্লরাকে যেমন দেখায় ও এখন তেমন নয়। ও ভিন্ন নারী। ওর মধ্যে কমনীয়তা আছে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় আত্মসমর্পণের বিনীতভাব আছে। ও কি জানে জনসভায় ওকে দেখলে কেউ কেউ মন্তব্য করে, আস্ত ডাইনি বলে। ম্যাকবেথের তিন ডাইনির একটি। না, এমন কথা ওর সামনে বলার কারো সাহস নেই। এই মুহূর্তে ওর নিজেরও ইচ্ছা নেই ফুল্লরাকে কঠিন আঘাত দেবার। মানুষের চোখে ও ডাইনি হোক কিংবা কৃত্রিম বা খল নারী হিসেবে চিত্রিত হোক, সেটাই ফুল্লরা নয়, যে ফুল্লরাকে ও ভালোবাসত সে এখন ওর সামনে নতজানু। প্রবল এক তৃষ্ণা নিয়ে ও এখন ওর সামনে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দরের মাথার মধ্যে বিদ্যুতের আনাগোনা, কখনো আকাশ ফুঁড়ে চিরে যায় আলোর রেখা, কখনো প্রচণ্ড গর্জন, বাজ ফেলে পুড়িয়ে দেয় ভাবনাগুলো। ও ভাবতে থাকে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ফুল্লরার কতটুকু সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা। নাকি দর্পিত নারীর এ এক ক্ষমতার খেলা।

এমন করে তাকিয়ে আছ কেন? কী দেখছ?

তোমাকে, শুধু তোমাকে।

ফুল্লরা চন্দরের হাত তুলে চুমু খায়। চন্দর দুহাতে ওর মুখ তুলে ধরে। বলে, সত্যি করে বলো দেখি তুমি কতটুকু মা হতে চাও। নাকি সবটাই তোমার ক্ষমতার দর্প?

ফুল্লরা ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, সবার মতো তুমিও আমাকে ভুল বোঝ চন্দর। এই নগরীর কাউকে তো আমি আমার হৃদয় খুলে দেখাতে পারি না। জানবে না কেউ কীভাবে বুকটা আমার ঝাঁজরা হয়ে আছে।

কথা বলতে গিয়ে ফুল্লরার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। যৌবনে এমন করে দেবীর কাছে নিজের বারোমাসীর কথা বলেছিল। সেই দুঃখের দিন তো এখন ওর নেই। তবু কেন আর একটি মানুষকে এমন করে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে হচ্ছে? বারবার অন্যের কাছে ভিক্ষা চাওয়া কী ওর নিয়তি?

চন্দর বলো তুমি তোমার কথা রাখবে?

রাখব, ফুল্লর-চন্দর আমি আমার কথা রাখব।

আহ্! অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসে ফুল্লরার কণ্ঠ থেকে, আজই, এক্ষুনি।

আমাকে দুটো দিন সময় দাও।

আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলে ফুল্লরা। চন্দরের কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে ওর ভালোই লাগে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তখন ফুলেল শয্যায় কালকেতু তার রমণ-ক্রীড়া সম্পন্ন করে। এ নারী নগরীর সেরা সুন্দরীদের একজন। তার আকর্ষণীয় দেহবল্লরীতে মায়াহরিণের জাদু আছে। বনে বনে ছুটলেও ক্লান্তি আসে না। কালকেতু আরামে চোখ বুজে থাকে। আজ ওর অখণ্ড অবসর। মাঝে মাঝে একদিনের জন্য ও সবার কাছ থেকে পালিয়ে তাকে। নিজেকে আনন্দে মাতিয়ে রাখে। এটুকু না করলে নগরীর গুরুদায়িত্ব পালন করতে ঢিলেমি আসে। ইন্দ্রিয়গুলো নেতিয়ে আসতে চায়। ও বোঝে ইন্দ্রিয় নেতিয়ে গেলে সমূহ বিপদ। ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে বলেই তো ক্ষমতায় টিকে থাকা, নইলে কবেই তো ফানুস হয়ে যেত। চারদিকে ষড়যন্ত্র। নগরের চারদিকে ওর জাল ছড়ানো আছে। মুহূর্তে সব খবর ওর কাছে চলে আসে। ষড়যন্ত্র করবে কারা? তীরন্দাজ বাহিনীকে ও ননী-মাখন দিয়ে পুষছে। বাকিদেরও তোয়াক্কা করে না। এই তোয়াক্কা না করার জন্য ও ওর প্রতিটি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ রাখে।

কালকেতুর হাসি পায়। এই নগরের মানুষের নাড়ি-নক্ষত্র ও চেনে। জানে এদের লোভ, চেনে এদের ঈর্ষা, দেখতে পায় এদের চাটুকারিতা। সবাই তো নিজ নিজ স্বার্থের কথা বলে। যতক্ষণ মানুষ নিজেদের স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত থাকবে ততক্ষণ ওর কোনো ভয় নেই। তবু ও একচক্ষু হরিণের মতো বিপদকে এড়িয়ে থাকতে চায় না। ওর দৃষ্টি সর্বত্রগামী। সবার দিকেই ওর সমান নজর। সে নারী হোক, যুবক হোক, কিংবা বৃদ্ধ হোক। এই যে নারী একটু আগে ওর বিছানা থেকে উঠে গেল সে এই নগরের একজন সম্মানিত লোকের স্ত্রী। কিন্তু ও ডাকলে না এসে তো পারে না। কেন পারে না? ওর হাতে ম্যাজিক আছে। কালকেতু আত্মগৌরবে, অহংকারে বিছানায় দ্রবীভূত হয়ে যায়। ও চিত হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকালে দেখতে পায় অসংখ্য মানুষের মুখ।

দেবীর কাছ থেকে ধন পাওয়ার খবর রাষ্ট্র হয়ে গেলে চারদিক থেকে লোক এসে ভেঙে পড়ে ওর বাড়িতে। মুটে মজুর থেকে টোলের পণ্ডিত পর্যন্ত সবাই, কেউ বাদ নেই। কালকেতু নগর পত্তন করবে, দশ-বিশ বছরে যেরকম নগরের কথা কেউ কখনো চিন্তা করতে পারেনি তেমন নগর। কৌতূহলের শেষ নেই। মুখে মুখে খবর উড়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়—গুজব রটে হাজার হাজার। কালকেতুর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন বাতাসের বেগে ধায়।

গোলাহাটে তুমুল বিতর্ক জমে ওঠে।

কালকেতু দেবীর বরপুত্র। ওর মতো মানুষ হয় না।

শরতের এই নির্লজ্জ দুর্মুখী আচরণে জ্বলে ওঠে পীতাম্বরের শরীর। চেঁচিয়ে বলে, আপনি না সেদিন বললেন, কালকেতু ব্যাধ, নীচ জাত। ওর চেয়ে ঘৃণ্য মানুষ আর নেই। এক মুখে কয় রকম কথা বলবেন আপনি?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলেছি তো কী হয়েছে? সেটা বুঝি আর শোধরাবার নয়? এ কথা কে না জানে ধনের কাছে জাতিভেদ নেই। ধনই বড়লোক ছোটলোক নির্ণয় করে। তোমাদের বাপু পেটের মধ্যে প্যাঁচ। অপরের ভালো দেখতে পার না।

পীতাম্বর চেঁচিয়ে বলে, আসলে আমরা আপনার মতো সুবিধে বুঝে কথা বলি না। আমরা যদি কালকেতুকে আগে ঘৃণা করে থাকি তো এখনো করব।

শরত নির্লজ্জের মতো হাসে, চিরকালই তোমরা মাথা গরম করলে। ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবলে না। এ জন্য তোমাদের কিছু হবে না।

একে চরিত্র নষ্ট বলছ কেন? এটা বুদ্ধির কৌশল। এটা হলো বুদ্ধি এবং মেধাকে কাজে লাগানো। যে পারে সে উঠে যায়, যে পারে না সে পড়ে থাকে।

পীতাম্বর রেগে উঠে আসে, ছিঃ আপনার সাথে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

শরত হে-হে করে হাসে। আর একজনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, ছেলেমানুষ, সব ছেলেমানুষ। বুঝলে ভজহরি আমি জানি কালকেতুর সভাসদে আমি সভ্য হতে পারব। আমার কূটবুদ্ধির জন্যই ও আমাকে ডেকে নেবে।

মুখভরা আত্মতৃপ্তির হাসিতে শরত সবার মন জয় করতে চায়। অনেকে মাথা নেড়ে সায় দেয়। রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে আসে পীতাম্বর।

পথে মাস্টারমশায় তর্কালঙ্কারের সঙ্গে দেখা হয়।

তিনি ওর পথ আটকান, কী ব্যাপার! এভাবে কোথায় যাচ্ছিস? কালকেতুর বাড়িতে?

কেন? ওখানে কেন যাব?

বাহ্! গাঁয়ের সব লোক ওখানে যাচ্ছে আর তুই যাবি না?

পীতাম্বর চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকে। এতদিনের চেনা মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে এটা আশা করেনি। মাস্টারমশায় তৃপ্তির হাসি হেসে বলে, আমি তো ওখান থেকে এলাম।

পীতাম্বরের বিস্ময়ের সীমা থাকে না, আপনিও গিয়েছিলেন?

বাহ্ যাব না কেন? দেশে একটা সোনার ছেলে হয়েছে। আমাদের উচিত ওকে সহযোগিতা করা।

পীতাম্বর মনে মনে অসম্ভব দমে যায়। এতদিনের চেনা এ গাঁয়ের মানুষগুলোর বুকের ভেতর এমন সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল কোনোদিন ভাবেনি। এখন সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। সুযোগ পেলে এমন করে কী ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়? মানুষের হুমড়ি খেয়ে পড়া এবং এই প্রতিযোগিতা ওকে আহত করে। ও মরমে মরে যায়।

তর্কালঙ্কার প্রবল উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, যা দেখে আয় কালকেতুর চেহারায় কেমন জ্যোতি খেলছে। ওর বাড়িতে জুঁই ফুলের গন্ধ ম-ম করছে।

ওটা তো একটা হাড়গোড়ের শ্মশান। ব্যাধের বাড়িতে জুঁই ফুল কোথা থেকে আসবে?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সবই তার ইচ্ছা।

তর্কালঙ্কার ওপরে হাতজোড় করে মাথা নিচু করে। বিড়বিড়িয়ে ভগবানের স্মরণ করে।

পীতাম্বর বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে থাকে। শরত যখন বিগলিত হয় তখন সে সুবিধাবাদের সীমা বোঝে, কিন্তু তর্কালঙ্কার তো পণ্ডিত, সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। তার কী জ্যোতি দেখা আর জুঁই ফুলের গন্ধ পাওয়া শোভা পায়? কী হবে এ নগরের?

আপনার সঙ্গে কালকেতুর কী কথা হলো?

ও বলেছে ওকে আমার দরকার হবে। নগর চালানোর জন্য যে পরিষদ করবে সেখানে আমাকে সদস্য করবে।

আপনি যাবেন?

কেন যাব না? আমাকে দিয়ে যদি নগরের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি হয় তা হলে আমি কেন সে দায়িত্ব পালন করব না? আমি তো মনে মনে ঠিক করেছি কী কী পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

কিন্তু এ কাজ তো আপনার নয়। এ কাজ যারা পরিকল্পনা করবে তাদের দায়িত্ব। সবাই চাইবে আপনার মতো পণ্ডিত টোলেই থাকুন। নইলে টোল দেখবে কে? ছাত্রদের জ্ঞানদান করবে কে?

তার জন্য অন্য পণ্ডিত আছেন। তারা টোল চালাবেন।

কিন্তু আপনি তো এই নগরের জন্য উত্তম প্রজা তৈরি করতে পারেন?

তুই একটা বোকা ছেলে। জানিসই তো জীবন আর কদিনের? কদিনই বা বাঁচব? রাজসভার পার্ষদ হয়ে যদি মরতে পারি, আহ্! আমার মতো ভাগ্যবান আর কেইবা হবে!

পীতাম্বর মরিয়া হয়ে বলে, কিন্তু কালকেতু একটা আকাট মূর্খ। অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই।

রেগে যায় তর্কালঙ্কার। পারলে ছাতা দিয়ে দুঘা লাগিয়ে দেয় এমন অবস্থা। বলে, আজকালকার ছেলেরা বেশি তর্ক করিস। না বুঝে তর্ক করা তোদের অভ্যেস হয়েছে।

পীতাম্বর তবু জোর করে বলে, ঐ মূর্খের অধীনে আপনি গেলে সেটা সবার অপমান। নগরের অধিপতি হয়ে কি সবাইকে কিনে ফেলতে চায় কালকেতু?

বেয়াদব ছেলে!

তর্কালঙ্কার রাগে কাঁপতে থাকে। রক্তচক্ষু মেলে ওর আপাদমস্তক দেখে হনহনিয়ে হেঁটে যায়। রাগে-দুঃখে পীতাম্বরের চোখে জল আসে। একজন বৃদ্ধ, ষাটের ওপরে যার বয়স, তার এই আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত হয়ে ও গাছতলায় বসে থাকে। ওকে দেখে বুলন মণ্ডল ওর পাশে এসে বসে। এখানে বসে আছ যে পীতাম্বর?

এমনি।

যাওনি কালকেতুর বাড়ি?

না।

https://boierhut.com/fb

আমি ওখান থেকে এলাম।

কী দেখলেন?

দেশে একজন মানুষের মতো মানুষ হল।

আপনি না বলতেন কালকেতু ব্যাধ, ওর হাতে অস্ত্র। ও প্রাণী হত্যা করে। আপনি ওকে ঘৃণা করেন।

বুলন মণ্ডল ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলে, চুপ, চুপ। এতদিন যা বলেছি তা কাউকে বলো না। আমার সর্বনাশ করো না।

আপনার আবার কিসের সর্বনাশ?

আহা ও এখন নগরের অধিপতি। ওর হাতে সব ক্ষমতা। ও যা খুশি তা করতে পারে। আপনি কি পরিষদের পার্ষদ হতে চান? হে-হে অত যোগ্যতা কী আমার আছে? আমি ছোটখাটো একটা কিছু হতে পারলেই হয়। আপনি নিরামিষভোজী ব্রাহ্মণ। ওর সঙ্গে কী আপনার ওঠাবসা চলে? না কি শোভা পায়?

বুলন মণ্ডল রেগে ওঠে, তুমি বড্ড বেশি কথা বলো পীতাম্বর।

এতক্ষণে পীতাম্বর হা-হা করে হেসে ওঠে।

ঠিকই বলেছেন, আমার একটু বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে। কালকেতুর সঙ্গে আপনার কী কথা হলো?

এত ভিড় যে কথা বলার সুযোগ পাইনি। ও আমাকে বলেছে পরে কথা হবে।

এতে আপনি বিগলিত হয়ে গেলেন?

তা তো হবই, ও কী এখন আর যে সে লোক। তুমি যাও না ঘুরে এসো ওর বাড়ি থেকে। এখন হয়তো একটু ভিড় কমতে পারে। যাই, চান করে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিই। সন্ধ্যায় আবার ওর বাড়িতে যাব। বোঝ না কেন এতদিন যা বলেছি তা সব মুছে দেব। এখন একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা দরকার।

পীতাম্বরের এখন আর দুঃখ হয় না। ও বুলন মণ্ডলের মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসে।

তুমি কি খুব ফুর্তিতে আছ পীতাম্বর?

হ্যাঁ, তা আছি বলতে পারেন।

হাসিটা কেমন জানি অন্যরকম লাগছে?

ও কিছু না, এটা আমার স্বভাব। হাসতে হাসতে কাঁদি, কাঁদতে কাঁদতে হাসি। বাপ-মা নেই, এতিম ছেলে তো এজন্য এমন হয়।

বুলন মণ্ডল ছুঁচোলো দৃষ্টি ফেলে ওর মুখের ওপর কিছু বুঝতে না পেরে বাড়ির পথে চলে যায়। পীতাম্বর খররোদ মাথায় করে কালকেতুর বাড়িতে আসে। ও বারান্দায় জোড়াসন করে হরিণের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চামড়ার ওপর বসে আছে। কানে মতির কর্ণাভরণ, গলায় মালা, পরিপাটি চুল আঁচড়ানো, প্রশান্ত চেহারা। কোনো চাঞ্চল্য নেই, গায়ে জরির জামা, পরনে মিহি কাপড়ের ধুতি। ওর সামনে ফুলের স্তূপ, রাশি রাশি পান-গুয়া, হাজার রকমের ভেট ভক্তরা নিয়ে এসেছে, ওকে রাজার মতোই লাগছে। পীতাম্বর উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু না, অনেক চেষ্টা করেও ও জুঁই ফুলের গন্ধ পায় না। বরং শুয়োর দুটোর গা থেকে বিটকেলে গন্ধ আসছে। ওর মনে হয় ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। লোকজন ঠেলাঠেলি করছে। ভিড়ের গুঁতো, মানুষের শরীরে ঘামের গন্ধ, শুয়োরের ঘোঁতঘোঁতানি মিলিয়ে ও দিশেহারা হয়ে যায়। লোকজনের উচ্ছ্বাসের শেষ নেই। কালকেতুর কাছে পৌঁছুনোর জন্য ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এ অবস্থা দেখতে এসেছিল ও? এখন মনে হয় পালাতে পারলে বাঁচে।

ভিড় বাঁচিয়ে ও নিরাপদ দূরত্বে এক কোনায় এসে দাঁড়ায়। পাশে অবনি, ওর বন্ধু। পেছনে নিশিকান্ত, ওর মাস্টারমশায়। নিশিকান্তকে দেখে ও সম্ভ্রমে জায়গা ছেড়ে দেয়।

পেছনে কেন মাস্টারমশায়! আপনি সামনে যান।

সামনে যাবার আর দরকার নেই। অবস্থা দেখতে এসেছিলাম, দেখা আমার হয়ে গেছে। এই অবস্থা চললে ছেলেটা কোনো কাজ করতে পারবে না। নগরই হবে, আর কিছু না।

নিশিকান্ত চলে যায়। ওর পায়ে জুতো নেই, বগলে ছাতা। জামা ছিঁড়ে এসেছে, পিঠ বাঁকানো। হাতে ভূর্জপত্র নিয়ে ও যায় শিক্ষার্থীদের কাছে।

পীতাম্বর পিছে সরে আসে। ও আরো নিরাপদে দূরত্বে এসেছে। অবনিও সঙ্গে আছে। ওরা প্রায় শুয়োরগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায়। কালকেতুর সঙ্গে থেকে ওগুলোর শরীরে চিকনাই বেড়েছে। থলথলে মাংসল শরীরে পুরু চামড়া। সহজে এই চামড়ায় আঁচড় লাগে না। ওদের পা ক্ষুদ্রকায়, ওরা একজনের পাশেই ঘুরঘুর করে। দীর্ঘ পদক্ষেপে ওরা দূর-দূরান্ত অতিক্রম করতে পারে না। ওগুলোর মুখ ছুঁচোলো, যেখানে-সেখানে সে মুখ ঢুকিয়ে দিতে ওগুলোর লজ্জা করে না।

পীতাম্বর অবনির হাতে চাপ দেয়, যাবি?

দাঁড়া, একটা জিনিস দেখছি। ও মৃদু কণ্ঠে বলে।

কী?

তুই দেখতে পাচ্ছিস না?

আমি তো এতক্ষণ শুয়োর দেখছিলাম।

অবনি বিস্ময়ে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমিও দেখছিলাম। দেখ কালকেতুর পায়ে গড় হয়ে যারা প্রণাম করছে ওদের মুখগুলো অবিকল এই জন্তুগুলোর মতো দেখাচ্ছে।

পীতাম্বর উত্তেজনায় অবনির হাত খামছে ধরে, আমারও তাই মনে হচ্ছে। লোভী, চকচকে এবং ধারালো।

https://boierhut.com/fb

দুজন ফিরে আসতে আসতে পীতাম্বর অবনিকে বলে এগুলোর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

অবনি জোরে মাথা নাড়ায়, ঠিক বলেছিস। কালকেতু উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসে। অবনি আর পীতাম্বরের কথা ও শুনতে পায়। শুনতে পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। না পেলে এতবড় নগর চালাবে কী করে? ওকে একাই সবকিছু দেখতে হয়। ভাঁড়ু দত্ত আর ফখরুল আলম ওর দিকেই তাকিয়ে থাকে। কেবল হুকুমের অপেক্ষা, হুকুম পেলেই তবে ওদের মগজ নড়ে। অন্য সময় ওরা স্থবির, বধির এবং নির্বাক। ওর উত্তেজনা অবনি, পীতাম্বর, হামিদ, মজিদের মতো লোকদের নিয়ে। ও জানে মানুষের রূপান্তর আছে। মানুষ আচরণে শুয়োর, ষাঁড়, বেড়াল, কুকুর হয়। তাই একদল রূপান্তরিত হলে অন্য দল তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এটাই নিয়ম। হয়তো কাউকে কাউকে কেনা যায় না, এটা সত্যি। তবে এসবের মধ্য দিয়েই চলতে হয় এবং জাল ফেলতে হয়। ও জানে ওর জালে এই নগরের রাঘব-বোয়ালরা সব ধরা পড়েছে। যাদের ও গণ্য করে না তাদের ও ধরার চেষ্টা করেনি। যারা স্বেচ্ছায় ধরা পড়তে চায় তাদের ও কড়ে-আঙুল দিয়ে উঠিয়ে ছুড়ে ফেলে। জানে ওরা বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না। শুধু অবনি পীতাম্বর মজিদদের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনতে পায়, ওদের ঘৃণা উপচে পড়া দৃষ্টি দেখতে পায়। ওরাই একজোট হয়ে গেলে পারবে এই নগরকে ওলটপালট করে ফেলতে।

ও আবার বিছানায় এসে বসে। তন্দ্রার মতো আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুন্দরী রমণীর ফেলে যাওয়া সুগন্ধি বিছানায় ছড়িয়ে আছে। সেই চমৎকার গন্ধ পিনপিনিয়ে নাকে ঢুকছে, চলে যাচ্ছে মাথায় এবং রক্তের গভীরে। ভালোই লাগছে। এমন ভালোই তো লেগেছিল তখন, যখন হাজার হাজার দিনমজুর রাতদিন পরিশ্রম করে নগর পত্তন করে। নগরীর মাঝখানে সোনালি চূড়ার উজ্জ্বল আভা বিকিরণ করে দাঁড়িয়ে থাকে দেবীর মন্দির। মন্দিরে দেবীর স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হয়। আজ মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা সম্পন্ন হবে এবং এরপর অনুষ্ঠিত হবে কালকেতুর অভিষেক। তারপর সুসজ্জিত অশ্ব-শকটে কালকেতু নগর প্রদক্ষিণ করবে।

অভিষেক? শব্দটা মনে পড়তেই ও আবার বিছানায় গড়াগড়ি দেয়। সবটুকু সুগন্ধি উঠিয়ে নিতে চায় নিজের শরীরে। অভিষেকের জন্য বিশাল মঞ্চ নির্মিত হয়েছে। বন উজাড় করে ফুল সংগ্রহ করে মঞ্চসজ্জা সম্পন্ন করা হয়েছে। হাজার হাজার ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে মঞ্চের চারপাশে। অষ্টধাতু দিয়ে নির্মিত হয়েছে জোড়া-আসন। শাঁখে মঙ্গলধ্বনি বাজছে। কুমারী মেয়েরা সাজিভরা ফুলের পাপড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে পথে। কালকেতুর আগমনে সে পাপড়ি ছড়িয়ে পড়বে পথের ওপর। সে পাপড়ি পদদলিত করে কালকেতু উঠে আসবে মঞ্চে। আর কিছুক্ষণ পর কালকেতু এবং ফুল্লরা জোড়া-আসনে উপবেশন করবে। হাজার হাজার মানুষ মন্দির চত্বরে সমবেত হয়েছে। ওদের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা, কখন রাজা আসবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আহ্ রাজা! কালকেতু প্রাণভরে শব্দটা উচ্চারণ করে। হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য যে নিজের মুঠোয় রাখতে পারে সে তো রাজাই। ও আবার বিছানায় এ-মাথা ও-মাথায় গড়াগড়ি খায়। সুন্দরী রমণীর সবটুকু সুগন্ধি ওর চাই। সেইসঙ্গে নগরের কোটি কোটি লোকের ভাগ্যের অধিকারে যারা ষড়যন্ত্র করে ওরা নর্দমার কীট, কালকেতু ওদের দুপায়ে দলে মারবে। সর্বত্র ওর লোক ছড়ানো আছে, ওরা খবর বয়ে আনবে। ও সুগন্ধি গায়ে বিছানার অন্য প্রান্তে আসে। দেখতে পায় ঘরজুড়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। রঙিন হয়ে যাচ্ছ ছাদ এবং দেয়াল। কালকেতু পুজো সম্পন্ন করে মঞ্চে এসে বসেছে। পাটরানী হয়ে ময়ূরের মতো পেখম তুলে বসে আছে ফুল্লরা। হীরের দ্যুতিতে ওর গায়ের তমসবর্ণ উজ্জ্বল আভায় চকিত হয়ে উঠেছে। গলায় চন্দ্রহার, কানে কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর, হাতে কাঁকন, কটিদেশে বিছা, গায়ে মল, সিঁথিতে টিকলি। খুঁয়া পাতার সুতোয় তৈরি মিহি শাড়িতে আজ ও উর্বশী।

আজ কালকেতু কবি। দেবীকে বন্দনা করে ও গীত রচনা করছে। কবি? ওর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। দেবীর আশীর্বাদ না থাকলে ও কবি হতে পারত না। কেমন অবলীলায় পঙ্‌ক্তিমালা এসে যায় কাগজের পৃষ্ঠায়। রচিত হয় কালকেতুর অমরাবতীর পথ। ও চিরকাল জেগে থাকতে চায় মানুষের হৃদয়ে। সেদিন নিজের রচিত গীত দিয়েই দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। তারপর ঘোষণা করে যে, প্রতি মঙ্গলবার দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হবে। আরো বলে, আমি নির্দেশিত হয়েছি যে দেবীর পূজা ছাড়া এখানে আর কোনো ধর্ম থাকবে না। যে কেউ এর অন্যথা করলে তার মুণ্ডু ধুলোয় গড়াবে।

কালকেতুর কণ্ঠ গমগম করে ওঠে। ওর সুললিত ভাষণ সবাইকে মোহিত করে। ওর কণ্ঠ কখনো উঁচুতে ওঠে, কখনো খাদে নেমে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে শ্রোতাবৃন্দ। ও যখন প্রিয় নগরবাসী বলে সম্বোধন করে তখন তো শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে। করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক। ও বিপুল উৎসাহে দুহাত উঁচু করে বলে, আজ থেকে আমরা নতুন কলিঙ্গ গড়ব। এ নগর আমাদের স্বপ্ন, সাধনা। দেবীর সাহায্য ছাড়া আমরা এ নগর গড়তে পারতাম না। এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। দেবীকে তুষ্ট রেখে আমি পুরো বছর ধরে সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করে যাব। সাহায্য কীভাবে পেতে হয় সে পথ আমি জানি, সে কৌশল আমি জানি। আমাদের নিজস্ব অর্থনীতি নেই তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এ নগরে মানুষ দরিদ্র হতে পারে কিন্তু তাদের সৌন্দর্য-চেতনা প্রখর। পেটে ভাত না থাকলেও তারা পাখি দেখে, ফুল দেখে মুগ্ধ হয়। আমরা পর্যটকদের এই নগরের দরিদ্র দেখাব না। একবার সফরখানে এক ভিনদেশি বণিক আমাকে অপমান করেছিল দরিদ্র গ্রামের দরিদ্র মানুষ বলে। আমরা এ নগরের কোথাও দারিদ্র্যের চিহ্ন রাখব না। আপনাদের পেটে ভাত না থাকা কিছু এসে যায় না, কিন্তু এ নগরীকে আলো ঝলমল করে তুলতে হবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আপনারা এর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করুন। পর্যটক আমাদের রান্নাঘর দেখবে না, দেখবে না আমাদের পেটে নুন-ভাত না শাক-ভাত। কিন্তু ওদের মোহিত করতে হবে আমাদের চাকচিক্যে। প্রয়োজন হলে আমরা নগরের সৌন্দর্যের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করব।

আলোর ব্যবস্থা করব, রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য মনমতো না হলে ভেঙে নতুন রাস্তা বানাব, ভিনদেশ থেকে পাথর এনে ভবনগুলো মুড়ে রাখব, অর্কিড এনে বাগানগুলো ভরে দেব। নগরের মোড়ে মোড়ে থাকবে সৌন্দর্য-উদ্যান—উদ্যানের মাঝখানে স্থাপিত হবে স্ফটিক ফোয়ারা এবং ভাস্কর্য। রাস্তাঘাটে সব সময় সুসজ্জিত শকটের বহর থাকবে।

আপনাদের যাদের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, যাদের পায়ে জুতো নেই, যারা হাড্ডিসার, ক্লান্ত, মুমূর্ষু তারা আড়ালে থাকবেন। আপনারা নগরের সৌন্দর্য নষ্ট করার জন্য ভেতরে প্রবেশ করবেন না।

বক্তৃতা শেষ হলে প্রবল করতালি বাজতে থাকে। ভবানি কালকেতুর বক্তৃতার কিছুই বুঝতে পারে না। মনে হয় ও যেন আশৈশবের চেনা বন্ধু কালকেতু নয়। ও যে কতগুলো আবোলতাবোল কথা বলে গেল তার কোনো অর্থ হয় না। দরিদ্র এ নগর থেকে দারিদ্র্য ঘুচবে কী করে তা কিছুতেই ভবানির মাথায় ঢোকে না। ও বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ওর জামা ছেঁড়া, পায়ে জুতো নেই। ও একবার ভাবে আমি কী এই নগরে অপাঙ্‌ক্তেয়? নিজেই উত্তর দেয়, অসম্ভব। এখানে আমার অধিকার। আমি ভিনদেশি নই।

ও দেখতে পায় সুসজ্জিত অশ্ব-শকটে নগর প্রদক্ষিণে বের হয় কালকেতু ও ফুল্লরা। শকট বেরিয়ে গেলে অধিকাংশই কালকেতুকে ধন্য ধন্য করতে করতে বাড়ি ফিরে যায়। ভবানি এক পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে কালকেতু যা বলেছে তা নেহাতই কথার কথা।

যাদের জামাজুতো নেই তারা তো এই নগরের আশিভাগ লোক। ওদের কি আর চিরকাল নগরের বাইরে রাখা যাবে? নাকি রাখা উচিত? এইসব ভেবে শকট বেরিয়ে যাবার সময় বন্ধু কালকেতুর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। কালকেতু ওকে চিনতেই পারে না। কোনোকালে চিনত এমন কথা ও ভাবতেই পারে না। শকট বেরিয়ে চলে যায়। ভবানি মুক্ত বাতাসের আকাঙ্ক্ষায় ভিড় ঠেলে ছুটে বেরিয়ে যায়। লোকের কনুইয়ের গুঁতোয় জামার পিঠের অংশ ছিঁড়ে গিয়ে পতাকার মতো পতপত ওড়ে। পীতাম্বর ওর হাত জড়িয়ে ধরে, তোর জামা ছিঁড়ে গেছে ভবানি?

তাতে কী? তোরটাও তো ছেঁড়া।

পীতাম্বর হেসে বলে, ওতে কিছু এসে যায় না।

নিশিকান্তকে দেখে ভবানি একগাল হেসে বলে, মাস্টারমশায় আপনার পায়ে যে জুতো নেই?

আমি কি একা? তোরা কয়জনকে গুনবি? এ নগরে পাঁচজন ছাড়া কি কারো পায়ে জুতো থাকে?

পীতাম্বর বলে, তা হলে আমরা আড়ালে যাব কেন? নগর তো আমাদেরই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভবানি ছেঁড়া জামা খুলে বাতাসে ওড়াতে ওড়াতে বলে, কালকেতু পাগল হয়েছে, আমরা তো পাগল নই। নগর আমাদেরই।

নিশিকান্ত ওদের দুজনের ঘাড়ে হাত রাখে। বলে, যাদের জামাজুতো নেই তারাই এই নগরে থাকবে রে ভবানি। আমরা এক হলে কালকেতুরা হয় মরবে নয় পালাবে ভিনদেশে।

খটখট শব্দে কালকেতুর শকট চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। জনতা জটলা করছে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে। ওরা তিনজনে উলটো দিকে হাঁটতে থাকে। কারো মুখে কথা নেই, কিন্তু ওরা একইরকম ভাবছে।

হো-হো করে হেসে ওঠে কালকেতু। বিছানার সুগন্ধির গন্ধ কমে আসছে। ও উঠে বসে। বাথরুমে যায়। চোখেমুখে পানি দেয়। আয়নায় নিজের মুখ দেখে। বেশ ফ্রেস লাগছে। দেখল আয়নায় ওকে ভালো দেখাচ্ছে। নগরের রমণীরা ওকে দেখে মুগ্ধ হয়। ও নিজেকে সপ্রতিভ রাখার চেষ্টা করে। ওর ঠোঁটের কোণে তখনো হাসির রেশ লেগে আছে। তোয়ালে মুখে চেপে ধরে আলতো করে মুছে নেয়। আসলে এই গরিবদের নিয়ে রাজনীতির কথা ভাবলে ওর হাসি পায়। হাসতে হাসতে ওর পেট ফুলে ওঠে। ও ধীর পায়ে ঘরে ফিরে জুতো পরে। সোনার ফ্রেমের চশমা চোখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাসি থেমে যায়। ও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। অপরূপ এই নগর, ওর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নিরন্ন মানুষের সমাবেশ হয়ে থাকে। এরা আছে বলেই তো ক্ষমতায় টিকে থাকা, এরা আছে বলেই তো দারিদ্র্যের শোভা এবং ভিনদেশের সাহায্য। এই এক জীবনে কালকেতু এর বেশি কিছু চায় না। ও চায় এই দরিদ্র মানুষগুলো আরো দরিদ্র হোক এবং এদের ভাগ্য উন্নয়নের কথা বলে ও ভিনদেশের অর্থ দিয়ে গড়ে তুলবে নিজের সম্পদের পাহাড়। এসবই তো রাজনীতির খেলা। কালকেতু সব খেলাতে জিতে যায়।

আজ আর ওর বাড়ি ফিরতে একটুও ইচ্ছে হয় না।

১৩

অ্যাকসিডেন্টের পর দুমাস বিছানায় কেটে গেল মজিদের। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে ও। ডান হাতের কবজি ভেঙেছে। দু-এক জায়গায় কেটেছে মাত্র। এ ছাড়া তেমন বড় কিছু ক্ষতি হয়নি। খারাপ লেগেছে বিছানায় শুয়ে থাকতে। যেমন অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল সবকিছু। রঞ্জনা বিরক্ত হয়েছিল। ওর সেবা করাটা রঞ্জনার কাছে সুখকর মনে হয়নি। মজিদের মনে হয় এই নগরের হৃদয়হীন মানুষগুলোর মতো রঞ্জনা দ্রুত এই গুণটি অর্জন করেছে। ওর মমতা কম। অবলীলায়

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নিজের খেয়ালখুশি প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না। এতদিন সুযোগ পেলেই বলেছে, কোথায় গিয়েছিলে পাপ করতে, পাপের ফল পেয়েছ। হাত ভেঙে এখন ঘাড়ে পড়েছ আমার। এই পাপের ফল বওয়ার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে।

এইসব কথা শুনতে শুনতে কেমন নিথর হয়ে যায় মজিদের অনুভূতি। ও বিবর্ণ দৃষ্টিতে পৃথিবী দেখে, নিজের অনাগত দিনগুলো দেখে। রঞ্জনার অসুস্থতায় ও কখনো রঞ্জনাকে এমন করে বলতে পারবে না। আসলে এই নগরের সবাই কৌশল শিখছে। সে কৌশল নিজের জন্য, আর কারো জন্য নয়। ও কি ব্যতিক্রম হয়েই থাকবে? নাকি সবার মতো হবে?

ভাবতে ভাবতে দুমাস পর অফিসে আসে মজিদ। ওর ভালোই লাগে। সহকর্মীরা ঘিরে ধরে। বলে, দুমাসে আপনি বেশ ফ্রেশ হয়েছেন। এখন আর আপনার চেহারায় ফ্যাকাসে ভাবটা নেই।

কথা বলতে বলতে ও কেমন অবসন্ন বোধ করে।

ওরা চলে গেলেও কাজে মন দেয়। কত কিছু টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। ডানদিকের দরজা খোলা। কাঁঠালের পাতাগুলো কালচে সবুজ। বহেড়া গাছটায় পাতা ভরে আছে। এই দুমাসের অনভ্যাসের ফলেই হয়তো ও কাজে মন বসাতে পারে না। কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দেয়। ভাবে অন্যদের টেবিলে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসবে। কিন্তু ওর সামনে বসে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁকে ছেড়েও উঠতে পারছে না। তখন মজিদ মনোযোগ দিয়ে শিক্ষককে দেখে। তিনি মনোযোগ দিয়ে একটি বই পড়ছেন। যে বইটি তিনি পনের পৃষ্ঠা লিখে দিয়েছিলেন, বাকি চল্লিশ পৃষ্ঠা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মজিদকে লিখতে হয়েছে। শিক্ষকের ফরসা চেহারায় সরল এবং বোকা হাসি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই গ্লানিমুক্ত হাসি মজিদকে স্বস্তি দেয় না; তার তো লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ওর ধারণা পালটায়। এই লোকটিকে ঘৃণা করতে পারছে না। যুক্তি বলছে ঘৃণা করা উচিত, আবেগ বলছে কী হবে? এমন হাজার হাজার লোক আছে। কজনকে তুমি ঘৃণা করবে? এখন ওর নিজের ওপরই করুণা হয়। এই লোকটির কাছে ও পড়েছে, অথচ এই মুহূর্তে ওকে কত নগণ্য মনে হচ্ছে। এই বোধে আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ও ক্লান্ত হয়ে যায়। চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে দেয়।

তোমার শরীর খারাপ নাকি মজিদ?

মাথাটা কেমন যেন করছে।

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আসলে একটা বড় ধাক্কা কাটিয়ে উঠলে তো? তোমার আরো বিশ্রাম নেওয়া দরকার। অফিসে তুমি বেশি সময় দাও, পরিশ্রম করো।

ওর শিক্ষক ওকে সহৃদয় কথা বলেন। মজিদের কানে তা ভালো শোনায় না। মনে হয় মেকি এবং কৃত্রিম। এখন তাঁর সঙ্গে ওর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। যে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এই বাণিজ্যিক পৃথিবী চলছে। হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে ওর মরে যেতে ইচ্ছে করে। এই মুহূর্তে যদিও

https://boierhut.com/fb

নিজেকে বিজিত মনে হচ্ছে। কিন্তু ওর হেরে যাওয়ার সংখ্যাই বেশি। এই টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে বড় করতে পারে না বলে খণ্ড নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। ও অনেক ভেবে দেখেছে যে, একমাত্র মৃত্যুতেই ও সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। পৃথিবীতে কজনইবা নিজেরা হাতে মরতে পারে? নিজের ওপর জয়ী হতে পারাটাই সবচেয়ে বড় জয়।

চা খাবে নাকি মজিদ?

স্যার আমার পিয়ন ছুটিতে।

চলো তোমাদের ক্যান্টিনে গিয়ে চা খেয়ে আসি। চা খেলে তোমার হয়তো ভালো লাগবে।

মজিদ মুখে হাত চাপা দিয়ে বিশাল একটা হাই তোলে। এই লোকটি ওকে চা খাওয়াতে চাচ্ছে, ওর হাসি পায়। একসময় টিউটোরিয়ালে এই লোকটির কাছ থেকে বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য ও পিছে পিছে হাঁটত। ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হলে ধন্য হয়ে যেত। হঠাৎ ওর মনে হয় এটাই ওর পরাজয়। একজন মানুষকে মাথার ওপর থেকে ধুলোয় নেমে আসতে দেওয়া পরাজয়েরই সমান।

তুমি আজ বাড়ি চলে যাও মজিদ। গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি যাই, পরে দেখা হবে।

ও ম্লান হেসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে বিদায় দেয়। একজন মানুষ নেই যার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানো যায়। বাড়ির কথা বলল তার শিক্ষক। বাড়ি কী? বাড়ি মানে তো দুর্গ, নিরাপদ নয়, শ্বাসরুদ্ধকর। বাড়ি কী? মজিদের টেবিলে মাথা টুকতে ইচ্ছে করে। কাল রাতে রঞ্জনা আবার চেঁচিয়েছে। আর্তস্বরে বলেছে, আমার বাবার মতো হয়ে তুমি আমার কাছে এসো না। এই একটি বাক্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায় ওর অহমিকা। ও তো একটা তাসের ঘর। সেই ঘরে ফিরে গিয়ে কী হবে? ফেরা মানেই তো দগ্ধীভূত যন্ত্রণার শিকার হওয়া। ফেরা মানেই তো থেঁতলানো হৃৎপিণ্ড, পুড়ে যাওয়া শরীর এবং পোকা খাওয়া মগজ। এই বিকলাঙ্গ অবস্থায় নিজেকে নিয়ে ও কী করবে? কোথায় পালাবে? এই নগরীর কোথাও কোনো জায়গা নেই যেখানে গিয়ে ও নিজেকে উজাড় করতে পারে? হায় ঈশ্বর, বাড়ি মানে তো নরক। সকালে ও যখন বেরিয়ে আসে তখন রঞ্জনা ঘুমিয়েছিল। রাতে রঞ্জনাকে চড় দিয়েছে, নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। ওর ওপর জোর প্রয়োগ করেছে। রঞ্জনা ওকে খামচে দিয়েছে। নখের আঁচড়ে গালে একটা লম্বা দাগ পড়েছে। এখনো চিনচিনে জ্বালা আছে।

একটু পরে হামিদুর রহমান ডাকে ওকে। ও শ্লথ পায়ে সে কক্ষে প্রবেশ করে। হামিদুর রহমান স্টেনোকে ডিকটেশন দিচ্ছিল। ওকে দেখে বসতে বলে। মজিদ চেয়ারে বসে ভাবে, ওর শিক্ষকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দেওয়ার জন্য হামিদুর রহমান ওকে ধন্যবাদ দেবে। মুদ্রণ পারিপাট্যেও বইটি চমৎকার হয়েছে। একটি সুন্দর বই প্রতিষ্ঠানের সুনাম। ওর মনে আশা মহাপরিচালক ডক্টর কামালউদ্দিন হয়তো তার এই কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন। ও পরম ঔদাসীন্যে বলবে, এ

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর এমনকি কাজ স্যার। এর জন্য ধন্যবাদই বা কেন? এ তো কর্তব্য। আমি কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। ফ্যানের বাতাসে মজিদের চুল এলোমেলো হয়ে যায়। তেল দেওয়া ওর অভ্যেস নেই। সেজন্য চুলগুলো উস্কখুস্ক থাকে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কপালের ওপর এসে পড়ে। ও হাত দিয়ে চুল সরায়। ওর ডান হাতের মধ্যমা এবং অনামিকায় দুটো পাথর আছে, একটা প্রবাল অন্যটা পোখরাজ। এতে নাকি মঙ্গল হয়। রঞ্জনার প্রবল উৎসাহে এগুলো পরেছে। রঞ্জনা আসলেই স্বার্থপর। কারণ ও বোঝে মজিদের ভালোমন্দের সঙ্গে ওর নিজের ভালোমন্দ জড়িত। সেটুকুতেই ওর উৎসাহ। যাক গে এসব। ও ঝেড়ে ফেলে। কিন্তু এই দুটো আংটি পরে ও কখনো অনুভব করেনি যে, ওর কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। ছোট পরিবর্তনইবা কোথায়? সেই তো অ্যাবনরমাল স্ত্রী, একঘেয়ে চাকরি এবং অবিরাম রক্তক্ষরণ। ওর হাসি পায়। কিন্তু হাসতে পারে না, পাছে হামিদুর রহমান দেখে ফেলে। যতক্ষণ ডিকটেশন দেওয়া হয়, ও মাথা নিচু করেই রাখে। আংটি নাড়াচাড়া করে। এক আঙুল থেকে বের করে অন্য আঙুলে ঢোকায়। একসময় এই খেলা বন্ধ করে মনোযোগ দিয়ে হাতের রেখা দেখে। ওর করতলে একটা বাড়তি হৃদয় রেখা আছে, যেটা অন্যদের হাতে একদম দেখা যায় না। একসময় যখন হাত দেখানোর নেশা ছিল তখন অনেক জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করেছে এই রেখার কথা, কেউ সদুত্তর দিতে পারেনি। করতলে নিজের ভাগ্য দেখায় মগ্ন হয়ে গেলে হামিদুর রহমানের ডিকটেশন শেষ হয়। স্টেনো কাগজপত্র নিয়ে চলে গেলে সে টয়লেটে যায়। ততক্ষণে মজিদ মাথা তোলে। ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কার্পেটে মোড়ানো মেঝে, একদিকে সোফা, বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ফুলদানি, অ্যাশট্রে, ক্যালেন্ডার, কলমদানি, পেপারওয়েট ইত্যাদি। একগ্লাস পানি পিরিচ দিয়ে ঢাকা। রিভলভিং চেয়ারের ওপর তোয়ালে বিছানো। দেয়ালে জাপানি মেয়ের ছবিআলা ক্যালেন্ডার। হামিদুর রহমান গোছানো লোক। কোথাও কিছু এলোমেলো পছন্দ করে না। মজিদের প্রচণ্ড পিপাসা পায়, কিন্তু ও উঠে গিয়ে পানি খেতে পারে না।

হামিদুর রহমান টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসে। এক ঝলক সুগন্ধি এসে লাগে মজিদের নাকে।

মজিদ সাহেব তরিকুল ইসলামের পাণ্ডুলিপিটা পাওয়া গেল?

স্যার, অনেক খুঁজে দেখেছি।

হামিদুর রহমান রেগে যায়, তরিকুল ইসলাম যে সে লেখক নন। তিনি সরকারের উচ্চপদে আসীন। পাণ্ডুলিপি হারানোর ফলাফল ভেবে দেখেছেন?

আমার মনে হয় স্যার, পুরনো বিল্ডিং থেকে নতুন বিল্ডিংয়ে আসার সময় পাণ্ডুলিপিটা হারিয়েছে।

আমি এসব কথা জানতে চাই না।

কিন্তু স্যার, আমার কী দোষ? আমি তো তখন ছুটিতে ছিলাম।

কোনো অজুহাত নয় আমি পাণ্ডুলিপি চাই।

আমি কোনো জায়গা খুঁজতে বাকি রাখিনি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বললাম তো আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার পাণ্ডুলিপি চাই। ছিঃ ছিঃ আমি কীভাবে যে মুখ দেখাব। তরিকুল ইসলাম ইচ্ছা করলে আমার চাকরি খেতে পারেন। আপনি যদি তিনদিনের মধ্যে পাণ্ডুলিপি বের করতে না পারেন আমি আপনাকে শোকজ করব।

ঘৃণায় যন্ত্রণায় মজিদের মুখে কথা জোগায় না। ও নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। বারবার মনে হয় এই অপমান হজম করা কী সহজ? ও চুপচাপ চেয়ারে এসে বসে। ও খেয়াল করে দক্ষিণ দিকের দরজায় একটা ঘিয়ে রঙের পর্দা লাগানো হয়েছে। কদিন ধরে এসব কথাবার্তা চলছিল। অফিস ডেকোরেশনের দিকে নজর দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ও ঘিয়ে রঙের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর পরিচিত পৃথিবী থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করেছে ঐ পর্দা। ওপরে বহেড়া গাছ, কাঁঠাল, দেবদারু, কাটা-ঘুড়ি, শালিক, সাদা দেয়াল—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ও উঠে পর্দাটা খুলে ফেলে। ওটাকে ভাঁজ করে আলমারির ভেতর ঢুকিয়ে রাখে। হু-হু বাতাস এসে ঘর ভাসিয়ে দিলে ওর মাথা খোলাসা হয়ে যায়। ও ভাবে, তরিকুল ইসলাম ক্ষমতাধর লেখক বলে হামিদুর রহমানের মাথা গরম হয়ে গেছে। তার লেখার শিল্পমূল্যের বিচার নয়, তার লেখা যাচাই হচ্ছে ক্ষমতার মানদণ্ডে। ছিঃ! মজিদ শব্দটা নিজে নিজে উচ্চারণ করে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ও আর কতকাল এইসব লোকের অধীনে চাকরি করবে? আর কতদিন জীবিকার নামে এই ক্ষুন্নিবৃত্তি চলবে? প্রবল বিবমিষায় ওর শরীর অবশ হয়ে আসে। ও বহেড়া গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। শুকনো পাতায় ভরে আছে জায়গাটা। পায়ের নিচে পড়লে মচমচ করে। এই অলৌকিক ধ্বনির মতো ঐ শব্দ ওকে আপ্লুত করে। ওর ইচ্ছে করে কবিতা লিখতে। মনে মনে ও কবিতার পঙ্‌ক্তি সাজায়।

ঘরে ফিরে ও কাগজ টেনে বসে। কিন্তু মনমতো হয় না। কাগজ ছিঁড়ে কুটিকুটি করে। গোল্লা গোল্লা সাদা কাগজের স্তূপ হয়ে যায় দরজার সামনে। একবার তারেক এসে উঁকি দেয়, কী কর্মবীর এসব কী হচ্ছে?

ও মুখ তুলে তাকায় না। ভুরু কুঁচকে থাকে। ও মনেপ্রাণে নিজের ভুবনে ফিরে আসতে চায়।

বুঝতে পারছি সুবিধে হবে না। কর্মবীর কর্মে ডুবে আছে। যাই গিয়ে।

তবুও মজিদ কিছু বলে না। কিছুক্ষণ পর বশীর আসে, এক শলাকা ভুইল্যা চলবে নাকি?

ও মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে না জানায়।

আমার ব্যবসা কিন্তু ভালোই চলছে। কী, কথা বলছেন না যে, কাজ করছেন? ঠিক আছে, যাই।

না, লেখা আর হলো না। মনমতো হয় না বলে ও লিখতে পারে না। এখন ও কাগজের বুকে আঁকিবুঁকি কাটে। রঞ্জনার মুখ আঁকার চেষ্টা করে। সে মুখে চোখ নেই এবং ঠোঁট নেই। যে চোখে ও দেখতে পায় না বাবার মতো বয়স্ক স্বামী এবং যে ঠোঁটে উচ্চারিত হয় না নিষ্ঠুর বাক্য। একসময় ওর কলম থেমে যায়। ভাবে আবার কী শুরু করা যায় না জীবন, জীবনের যেটুকু পাওয়া হয়নি তার জন্য? ওর হাসি পায়। কতকিছু তো পাওয়া হলো না। চাইলেই কী সেটুকু ওর হাতের মুঠোয়

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আসবে? আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার পরও হামিদুর রহমান ওকে শোকজ করার হুমকি দিয়েছে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে হামিদুর রহমানের মুখ। কথা বলার পর সেই মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টিতে ক্ষমতার দর্প দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মজিদ। এখন ও হামিদুর রহমানের সে চেহারা ঝেড়ে ফেলে উদাসীন হয়ে যায়। ভাবে, যা ঘটে ঘটুক। এখন থেকে এসব নিয়ে ও আর মাথা ঘামাবে না।

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে অফিস থেকে বেরিয়ে যায় ও। কোথায় যাব? অফিসের গেটে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করে। তারপর ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকে। বেলা দশটা কি এগারটা হবে। সদরঘাটে ওর এক পরিচিত মাঝি আছে। ও মাঝে মাঝে নৌকায় করে ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অথবা মজিদ প্রচুর বাজার করে মাঝির বউকে দেয়, রান্না হলে খেয়েদেয়ে ঘরে ফেরে। এতে দুটো লাভ হয়। এক, ও সেদিনের জন্য নিজের পারিপার্শ্বিক থেকে পালিয়ে বাঁচে। দুই, সেদিন মাঝির বাড়িতে বেশ হৈচৈ হয়। ওর দশজন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে মিনতির কাজ করে। এতগুলো ছেলেমেয়ের মা, সংসারের অভাব এবং খাটুনির পরও মাঝির বৌ মোটাসোটা, ফরসা চেহারার মহিলা। সংসারে কোথাও অযত্নের ছাপ নেই। মজিদ একটা রিকশা নিয়ে সদরঘাটে আসে। মাঝি নৌকা নিয়ে ঘাটে বসে আছে। অনেকদিন ওকে দেখেনি। আজ মনে হলো মাঝির বয়স অনেক বেড়েছে। অর্ধেকের বেশি চুল পেকে গেছে। চোয়াল ভেঙে গর্তে ঢুকেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনের বিপরীত। তবু ওরা পঁচিশ বছর ঘর করেছে এবং দশটা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এভাবেই জীবন গড়ায়।

মজিদকে দেখে মাঝি অতি উৎসাহে নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে যায়। হাত ইশারায় ওকে ডাকে। মজিদ লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। মাঝিকে পেয়ে ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মাঝি ওর দুহাত জড়িয়ে ধরে বলে, কেমন আছেন মজিদ ভাই?

একদম ভালো নেই। তুমি কেমন আছ?

আমিও ভালো নেই।

কেন? রোজগার তেমন নেই। এই আর কী। আপনার কী হয়েছে?

আমার মন ভালো নেই।

যাবেন কোথাও?

কোথায়?

শীতলক্ষ্যার পাড় ধরে এগিয়ে যাই। তারপর কোথাও নামবেন।

মন্দ না। খিরাই কিংবা মিষ্টি আলুর ক্ষেত ধরে অনেকদূরে চলে যাব। দুজনে দোকান থেকে মুড়ি আর চা খাব।

মাঝি উৎসাহে বলে, হ্যাঁ, যাবেন?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

না, আজ থাক। চলো বাজার করে তোমার বাসাই যাই। তোমার বউ কেমন আছে?

বউ তো ভালো আছে। কিন্তু এখনই যাব? মহাজনের জমার টাকাটাও ওঠেনি।

আমি দিয়ে দেব।

মহাজনের নৌকা এবং টাকা জমা দিয়ে দুজনে বাজার থেকে ইলিশ আর আনাজ কিনে ঘরে ফেরে, চালও নিয়েছে সের দুই। মজিদ ভেবে দেখল মনু মাঝির স্বভাবের মধ্যে একটা বাঁধন ছাড়া ভাব আছে। ও অতটা বৈষয়িক নয়। ওর মধ্যে পিছুটান ততটা প্রবল নয়। সবকিছু ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। ও ঘরে ফিরে হাঁকডাকে সবাইকে জড় করে ফেলে।

কৈ গো দেখো কে এসেছে?

অ-মা মজিদ ভাই যে? কতদিন পর এলেন?

আপনি ভালো আছেন ভাবি?

আল্লাহ্ ভালোই রেখেছেন।

ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করে এসে ঘিরে দাঁড়ায়। মজিদ ওদেরকে লজেন্স দেয়। মনু মাঝির বউ বাজারের ঝোলা নিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়।

সন্তু আর ঝর্নাকে দেখছি না?

সন্তু একটা দোকানে কাজ পেয়ে এই সংসার ছেড়ে চলে গেছে।

ছেড়ে গেল কেন?

এই অভাবের সংসারে ও আর থাকবে না। নিজের পথ নিজেই দেখবে।

মনু মাঝির কণ্ঠে বেদনা আঁচ করে মজিদ আস্তে করে বলে, তোমার খারাপ লাগছে?

মনু মাঝি জোর করে হাসে। বলে, এটা তো নিয়ম। এটাই তো হওয়া স্বাভাবিক।

ভাবি?

ও কান্নাকাটি করে। আমাকে গালাগালি করে। ওদের ফিরিয়ে আনতে বলে।

তুমি যাওনি?

না।

ভাবির আচরণটাই স্বাভাবিক, তোমারটা নয়।

যে যাবার সে যাবে আমি ধরে রাখার কে? মজিদ এক মুহূর্ত মনু মাঝিকে দেখে। মনে হয় মনু মাঝির শরীরটা দড়ির মতো পাকিয়ে গেছে। ওর মুখ দেখে ওর ভাবান্তর বোঝা যায় না। মানুষের যখন রাগ, অভিমান থাকে না তখন মানুষ এক ধরনের নিস্পৃহ হয়ে যায়। এই নিস্পৃহতা মজিদকে কষ্ট দেয়। মনু মাঝির জন্য বুক কেমন করে ওর।

ঝর্না কৈ? ওকে দেখছি না?

ও একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কবে?

দিন পনের হলো।

কোথায় গেল খোঁজ পাওনি?

আমি তো খুঁজিনি। খুঁজলে হয়তো পেতাম।

একটু থেমে মনু মাঝি বলে, কী লাভ খুঁজে? আগেই বলেছি না, যারা যাবার যাবে। আমাকে ছাড়তে যদি ওদের কোনো কষ্ট না হয় আমারও কোনো কষ্ট নেই।

ভীষণ অন্যায় তোমার।

আপনি আমাকে বুঝবেন না মজিদ ভাই। আমি ওদের খুঁজব কোন মুখে? যে বাপ ছেলেমেয়েদের বোঝা বইতে পারে না তার খোঁজাখুঁজি মানায়? ওরা যা করে সেটাই আমি ঠিক বলে মেনে নেই।

ভাবিকে দেখে তো এত কিছু মনে হলো না?

ও আপনার কাছে লুকাতে চায়। আপনি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। ওর যত দাপট সব আমার সঙ্গে। আমার ওপর ঝাল ঝাড়তে পারলেই ওর সব শান্তি।

মজিদ হাঁ করে মনু মাঝিকে দেখে। বছর চারেক ধরে ওর সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু কখনো তো মনে হয়নি মনু মাঝির বুক থেকে রক্ত ঝরে? কত কাছের মনে হয় সবাইকে। তবু কাউকে চেনা যায় না। হঠাৎ করে এই অপরিচিত পরিবেশ ওকে তাড়া করে। ওর ইচ্ছে করে ছুটে পালিয়ে যেতে। মনু মাঝির খুপরির মতো দুটি ঘর। এই ঘরে একটা চৌকি পাতা। এ চৌকিতে মনু মাঝি ঘুমোয়, অন্য ঘরে ছেলেমেয়েরা নিচে বিছানা করে থাকে। বারান্দায় রান্না হয়। উঠোনে একটা ট্যাপকল আছে। আরো চারটে পরিবার এখান থেকে পানি নেয়। কলতলায় ছেলেমেয়েরা ঝগড়া করছে, হয়তো পানি নিয়ে মারামারি। মনু মাঝি দরজার কাছে একটা জলচৌকির ওপর বসে বিড়ি টানছে। মজিদ চৌকির ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। দুহাত মাথার নিচে, ডান হাঁটুর ওপর বাম পা ওঠানো। ও দেখতে পায় পায়ের আঙুলের নখ বড় হয়ে গেছে, ওগুলোর ভেতরে ময়লা। কেন যে ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয়নি কে জানে। ও আড়চোখে মনু মাঝিকে দেখে, লোকটা বরাবরই কম কথা বলে। ওর আনন্দ-বেদনা তেমন বোঝা যায় না। মেঘনার ভাঙনে মনু মাঝির পৈতৃক নিবাস নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। ওরা পাঁচ ভাই, সবাই এখন ঢাকা শহরে উদ্বাস্তু। কেউ নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে শরণার্থী হয়, কেউ দেশের ভেতরেই রয়ে যায়। গ্রাম থেকে শহরে পৌঁছেই মুখ থুবড়ে পড়ে। একটাই পার্থক্য যে নিজ দেশে কোনো শরণার্থী শিবির পাওয়া যায় না। লঞ্চঘাট, স্টেশন, ফুটপাত থেকে ভাত জোগাড়ের চেষ্টা করতে হয়। ইলিশ মাছ ভাজার চমৎকার গন্ধ আসছে। মজিদের জিভে জল আসে। শৈশব, কৈশোরে মায়ের হাত থেকে ইলিশ মাছ দু-চার টুকরো ভাজা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেত। কোনো লুকানো জায়গায় বসে মনের আনন্দে খেত। আজকের দিনটিও ওর তেমন একটি ছুটির দিন। তবে যা খুশি করতে পারে স্মৃতিচারণের রথে চড়ে পেছন ফিরে যত সুখ।

https://boierhut.com/fb

একটাই অসুবিধে, বয়স হয়েছে না। এমন নির্ভাবনায় দিনগুলো যদি পার করা যেত? গ্লানিমুক্ত, ক্ষরণহীন, অপমানহীন। হবার নয়, মজিদের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে। তখন কলতলায় শোরগোল কান্নাকাটিতে চমকে ওঠে ওরা। ছুটে যায় মনু মাঝি। রিনি মাটিতে পড়ে তড়পাচ্ছে। রক্তে ভিজে গেছে জামা, মুখে গোঙানি, ওর চোখগুলো কেমন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। পানি নিয়ে ঝগড়া করতে করতে একপর্যায়ে পাশের বাসার মিতা বালতি দিয়ে রিনির মাথায় মেরে দিয়েছে। মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। মনু মাঝির বউ চিৎকার করে বিলাপ করছে। মজিদ দ্রুত বেরুতে গিয়ে দরজায় হোঁচট খায়। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠোনে নেমে আসে। চেঁচিয়ে বলে, এই তোরা রিকশা ডাক। ওকে মিটফোর্ড নিয়ে যাই। মনু মাঝি রিনিকে কোলে করে চৌকিতে এনে শোয়ায়। ভীষণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে, হাত দিয়ে চেপে রেখে কোনো কাজ হচ্ছে না। বার বছর বয়স হবে হয়তো ওর। দেখায় আরো ছোট, ক্ষীণকায় শরীর, মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ। মনু মাঝি কাঁদতে পারছে না। ওকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে, ও পাগলের মতো গামছা দিয়ে মেয়ের মাথা চেপে রেখেছে। তরকারি পুড়ে যাওয়ার গন্ধ ভাসছে বাতাসে। বারান্দার খুঁটিতে মাথা ঠুকছে মনু মাঝির বউ। মজিদ আর মনু মাঝি রিনিকে নিয়ে রিকশায় ওঠে। অনেকটা পথ আসতে আসতে রিনির জীবনীশক্তি অর্ধেক হয়ে এসেছে। ওর মাথা মনু মাঝির কোলে। পায়ের অংশ গোটানো, সেটা মজিদের কোলের ওপর। নোংরা সরু প্যাঁকাটির মতো পা। পায়ের কাদা মজিদের প্যান্টে লেগে যাচ্ছে। মজিদ জামা টেনে পা জোড়া ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে। দুপাশের লোকজন ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ মুখ ঘুরিয়ে নেয়, কারো চোখে সমবেদনার দৃষ্টি। রিকশাওয়ালা প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাড়াতাড়ি যেতে। কিন্তু বারবারই বাধা পায়, বারবারই যানজটে আটকে যায় ওর গতি।

ডাক্তারবিহীন শূন্য ইমার্জেন্সি টেবিলের ওপর শুয়ে থাকে রিনি। অ্যাসিস্ট্যান্টরা ছুটে এসে ডেটলে তুলো ভিজিয়ে রক্ত মুছিয়ে দেয়। এর বেশি কিছু করার জ্ঞান ওদের নেই। ডাক্তারদের ধর্মঘট চলছে। তাই ইমার্জেন্সিতে ডাক্তার নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মজিদ। খবরের কাগজে ও দেখেছিল ডাক্তারদের ধর্মঘটের খবর কিন্তু আজ এখানে আসা পর্যন্ত সেটা ওর একদম মনে ছিল না। তখুনি আগুনে ঝলসে যাওয়া আর একটি মেয়েকে আনা হয় ইমার্জেন্সিতে। বখাটে ছেলের প্রেমে সাড়া দেয়নি বলে সেই ছেলেটি মেয়েটির গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মজিদ তাকাতে পারে না সেদিকে। মানুষের ঝলসে যাওয়া শরীর ও কখনো দেখেনি। এখন দেখতে হচ্ছে। এই নগরে সব সম্ভব, কী নিদারুণ বিক্ষত মানুষের বিবেক। ঠাণ্ডা মাথায়, পরিকল্পিতভাবে চলছে এসব? মনু মাঝি পাথরের মূর্তি হয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রিনির রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। অপুষ্টির শরীরে কতটুকুই বা রক্ত আছে? ওর মাথা ভনভন করে। ও আর দাঁড়াতে পারছে না। দুজন কিশোরী সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, কেউ নেই ওদের পাশে দাঁড়াবার। ও ছুটে ভেতরে আসে। সব

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওয়ার্ডই খালি। রোগীরা যে যার মতো শুয়ে বসে আছে। শেষ পর্যন্ত নয় নম্বর ওয়ার্ডে ও দেখতে পায় একজন লোক জনৈক রোগীর ড্রেসিং করছে। ও ছুটে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

আপনি কি ডাক্তার?

কেন?

ডাক্তার ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দেয়। এতক্ষণের ছুটোছুটি এবং উত্তেজনায় ও ক্ষুব্ধ। এখনো রক্ত পড়া বন্ধ না হলে হয়তো রিনি মরে যাবে। আর একটি মেয়েরই বা কী হবে? ওর মাথার ভিতরে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ও চেঁচিয়ে ওঠে, আমি জানতে চাচ্ছি আপনি ডাক্তার কি না?

হ্যাঁ।

ইমার্জেন্সিতে দুজন মুমূর্ষু রোগী আছে। ওদের দেখতে হবে।

আমাদের ধর্মঘট চলছে। আমি পারব না।

আপনি তো এই রোগীর ড্রেসিং করছেন।

ইনি আমার আত্মীয়। এটা আমার হাসপাতালের ডিউটি নয়, পার্সোনাল কেয়ার।

পার্সোনাল কেয়ার হাসপাতালে নিতে পারেন না। এখানে সব রোগী আপনার কাছে সমান। আপনাকে এখন ইমার্জেন্সিতে গিয়ে রোগী দেখতে হবে।

দেখছেন আমি ব্যস্ত।

আপনি কি চান যে ঐ মেয়ে দুটি মরে যাক?

কিছু করার নেই।

ডাক্তার নির্বিকার জবাব দেয়। মেজাজ খারাপ হয়ে যায় মজিদের।

আপনি যাবেন না?

হাসপাতালের ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে আপনি চেঁচামেচি করছেন, আপনাকে আমি ঘাড় ধরে বের করে দেব।

ডাক্তার চোখ গরম করে ওর দিকে তাকালে ও ধাম করে দুটো ঘুষি লাগিয়ে দেয় ডাক্তারের চোয়ালে। অতর্কিত আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে ডাক্তার সামলে ওঠার আগেই মজিদ ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়।

আপনাকে আমি ঘাড় ধরে নিয়ে যাব।

ততক্ষণে হৈচৈ চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে ওয়ার্ডে। ছুটে আসে ওয়ার্ড বয়, নার্স, দারোয়ান এবং আরো কেউ কেউ। ডাক্তারও ততক্ষণে রুখে দাঁড়িয়েছে। অন্যরা এসে মজিদকে জাপটে ধরে। ও এক ঝটকায় ওদেরকে ছাড়িয়ে দৌড়ে ইমার্জেন্সিতে আসে। মনু মাঝি কাঁদছে।

কেমন আছে রিনি? ওর রক্ত পড়া কি বন্ধ হয়েছে?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অ্যাসিস্ট্যান্টরা চুপ। ওরা কেউ কোনো কথা বলছে না। ওর কথায় ডুকরে কেঁদে ওঠে মনু মাঝি। মজিদ রিনির কপালে হাত রাখে, এখনো গরম আছে। বুকের ওপর কান পেতে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি শোনার চেষ্টা করে, শুনতে পায় না। ওর রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। মজিদ পাগলের মতো রিনিকে নেড়েচেড়ে দেখে। ছোট পুষ্টিহীন শরীরে প্রাণের লক্ষণ অনুভূত হয় না। ও চেঁচিয়ে ওঠে, ওকি বেঁচে নেই?

অ্যাসিস্ট্যান্টরা চুপ। ওদের কিছুই বলার নেই।

আপনারা কেউ কিছু বলছেন না কেন?

একজন মুখ খোলে, এত রক্ত পড়লে কেউ কি বাঁচে?

আপনারা বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন না কেন?

কী করে? আমরা কী ডাক্তার?

নিকুচি করি ডাক্তারের।

মজিদ টেবিলের ওপর থেকে টান দিয়ে সবকিছু ফেলে দেয়। প্রথমে খাতা, বই, প্যাড, কলমদানি মেঝেতে গড়িয়ে যায়। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো দ্রুত ওগুলো তুলতে তাকে। কেউ কিছু বোঝার আগেই ও অন্যপাশে গিয়ে ড্রেসিঙের ট্রেটা ছুড়ে মারে মেজেতে। ঝনঝনিয়ে পড়ে যায় ছুরি, কাঁচি, ফরসেপ, গজ, স্পিরিটের শিশি, ওষুধের শিশি—মেঝেতে গড়াতে থাকে তরল পদার্থ, কাচের ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে থাকে মেঝেতে, পা ফেলার জায়গা নেই। ও তুলোর প্যাকেট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দরজার বাইরে ছুড়ে মারে। লাথি দিয়ে ফেলে দেয় টুল, চেয়ার।

ততক্ষণে চার-পাঁচজন লোক ওকে জাপটে ধরেছে। ছুটে এসেছে হাসপাতালের কর্মকর্তারা। সঙ্গে সেই ডাক্তার। ইমার্জেন্সির লোকেরা চেঁচিয়ে বলে, লোকটা পাগল হয়ে গেছে স্যার।

আমি পাগল হইনি। আপনাদের অবহেলায় ঐ মেয়েটি মরে গেছে। আমি এর প্রতিকার চাই।

আপনি শান্ত হোন। আপনি যা করছেন সেটাই কী প্রতিকারের পথ?

তাহলে পথটা কী বলে দিন আমাকে!

ওকে পুলিশে দিতে হবে। ও হাসপাতালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

ডাক্তার ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়।

মজিদ ওর মুখের ওপর আঙুল উঁচিয়ে বলে, আপনাকে পুলিশে ধরবে না? আপনি যে ঐ মেয়েটির মৃত্যুর জন্য দায়ী?

ও আমার পেশেন্ট নয়।

ডাক্তারের পেশেন্ট ভাগ করা থাকে নাকি?

দেখুন স্যার কেমন উদ্ধত, অসহিষ্ণু!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ডাক্তার প্রিন্সিপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রিন্সিপাল ওকে ধরে রাখা লোকদের নির্দেশ দেয় মজিদকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি রিনির বেডের পাশে দাঁড়ান। ওকে দেখে সাদা চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দেন। মনু মাঝি আর্তচিৎকার করে, মজিদ ভাই আমার কী সর্বনাশ হলো গো? আমার জমি গেছে, ভিটে গেছে, একে একে ছেলেমেয়ে চলে যাচ্ছে, আমি কেমন করে বাঁচব, আল্লাহ্ গো।

মনু মাঝি বুক চাপড়ে বিলাপ করে। ইমার্জেন্সির অ্যাসিস্ট্যান্টরা মজিদের দুই বাহু ধরে রেখেছে। ও দুকান ভরে রিনির বাপের বিলাপ শোনে। বাতাসে ভেসে আসা ডুকরে ডুকরে কান্নার শব্দ ওর কানে হাতুড়ির মতো পড়ে। ও বধির হয়ে যেতে চায়। তখন বাঁশি বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি এসে থামে হাসপাতালের চত্বরে। প্রিন্সিপাল মজিদকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। মনু মাঝি কাঁদতে কাঁদতে মজিদের কাছে এসে দাঁড়ায়, একি হলো মজিদ ভাই? আমার জন্য আপনার এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল?

ছিঃ এ কথা বলতে নেই। তোমার জন্য আমার কিছুই হয়নি মাঝি। তুমি কিছু ভেব না। আমি তো এই পারিপার্শ্বিকের গ্লানি থেকে মুক্তি চাই। তুমি মনে কিছু করো না। আমি আমার জন্যই এসব করেছি। আমি দেখতে চাই যে, কালকেতুর এই নগরে মানুষ কত নিচে নামতে পারে।

মজিদ ভাই আপনিও আমাকে ছেড়ে গেলেন?

গেলাম কোথায়? আবার তো ফিরে আসব। তুমি যাও রিনির দাফনের ব্যবস্থা করো। ওর জানাজায় থাকতে পারলাম না এটাই দুঃখ।

যখন গাড়িতে ওঠানো হয় মজিদকে তখন পোস্টমর্টেমের জন্য অপেক্ষা করছে রিনি। একটু পরে ও লাশকাটা ঘরে চলে যাবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মজিদকে পুলিশে সোপর্দ করতে পেরে আত্মতৃপ্ত। একজন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পেরেছে ওরা। প্রিন্সিপালের ঘরে তুমুল আলোচনার বিষয় মজিদ। সবচেয়ে বেশি সরব ডাক্তারের কণ্ঠ। রিনির মৃত্যু ওদের একটুও স্পর্শ করেনি। এমন মৃত্যু তো হরহামেশা দেখতে হয়। এতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু হাসপাতালে এসে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলার সাহস তো সবার থাকে না, এমন ঘটনা হরহামেশা দেখা যায় না, সে জন্য ঘটনার গুরুত্ব তাদের কাছে অপরিসীম। হাসপাতালের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করাটাই জরুরি। কালকেতুর নগরে যে কোনো ধরনের মৃত্যু সহজ এবং স্বাভাবিক। মৃত্যুর জন্য এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো গ্লানি নেই। ওরা হাঁসের মতো ডানা থেকে জল ঝেড়ে ফেলে মানবিক মূল্যবোধের সরোবরে অবগাহন করে।

থানার নির্জন প্রকোষ্ঠে হাঁটুতে মাথা রেখে বসে থাকে মজিদ। সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই প্রায়। প্রচণ্ড খিদেয় পেট মোচড়াচ্ছে, মুখে থুতু আসছে ঘনঘন। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ। দরজায় তালা। একটি মাত্র জানালা। জানালার নিচে ড্রেন, পাশে দেয়াল। কাউকে ডেকে পানি চাওয়ার উপায় নেই। তবু

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শিকে মাথা রেখে শ্যাওলা পড়া দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকে ও। মনে হয় দেয়ালের সর্বত্র গোলাকার বৃত্ত। এই গোল দাগ কিসের? শূন্যের হ্যাঁ তাই। ওর সামনে এখন প্রচণ্ড শূন্যতা। সন্ধ্যা শেষ করে রাত নামে। ওর প্রকোষ্ঠে নিকষ কালো অন্ধকার। ও জানালার শিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে নিজের মুখোমুখি হয়, আমি জানি এভাবেই চলছে চারপাশ। তবু অগ্ন্যুৎপাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় আমার। দুদিন আগে হোক পরে হোক আমি ছাড়া পেয়ে যাব। এই চরম নৈরাজ্যের মধ্যে এটাই নিয়ম, ছেড়ে আমাকে দিতে হবে। ওদের প্রয়োজনেই ছাড়বে। কিন্তু আমার মুক্তি নেই। আবার সেই পুনরাবৃত্তে প্রবেশ করতে হবে। দেয়ালের গোলাকার বৃত্তগুলোই আমার নিয়তি। এগুলো একটা রঞ্জনা, একটা সোনাবরু, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, একটা রিনি, একটা মনু মাঝি—একটা হামিদুর রহমান, একটা তারাবানু, এমন হাজার হাজার লোক। আমি কতজনের নাম করব?

আমি জানি এই খবর আমার অফিসে পৌঁছলে ওরা বলবে লোকটি এভাবেই মাথা গরম করে। ও তো আসলে একটা বেকুব। নিজের ভালোটা বোঝে না। এমন কথা আমাকে অনেকবার শুনতে হয়েছে। নিজের ভালো বোঝা কী? লুকিয়ে বউয়ের শাড়ি এনে কাউকে না দেওয়া? অফিসে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ না করা? অন্যায়ের প্রতিকার প্রত্যাশা না করা? নিজের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সৎ থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা না করা? নিজের ভালো বোঝার চেষ্টা মানে যদি এসব হয় তা হলে আমি হাজার বছর ধরে বেকুবই থাকতে চাই।

আমার জীবনে রঞ্জনা-পীড়ন। ইচ্ছে করলেই তো আমি ওকে ডিভোর্স করতে পারি। ওকে পাঠিয়ে দিতে পারি ওই ভাবির নরকে। তাতে আমি মুক্তি পাই, আমারও স্বার্থ রক্ষিত হয়। কিন্তু আমি কী করে পাষণ্ডের স্তরে নিজেকে নামিয়ে অধরামৃতের সন্ধানে পশুবৃত্তি অবলম্বন করতে পারি? তাতে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে নিজেকে খণ্ডিত মানুষের কাঠামোয় বিন্যস্ত করতে হয়। এটাই কী বেঁচে থাকার জন্য যথার্থ পথ? না, আমার তা মনে হয় না। সবাই যদি একদিকে থাকে, আমি একা অন্যদিকে থাকব, তবু মনে করব আমি যা করছি সেটাই সত্যি, সেখানে কোনো অন্যায় নেই। সে জন্য রঞ্জনার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে হৃদয়ের রক্তক্ষরণই আমার কাম্য, আমি স্ত্রীর অমর্যাদা করতে চাই না।

পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আশপাশে কেউ নেই যে একফোঁটা পানি চাইব। যারা আমাকে এখানে ঢুকিয়ে রেখে গেছে তারা জানে আমার কোনোকিছুর প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তার তোয়াক্কা করেনি। আমার ভীষণ পেসাব পেয়েছে। আমি কী করব? ঘরের কোণে বসে যাওয়া ছাড়া আমার কী উপায় আছে? পেসাবের উৎকট গন্ধ আমাকে ভয়াবহ শূন্যতায় ছুড়ে দিয়েছে। আমার হাত-পা ভেঙে আসছে, আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলে নতুন করে শক্তি অর্জন করতে পারতাম। আসলে তো আমি গণ্ডি অতিক্রম করতে পারি না। রঞ্জনা এখন কী করছে? ওকি আমার অপেক্ষায় আছে? ভীষণ অস্থির হয়ে পায়চারি করছে? যদি তাই হয় তা হলে আজ

https://boierhut.com/fb

আমার সুখের দিন। ও আমাকে বাবার মতো দেখতে পায় কেন? এই জটিল হৃদয়বৃত্তিকে আমি কী করে অতিক্রম করব? এই একটি জায়গায় আমার হৃদয় বালকের অভিমান স্ফুরিত হয়। আমি লাল ঘুড়ির সুতো-কাটা খেলায় নিজেকে মগ্ন রাখি। এই পিছুটান না থাকলে আমি যে বড় কিছু করতে পারতাম তা সত্যি নয়। এই অন্ধকার সাক্ষী, আমার কোনো মহৎ বাসনা নেই। এই অজস্র মশককুল সাক্ষী আমি কোনো বিপ্লবী নেতা হতে চাই না। আমি শুধু প্রতিকার চাই। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনকে অস্বীকার করে যারা এর পথ রুদ্ধ করে আমি তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চাই। আমি কথা বলতে চাই।

আমি বেকুব হয়ে প্রার্থনা করি আমার চারপাশের মঙ্গল, দেখতে চাই বিশাল হৃদয়ের মানুষ। সোনাবরু আত্মহত্যা করলে আমি বিচলিত হই, চিকিৎসার অভাবে কেউ মরে গেলে আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। আমি স্থির থাকতে পারি না। এমনকি বালিকা বয়সের রঞ্জনার পীড়নও আমাকে কাবু করে রাখে। আমি অনবরত পথ হাতড়াই। কিন্তু এই অসম্ভব শূন্যতার গণ্ডির বাইরে আমার তো কোনো যাবার জায়গা নেই। আমি সব জায়গায় মিস্‌ফিট।

আস্তে আস্তে নেতিয়ে আসে মজিদের চেতনা। জানালার নিচে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে ও। চেতনা বিলুপ্ত হবার আগে ও দেখতে পায় মুণ্ডুহীন কালকেতু নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ও কালকেতুর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে চায়, এই শহরের গ্লানি থেকে আমি মুক্তি চাই। কোথাও কোনো শব্দ নাই। অজস্র মশা ভনভন শব্দে ছোট ঘরটা মুখরিত করে রাখে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চন্দের সঙ্গে শারীরিক মিলনের মাস দেড়েক পর ফুল্লরা ঋতুবতী হয়। এতদিনের অভ্যস্ত এই শারীরিক প্রক্রিয়া তো নতুন নয়, তবু বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকে ও। যেন ও কৈশোরের ফুল্লরা, এখন ওর প্রথম ঋতুর কাল, ফুলে ফুলে কাঁদছে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে। মা ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বলছে, 'এটাই নারীর ধর্ম। এর মধ্যে দিয়ে নারী উর্বরা হয়। ধরণীর মতো ফসল দেয় মানবজাতিকে।' ওর মা বেশ একটু ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করতে ভালোবাসত। এখন সেই শব্দগুলো আরো ভারী হয়ে ওর মাথার ওপর পড়ছে। ও উর্বরা হলো কৈ? কোথায় ওর নারী জনমের সার্থকতা? মৃত সন্তান কোলে নিয়ে মা যেমন শোকাভিভূত হয় তেমন একটা বোধে ও আক্রান্ত হয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে। কী গভীর বিশ্বাস নিয়ে ও চন্দরকে ডেকেছিল। ভেবেছিল কালকেতুর বাইরে আর কেউ হয়তো ওকে শস্যবতী করতে পারে! কিন্তু কী হলো? কী করে এই রজঃ প্রবাহিত হলো? কেন চন্দরের বীর্য এই প্রবাহ থামিয়ে দিল না? তা হলে কী আমরা দুজনেই বন্ধ্যা? আমরা কেউ কী উৎপাদনে সক্ষম নই? আমাদের বিস্তার নেই? এই নগরীতে আমরাই নিজেদের শেষ। ভাবতে ভাবতে ফুল্লরার মাথা ধরে, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ও অসুস্থ বোধ করলে বিছানায় শুয়ে থাকে। হাত বাড়িয়ে ফোনটা বিছানায় নিয়ে আসে। ফোন ঘোরাতেই অপর প্রান্ত থেকে চন্দরের কণ্ঠ ভেসে আসে।

চন্দর, আমি ফুল্লরা।

ফুল্লরা কেমন আছ? কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে শরীর ভালো নেই?

শরীর নয়, মন ভালো নেই।

কেন মন ভালো নেই? কী হয়েছে?

হিস্‌হিস্‌ করে ওঠে ফুল্লরার কণ্ঠ। সেই কণ্ঠস্বর শুনে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকেও শিউরে ওঠে চন্দর।

শুনবে কেন মন ভালো নেই? কারণ তুমি তোমার স্ত্রীকে গর্ভবতী করতে পার, আমাকে পার না।

কী বলছ ফুল্লরা চন্দর?

আমি এর প্রতিশোধ নেব।

প্রতিশোধ?

হ্যাঁ, প্রতিশোধ। একবার ভালোবেসেছিলে কিন্তু তোমাকে বিয়ে করিনি। এবার আমার শরীর দিয়েছি, ভোগই করলে প্রতিদান দিলে না।

আমি তো চাইনি তোমার শরীর। তোমার ইচ্ছার মূল্য দিয়েছি মাত্র।

এত কথা শুনতে চাই না।

https://boierhut.com/fb

শোনো ফুল্লরা, আমি তোমাকে মা করতে না পারলে আর কেউ পারবে না। তুমি কেন বুঝতে পারছ না যে তুমি উর্বরা নও, তুমি বন্ধ্যা, পতিত।

অসহ্য। এভাবে বলবে না। মনে রেখো আমি তোমার সংসার ছারখার করে দেব।

কী বলছ তুমি?

যা বলছি সবটাই সত্যি। আমার চোখের ওপর তুমি সন্তানের পিতা হয়ে আত্মতৃপ্তিতে ঘুরে বেড়াবে এটা হবে না।

কী করবে?

তোমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ব। তুমি পথে পথে ঘুরবে।

ঠাস্ করে ফোন রেখে দেয় ফুল্লরা। রাগে, অক্ষমতায় ওর শরীর জ্বলছে। চন্দরের কণ্ঠ দুকান ভরে বাজে, তুমি বন্ধ্যা, তুমি পতিত। ও দুহাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে চায়। কৈশোরে মায়ের কোলে মুখ গুঁজলে মা ওকে পরম আশ্বাসে ঋতুবতী হওয়ার গৌরব দিয়েছিল। আজ ঋতুবতী হলে চন্দর ওকে গ্লানিতে ভরিয়ে দিল। এখন ও কোথায় মুখ লুকাবে? কার কাছে যাবে? না, আমি বন্ধ্যা হতে চাই না। ক্রোধে উন্মক্ত হয়ে ও বিছানা-বালিশ তছনছ করে, ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে কসমেটিকস ছুড়ে ফেলে দেয়। আয়না ভাঙে, গ্লাস ভাঙে, কাগজ ছিঁড়ে কুচিকুচি করে। দরজার সামনে আয়া খানসামারা জড় হয়। ঘরে ঢোকার সাহস কারো নেই, কথা বলারও না। সব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটের বদলে চোখের ঈশারায় ওরা নিজেদেরকে অনেক কিছু বোঝাতে চায়। এতকিছু তছনছ করে বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদে ফুল্লরা। আজ ওর মা নেই, সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই—কারণ ও এক রজঃস্বলা অনুর্বর নারী। ওর চারদিকে হাহাকার। প্রচণ্ড ভয়ে কুঁকড়ে যায় ফুল্লরার শরীর। ওকে কেন্দ্র করে নগরের কতকিছু আয়োজন—কত সভা-সমিতি—মানুষের ঢল—সব কেমন শূন্য মনে হয়। ভেবেছিল কালকেতু অক্ষম, ও নিজে শক্তিময়ী। কিন্তু এখন? মাথা ছিঁড়ে যেতে চায়। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায় ফুল্লরা। স্বপ্ন দেখে নগরের মানুষেরা দৈত্য হয়ে গেছে—বিশাল দাঁত এবং নখ নিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। মুহূর্তের মধ্যে ও তুলোর মতো ধুনো হয়ে যাবে। ওর পাশে কেউ নেই। কারণ ওর বিস্তার নেই। ও নিজের মধ্যে নিজেই নিঃশেষ। নগরের দৈত্যরা যখন ওর শরীরে নখর বসায় তখন এক বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় ওর। দেখতে পায় কালকেতু সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

চেঁচাচ্ছ কেন? কী হয়েছে? ঘরটা এমন লণ্ডভণ্ড কেন?

ফুল্লরা দেখতে পায় কালকেতুর চেহারায় বিরক্তি, ভুরু কুঁচকে আছে। ও ক্লান্ত।

আবারো প্রশ্ন করে কালকেতু। এমন বোকার মতো চেহারা করেছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

ফুল্লরার ঘুমের আবেশ কেটেছে, স্বপ্নের জের চলছে মনের ভেতর। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, আমি একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কালকেতুর কণ্ঠ ঝাঁজিয়ে ওঠে, রাবিশ। ঘরটা এমন করেছ কেন?

ফুল্লরা স্বপ্নের জের টেনে বলে, আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল যখন আমি ভাবলাম এই নগরীতে তুমি এবং আমি শেষ। আমাদের পরের আর কেউ থাকবে না।

কালকেতুর বিরক্তি উবে যায়। বিস্ময়ে, চেঁচিয়ে বলে, কী বললে?

ফুল্লরা একই ভঙ্গিতে বলে যায়, স্বপ্নে দেখলাম নগরে মানুষগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে আমাদের। উহ্।

ফুল্লরা অস্ফুট শব্দে দুহাতে মুখ ঢাকে।

কালকেতু বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করে, এমন দিন কখনোই আসবে না। এই নগরের মানুষেরা আমার সোনার মূর্তি বানিয়ে রাখবে।

ফুল্লরা নিজে নিজে বলতেই থাকে, তেমন দিন এলে আমি তোমার সঙ্গে ওদের হাতে আমার মরণ চাইব।

কালকেতু ফুল্লরার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আয়াদের ডেকে ঘর পরিষ্কার করতে বলে ধীরে পায়ে বারান্দায় আসে। ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরও ভয় করে। ভাবে, ফুল্লরা চরম সত্যি কথা বলেছে। কত নারীর সঙ্গেই তো মিলিত হয়েছি, কেউ গর্ভবতী হয়েছে, এমন কথা তো কারো কাছ থেকে পাইনি। তা হলে বুঝতে হবে ফুল্লরা বন্ধ্যা নয়। আমি নিজে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। না, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি নিজে কারো হাতে এই নগর তুলে দিতে চাই না। আমি একা, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ঈশ্বর।

হা-হা করে হেসে ওঠে কালকেতু। নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবার মধ্যেই তো সবচেয়ে বড় আনন্দ। ও আনন্দে চোখ বোজে। এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে জীয়নকাঠির ছোঁয়া লাগার মতো মুহূর্তে জেগে ওঠে সমগ্র চরাচর। রাজকন্যার ঘুম ভাঙে, পাখি গান গায়, ফুল ফোটে, তরুলতা আন্দোলিত হয়, হাম্বা রবে ছুটে আসে বাছুর, প্রাণিকুল প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর। কালকেতু ভেবে দেখল রূপকথার এই সময়টুকু প্রতিটি মানুষের জীবনেই সত্য। মানুষের এই সত্য সময়টুকুই তো রূপকথা—মানুষ তো এভাবেই সৃষ্টি করে নিজের আনন্দ-দুঃখ, হাসি-কান্না। কালকেতুর ঘুম পায়, পরক্ষণে ওর ঘুম ছুটে যায়। ফুল্লরা কেন আজ এমন করে তছনছ করল ঘর? ওর কিসের যন্ত্রণা? ও কি সত্য জেনেছে? কালকেতু উঠে দাঁড়ায়, রেলিঙে নিজের ভার ছেড়ে দেয়। ফুল্লরা কি জানতে পেরেছে ও নিজেও বন্ধ্যা? ওর কি তীব্র কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল যেটা ধুলোয় লুটিয়েছে? মুহূর্তে কালকেতুর সুসময় উড়ে যায়। ও দেখতে পায় ওর চারদিকে রাক্ষসখোক্কস, দৈত্যদানো, মৃত নগরী, হাড়গোড়। ইচ্ছে করে ফুল্লরাকে থেঁতলে একদলা মাংসপিণ্ড বানাতে। ও ক্রূরচৈতন্যে আবিষ্ট হয়ে ঘরে আসে। ঘর গোছানো হয়নি—আয়ারা কেউ নেই। নিশ্চয়ই ফুল্লরা ওদের কাজ করতে দেয়নি। ও এক

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শোকার্ত মানবী হয়ে বসে আছে। সে চেহারা দেখে কালকেতুর ক্রোধ দ্বিগুণ হয়। ওর মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করে, বলো তুমি কি সত্য জেনেছ?

সত্য? ফুল্লরা ভুরু কপালে ওঠায়।

কালকেতু চাপা কণ্ঠে বলে, তোমার কিসের শোক?

শোক? ফুল্লরা আবার ভুরু নাচায়।

হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে একটি নির্মম সত্য জানার জন্য তোমার এই বিশৃঙ্খল অবস্থা। এতদিন তো তুমি এই রাজত্বে সুখীই ছিলে, আজ কেন অসুখী?

সত্য কথা জানতে চেয়ো না।

ন্যাকামি করো না ফুল্লরা। আমাকে জানতেই হবে?

যদি না বলি?

পরিণতি খুব খারাপ হবে।

কী আর করবে? মানুষের শেষ পরিণতি তো মৃত্যু। এর বেশি কিছু তো আর করতে পারবে না।

তুমি কি তাই চাও?

ফুল্লরা পাগলের মতো হেসে বলে, স্বচ্ছন্দে চাই।

ও এতদূর? তারপর কণ্ঠস্বরে বিষ ঢেলে জিজ্ঞেস করে, তুমি কাকে দিয়ে পরীক্ষা করলে যে তুমি নিজেও বন্ধ্যা?

ফুল্লরা কালকেতুর প্রশ্নের জবাব দেয় না। নিজেই বাইরে গিয়ে আয়াকে ডেকে নির্দেশ দেয় ঘর পরিষ্কার করার জন্য। তারপর বাথরুমে ঢোকে। শাওয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরও ওর শরীরের আগুন নেভে না। চন্দরের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওর মাথা বিগড়ে থাকে। একটি জায়গায় চন্দরের কাছে ও হেরে যাবে তা কিছুতেই হতে পারে না। চন্দরের সুখ এখন ওর হাতের মুঠোয়। ও শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে শরীর দোলাতে থাকে। মুহূর্তে থমকে যায় ওর পা। ভাবে, কালকেতুর সুখও এখন ওর হাতের মুঠোয়। ওকে নিয়ে কালকেতুর মনে সন্দেহ ঢুকেছে। কালকেতু পুড়বে, ও ভেবে দেখল, এই পোড়া মৃত্যুর চেয়েও বেশি। কালকেতুর এখন মরণদশা। কালকেতু ওকে যদি মেরেও ফেলে ক্ষতি নেই। ও তো কালকেতুর স্বস্তি নষ্ট করেছে। পানির নিচে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। ঘণ্টা দুয়েক পর ও যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে তখন ও দেখতে পায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কালকেতু। ওর নির্দেশে ফুল্লরার জিনিসপত্র অন্য ঘরে চলে যাচ্ছে। ওর চোখে চোখ পড়তে কালকেতু চিবিয়ে বলে, আজ থেকে দুজনের বিছানা আলাদা।

ফুল্লরা নাচতে নাচতে পাশের ঘরে চলে যায়। নিজেকে খুব হালকা লাগছে।

সে রাতে ঘুমুতে পারে না কালকেতু। ফুল্লরার আচরণ থেকে ও কিছুই বুঝতে পারে না। ও যা কিছু করেছে সবটাই অনুমাননির্ভর। বিনা প্রতিবাদে ফুল্লরার পাশের ঘরে চলে যাওয়া দেখে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কালকেতুর সন্দেহ আরো গাঢ় হয়। ও ওর করোটিতে পোকার অস্তিত্ব টের পায়। নিষ্প্রাণ মানুষের মতো ও রুটিন-বাঁধা কাজগুলো করে। যেমন কাপড় ছাড়ে, বাথরুমে যায়, হাত-মুখ ধোয়, চুল আঁচড়ায়, চা খায় ইত্যাদি। কিন্তু ওর করোটি পরিষ্কার হয় না। পোকাগুলো আস্তে আস্তে এক একটি নারীতে রূপান্তরিত হয়, সেইসব নারী যাদের কালকেতু শয্যায় নিয়ে গেছে। শুনতে পায় ওরা খলখলিয়ে হাসছে, বলছে, তুমি নিজে যদি শতেক রমণী ভোগ করতে পার তবে ফুল্লরা কেন শতেক পুরুষ ভোগ করতে পারবে না। কোথায় তফাত? যদি তোমার রুচিতে না বাধে তবে ফুল্লরার রুচিতে বাধা উচিত বলে তুমি ভাবছ কেন? তোমার কেন কষ্ট হচ্ছে কালকেতু? রমণীরা হাসতে-হাসতে, নাচতে-নাচতে করতালিতে মুখর করে তোলে কালকেতুর করোটি। ও উন্মাদের মতো পায়চারি করে তারপর নিজের অফিস ঘরে এসে বসে। টেবিলের ওপর পা তুলে দেয়। মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে থাকে। ও পা দিয়ে টেবিলের নথিপত্র ঠেলে ফেলে দেয়। মেঝেতে গড়ায় পররাষ্ট্র দপ্তরের জরুরি নথি, নগরের বুদ্ধিজীবী কর্তৃক তৈরি সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট, সাহায্যদাতা দেশগুলোর চিঠিপত্র, এক কথায় নগরের ভূত-ভবিষ্যৎ। পাশের ঘরে অবস্থান করছে দপ্তরের লোকজন। সেদিকে কালকেতুর নজর নেই। ও বাতি বন্ধ করে দেয়। টেবিলের ওপর খুলে রাখে সোনার ফ্রেমের চশমা, অনামিকায় জ্বলজ্বল করে হীরের আংটি। কালকেতু ভিনদেশের দামি সিগারেট জ্বালায়। নীল ধোঁয়া উড়ে উড়ে ফেরে ঘরের ভেতর। মনে পড়ে অনেকদিন আগে ভাঙ খেয়ে শিকার করতে গেলে ওর করোটিতে মায়া হরিণ চিত্রিত হয়েছিল। নীল ধোঁয়ার ওপর থেকে ফুটে উঠেছিল মায়া হরিণের শরীর। ও বিভিন্ন মুখভঙ্গি করে ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবে আর একটা সিগারেট জ্বালায়, ওর মুখজুড়ে স্বেদবিন্দু, কিন্তু না মায়া হরিণ জন্মায় না। ওর মুখে কষ জমে, জিভ তেতো হয়ে ওঠে, অ্যাশট্রে ভরে যায় সিগারেটের টুকরোয়, ঘরে ধোঁয়া ভেসে বেড়ায়, বাইরে মানুষের পদশব্দ। রাত বাড়ে। কালকেতু শোবার ঘরে যেতে পারে না। রাত বাড়ে, কালকেতুর ভাত খাওয়া হয় না। মাঝরাতে কালকেতুর অফিস ঘরের সামনে তীরন্দাজ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভিড় জমায়। তারা খবর বয়ে এনেছে।

কালকেতুর জন্য দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ? কালকেতুর আবার দুঃসংবাদ কী? ও তো কখনো দুঃসংবাদ শোনেনি। দুঃসংবাদ শোনার জন্য ও এই নগরীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়। এখানে এমন কেউ নেই যে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে, ওর নির্দেশকে উপেক্ষা করতে পারে। এই নগরী ওর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। তীরন্দাজ বাহিনী ওর আজ্ঞাবহ। তবে কেন দুঃসংবাদ শুনতে হবে? কারা এই অনাসৃষ্টির মূলে?

মুহূর্তে ওর করোটি থেকে ফুল্লরা সংক্রান্ত যাবতীয় ভাবালুতা দূর হয়ে যায়। ও মেরুদণ্ড সোজা করে বসে। জানালা খুলে দিলে ঘর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সরে যায়। ওর সামনে সবকিছু পরিষ্কার

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এখন। কোথাও ধোঁয়ার কুণ্ডলী সরে যায়। ওর সামনে সবকিছু পরিষ্কার এখন। কোথাও ধোঁয়ার আচ্ছন্নতা নাই। ও স্পষ্ট বুঝতে পারে যে করোটিতে মায়া হরিণ একবারই জন্মায়, বারবার নয়। ও দেখতে পায় ওর তীরন্দাজ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সন্ত্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও ওদের চোখে বিজয়ের উল্লাস আছে। ওরা ভীত কিংবা পরাজিত নয়।

ও ধীর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছিল?

তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান উত্তর দেয়। বলে, তীরন্দাজ বাহিনীর একদল লোক আপনাকে উৎখাত করে এই নগরের ক্ষমতা দখলের জন্য অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিল। আমরা খুব সফলতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছি। ওদেরকে খতম করা হয়েছে।

কালকেতুর কণ্ঠ ক্রূর, ওরা সংখ্যায় কতজন?

এক হাজার বাইশজন।

আপনারা কি মনে করেন ওদের সমর্থনে আরো কেউ আছে?

থাকতে পারে।

যাকেই সন্দেহ হবে তাকেই পিঁপড়ার মতো পিষে ফেলুন। একটিও যেন জীবিত না থাকে।

তাই হবে।

ক্ষমতালোভী কুকুরদের এটাই উপযুক্ত শাস্তি।

কালকেতুর ক্রূর কণ্ঠে সীমাহীন নির্মমতা, বুলেটের মতো বুকে বিদ্ধ হয়। বলে, কাল নগরীতে কার্ফ্যু দিন। নগরের চত্বরে বিছিয়ে রাখুন ওদের লাশ। সাধারণ লোকে বুঝুক যে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কী। যাদের আমি কড়ে আঙুলের উপযুক্ত মনে করি না তাদের কত সাহস যে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়? আপনারা আসুন।

গভীর রাতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যায় কালকেতুর অনুগত বাহিনী। বুটের শব্দে প্রকম্পিত হয় নগরী। নগরের অধিবাসীরা যারা জেগেছিল তারা জানালা খুলে রাস্তায় তাকায়। বুঝতে চায় কী হয়েছে? কিন্তু না, ওদের বোঝার কোনো উপায় নেই। তীরন্দাজ বাহিনীর অনেক কিছুই সাধারণ মানুষের বোঝার অগম্য।

সে রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারে না কালকেতু। খটখট শব্দে পায়চারি করে বারান্দায়। ফুল্লরার মুখ শুকনো। সন্ধ্যারাতে ওর যে হৃদয়ে প্রজাপতির রং ছিল, এখন সেখানে শঙ্কিত ছায়া। বিদ্রোহ দমন হয়েছে শুনে ও কিছুটা আশ্বস্ত হয়।

ফুল্লরা কালকেতুর কাছে এসে দাঁড়ালে কোনো প্রশ্নের অবকাশ দেয় না কালকেতু। শুধু বলে, সব ঠিক হয়ে গেছে। ঘুমুতে যাও। আমরা নিরাপদ। কালকেতু আবার শব্দের ওপর জোর দিয়ে কথা বলে। ও জানে, বর্তমানে ফুল্লরা নগর ব্যবস্থার অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। ওকে এখান থেকে সরিয়ে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রাখলে কালকেতুর সামাজিক ক্ষতি। ও চায় না কোনো কারণে সাধারণ মানুষের কাছে ওর মুখ ছোট হোক। তার জন্য প্রবল আত্মক্ষয় মেনে নিতে ও রাজি।

ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে ফুল্লরা আবার পুলকিত হয়। বিড়বিড়িয়ে বলে, চন্দর আমি তোমার সুখ কেড়ে নেব। কালকেতুর ক্ষমতার ওপর আঘাত এলে কী হবে যতক্ষণ টিকে আছি ততক্ষণ সে ক্ষমতা দিয়ে তোমার জীবনে কাঁটাতারের বেড়া দেব আমি।

গভীর তৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়ে যায় ফুল্লরা। কালকেতু জেগেই কাটিয়ে দেয়। কখনো বারান্দায়, কখনো ঘরে, কখনো অফিসে, কখনো বাগানে বেড়িয়ে আসে। আজ ওর চিত্ত বড় চঞ্চল। ও দেখতে পেল সূর্যোদয় ঠিকমতো হলো না, আকাশে মেঘ। শুধু আলো ফুটেছে, রোদ নেই।

সকালের আকাশে শুধু মেঘ নয়, ঝড়ো হাওয়াও, চারদিক থমথমে। রাস্তা জনশূন্য। কেবলমাত্র তীরন্দাজ বাহিনীর গাড়ি চলছে। ওরা নগরের নিরাপত্তার জরুরি কারণে ঘোরাফেরা করছে। গাড়ি করে লাশ এনে প্রধান চত্বর ভরে তুলেছে। নগরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো পাহারা দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ লুকিয়ে ছাপিয়ে আড়ালে থেকে বোঝার চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যাপারটা কী তা বুঝতে পারছে না। দু-একজন রাস্তায় নেমেছিল, তাড়া খেয়ে আবার ঘরে উঠেছে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে তীরন্দাজ বাহিনীর তীর। দুপুরের পর থেকে কালকেতুর পরিষদ সদস্যদের গাড়ি পতাকা উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। জরুরি সভা ডেকেছে কালকেতু। সবাইকে উপস্থিত হতে হবে সে সভায়। কালকেতুর অফিসে সভা। ও উজ্জ্বল রঙের সাফারি পরে এসেছে। মুখে উৎফুল্ল হাসি। কাউকে বুঝতে দিতে চায় না যে সে হাসির অন্তরালে ভয় আছে। সে ভয় ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ও তো এমন ঘটনা আশা করেনি, এমনটি হবে ভাবতেই পারে না। এখনো ওর বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তীরন্দাজ বাহিনীর মধ্যে এমন একটি অবিশ্বাস্য কাজ সংঘটিত হয়েছে। ও ঘনঘন সিগারেট টানে।

বিচারপতি রমানি প্রথম কথাটা বলে। বলে কালকেতুর খুব আপন লোক ভাঁড়ু দত্তকে। গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিচারপতি রমানি হাসতে হাসতে রসিকতা করে। ভাঁড়ু দত্ত চোখ গোল করে শোনে। এমন তীক্ষ্ণ রসিকতার জবাবে কী বলা যায় ভেবে পায় না। বিচারপতি রমানি ভাঁড়ু দত্তের ঘাড়ে হাত রাখে, কি ঠিক বলিনি? ও দ্বিতীয়বার কথাটা উচ্চারণ করে, গ্রেট আর্মি অব কলিঙ্গ হ্যাজ কনকয়ার্ড কলিঙ্গ।

ভাঁড়ু দত্ত কথাটা মুখস্থ করতে করতে ভেতরে চলে যায়। ওর পায়ে তাড়া। দ্রুত কালকেতুর কাছাকাছি পৌঁছুতে চায়। একের পর এক গাড়ি এসে থামে। একে একে নামে সবাই। বিচারপতি রমানি সবার কাছেই এক কথা বলে। প্রত্যেকে শুনে বেশ মজা পায়। কেউ কেউ রমানির কানের ফিসফিসিয়ে বলে, রিয়ালি ইটস এ গ্রেট ভিক্টরি। আপনি চমৎকার আবিষ্কার করেছেন। তবে আর একটু বাড়িয়ে বললে বলা যায়, গ্রেট আর্মি অব কালকেতু হ্যাজ কনকয়ার্ড কালকেতু।

https://boierhut.com/fb

হা-হা করে হেসে ওঠে রমানি। সবাই আচমকা হাসিতে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। এত জোরে এখানে কেউ আসে না। অবশ্য ওরা এখনো ভবনের বাইরে। ভবনের ভেতরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিজেদের সংযত করবে। এর মধ্যে বিচারপতি রমানি কিছুটা সাহসী। তার সাহসের সঙ্গে গোঁয়ার্তুমি নেই। তার ভারসাম্য হয়, বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটেনি রমানির ক্যারিয়ারে। আজ ও বেশ সুর করে আওড়াতে থাকে, গ্রেট আর্মি অব কালকেতু।

বিশাল কক্ষে সভা। তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধানরা গম্ভীর মুখে বসে আছে। তার চাইতেও বেশি গম্ভীর কালকেতু, যেন চেহারায় খেলছে ইস্পাত দৃঢ় কাঠিন্য। জলদ গম্ভীর স্বর গমগম করে কণ্ঠে। কালকেতু তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বলে, একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে তারা। কলিঙ্গবাসী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই নগর প্রতিষ্ঠা করেছি আমি। নগর রক্ষার প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য ছুটে যাই সব বড় বড় দেশের কাছে। নগরের উন্নয়নের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করি। আর আমাকে কিনা উৎখাতের ষড়যন্ত্র? এইসব বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কি হতে পারে? আমার তীরন্দাজ বাহিনী ওদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। কলিঙ্গ রক্ষা পেয়েছে।

কালকেতুর বক্তব্য শেষে যখন টুঁ শব্দটি নেই তখন বিচারপতি রমানি সাহস করে দাঁড়িয়ে কালকেতুর বক্তব্যের সমর্থন করে বলে, ঠিকই বলেছেন মাননীয় নগর অধিপতি। গ্রেট আর্মি কলিঙ্গ হ্যাজ কনকয়ার্ড কলিঙ্গ।

কালকেতু কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রবল করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সভাকক্ষ। পরিষদ সদস্যরা তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধানকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য ছুটে যায়। ভাঁড়ু দত্তের ভীষণ উচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় কালকেতুর হৃদয়। কে আগে করমর্দন করবে সে দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখে কালকেতু। আর ভাবে, এই নগরীতে ওর অবস্থান আমৃত্যু। কারো সাধ্য নেই যে ওকে এই আসন থেকে নড়ায়।

সভাশেষে পরিষদ সদস্যরা দল বেঁধে নগর চত্বরে লাশ দেখতে যায়। প্রথমে চমকে ওঠে ভাঁদু দত্ত। লাশের মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে আছে ওর ভাইপো সমিত, নিষ্পাপ চেহারা, বোজা চোখ, শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন আছে বলে মনে হয় না। ভাঁড়ু দত্ত মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কাউকে বুঝতে দিতে চায় না যে, ওর ভাইপো ষড়যন্ত্রকারীদের একজন। কবে, কীভাবে ও ভেতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে জানতে পারেনি ভাড়ু দত্ত। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করে। জানবে কী করে? ও কি নিজের বাইরে আর কারো খোঁজ নিয়েছে? মন্ত্রিপরিষদের নিজের অবস্থা ঠিক রাখার জন্যই তো ওর রাতদিন ব্যয় হয়। ভাঁড়ু দত্ত একটু অস্বাভাবিক দ্রুততায় অন্য পাশে গিয়ে মনোযোগ নিয়ে লাশ দেখে। ওর ঘাড় ওঠাতে ভয় হয়। পাছে অন্য কেউ ওর চোখের জল দেখে। একই অবস্থা হয় রমানির। পাশের বাড়ির ছেলেটি লাশের মধ্যে শুয়ে আছে। ওর বাবা স্কুল-শিক্ষক। কষ্টে ছেলেকে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মানুষ করেছে। ছেলেকে নিয়ে তার বেশ আকাঙ্ক্ষা ছিল। মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে অবশ্য রমানি ওদের আর কোনো খোঁজ রাখেনি। ফলে সময়ের এই ব্যবধানে ছেলেটি বিদ্রোহী হয়েছিল, রমানি জানতেও পারেনি। রমানি নিজেকে তিরস্কার করে, কী মূর্খের মতো বসবাস। কাছের মানুষের খোঁজটিও রাখতে পারে না। রাখবে কী করে? মন্ত্রিপরিষদে টিকে থাকার জন্যই তো সময় দিতে হয় অনেক। বাকি সময়টুকু নিজের পড়াশোনা করা। রমানি মনে মনে অনুতাপে দগ্ধ হয়। নিজের মূর্খতার জন্য প্রচণ্ড রাগ হয়। ও চারপাশ ঘুরে এসে আবার পাশের বাড়ির ছেলেটির কাছে দাঁড়ায়। ওর নাম মুত্তাকিন। ফার্স্ট ডিভিশনে পরীক্ষাগুলো পাস করেছিল। পরীক্ষায় পাস করে ওর বাসায় মিষ্টি দিয়েছিল, ওকে সালাম করেছিল। ও ভুলে যায় অতীত, রমানি বর্তমান আঁকড়ে ধরে। ওর চোখের সামনে এ ছেলেটি একজন বিদ্রোহী, যে কালকেতুকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। রমানি কোনোদিন বিদ্রোহী দেখেনি। মুত্তাকিনকে দেখে ওর তৃষ্ণা মেটে না। ও মুত্তাকিনের কাটা কপাল, উপড়ে-তোলা চোখ এবং রক্তমাখা শরীর দেখে। কত দ্রুত, কত অল্প সময়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে মুত্তাকিনকে। ওর অপরাধ, ও পরিবর্তন চেয়েছিল—হয়তো ব্যবস্থার পরিবর্তন, কিংবা মানুষের পরিবর্তন। রমানি জানে মানুষের পরিবর্তন হলেই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় না। কারণ রাজা যায়, রাজা আসে। ব্যবস্থার পরিবর্তন সহসসাধ্য নয়, তার জন্য সময় লাগে, রক্ত লাগে।

কী ব্যাপার আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, চেনেন একে? ভাঁড়ু দত্ত রমানিকে প্রশ্ন করে। ওর চোখে এখন জল নেই। ও নিজেকে সামলে নিয়েছে। রমানি উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। ভাঁড়ু দত্ত পথ আগলায়, বললেন না চেনেন কি না?

রমানি মিথ্যে বলতে পারে না। লাশের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলা কঠিন, কাঁপা গলায় বলে, ওর বাবা আমার প্রতিবেশী।

ও তাই? ভাঁড়ু দত্তের চোখ নেচে ওঠে। তা হলে আপনি হয়তো কিছু ক্লু দিতে পারবেন যে এই ষড়যন্ত্রের উৎস কোথায়?

রমানিও বাঁকা চোখে তাকিয়ে কণ্ঠ উঁচু রেখে জবাব দেয়, উৎসের খবর আমার দিতে হবে কেন? ডিফেন্স-ইন্টেলিজেন্সের লোকেরাই বের করে ফেলবে। আপনার কেউ পরিচিত আছে নাকি?

না।

ভাঁড়ু দত্ত সহজ গলায় বলে। ওর গলা কাঁপে না, চোখের পাতা নত হয় না। ও মুখের দিকে তাকিয়ে রমানি বুঝতেই পারে না যে, এখানে ওর কেউ আছে। ভাঁড়ু দত্ত শক্তিধর পুরুষ। অবলীলায় হজম করতে পারে বিষ।

রমানির মাথা কেমন ঝিমঝিম করে। ও আর দাঁড়াতে পারে না। ঝড়ো হাওয়ার স্পর্শে ওর শরীর শিরশির করে। মাথার ভেতর কটকট শব্দ হচ্ছে। ও যুক্তিবাদী লোক, ওর কাজ মগজ এবং বুদ্ধির

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সঙ্গে, তবু আজ আবেগ ওকে তাড়িত করছে। ভাবালুতা পেয়ে বসেছে ওকে। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে হয়তো কেঁদেই ফেলবে ও।

পাশ থেকে রুদ্র মাহমুদ ওর হাত ধরে টান দেয়।

যাবেন না? এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে, এসব কী দেখা যায়?

রমানির ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের ঝিলিক খেলে যায়, তবু আমরা দেখছি এবং দাঁড়িয়ে আছি।

চলুন যাই?

আপনার পরিচিত কেউ নেই এখানে?

রমানির প্রশ্নে চমকে ওঠে রুদ্র মাহমুদ। আস্তে করে বলে, আছে। দূরসম্পর্কের আত্মীয়। খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল ও। ওর বাবা তো আমার কাছে আসবে। কী যে জবাব দেব।

এই একই সমস্যা আমারও। প্রতিবেশীর ছেলে। ভদ্রলোককে কী যে জবাব দেব।

রুদ্র মাহমুদ হাঁটতে হাঁটতে বলে, এই লাশের মধ্যে কমবেশি অনেকেই আমাদের পরিচিত। সবচেয়ে বেশি স্যাড ভাঁড়ু দত্ত।

কেন? ভাঁড়ু দত্তের কেউ আছে নাকি এখানে?

বলেন কী? আছে মানে? ওরই তো সবচেয়ে কাছের লোক। একদম আপন ভাইয়ের ছেলে।

মাই গড!

রমানির কণ্ঠ থেকে অস্ফুট আর্তনাদ বেরোয়।

কী হলো আপনার?

রুদ্র মাহমুদ বিস্মিত হয়।

রমানি স্বাভাবিক গলায় বলে, কিছু না। শুধু বলতে চাই, জয় কালকেতু।

জয় কালকেতু।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে রুদ্র মাহমুদও ওর সঙ্গে গলা মেলায়। ওরা তখন নিজেদের গাড়ির কাছে চলে এসেছে। আশপাশে তীরন্দাজ বাহিনীর লোকরা ছাড়া আর কেউ নেই। নগরীতে তখনো কার্ফ্যু। আকাশে শকুন উড়ছে। উড়ন্ত শকুন দেখতে দেখতে ঘরে ফেরে রমানি।

অবসন্নের মতো শুয়ে থাকে। দুবার লেবুর শরবত খেয়েছে। পেটে প্রচণ্ড খিদে। কিন্তু খাবার কথা চিন্তা করলেই বমি আসছে। দৌড়ে বাথরুমে যায়। মুখভর্তি থুতু উঠে আসে। ভেবে দেখে যে গত পাঁচ বছরেও রমানি অসুস্থ হয়নি। আজ এমনকি হলো? মানুষটার নার্ভ শক্ত বলেই তো ও জানে।

অনেক রাতে রমানি কিছুটা সুস্থ বোধ করে। শরীরের ঝিমঝিমানি কমে যায়, মাথার ভার নেমে যায়। মুখে আর থুতু ওঠে না। স্ত্রী টেবিলে ভাত দিলে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খায়। লম্বা

https://boierhut.com/fb

একটা ঢেঁকুর তুলে ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ভাত খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় না যাওয়া ওর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। তাই বারান্দায় কিছুক্ষণ পায়চারি করে। স্ত্রী বসে আছে চেয়ারে। বারবার বলা সত্ত্বেও ঘুমুতে যায়নি। গভীর রাতের আকাশ আজ অন্যরকম মনে হয় রমানির কাছে। অন্ধকারে জ্বলে থাকে অসংখ্য নক্ষত্র, নক্ষত্রের আলো চুইয়ে পড়ে রমানির বারান্দায়। ও তখন স্ত্রীকে বলে, তুমি শুয়ে পড়। আমার কিছু কাজ আছে।

স্ত্রী অনুযোগ করে, মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। কাজ কাল করো।

না আজই।

রমানি জোর দিয়ে বলে। তারপর নিজের পড়ার ঘরে ঢোকে। স্ত্রীও পিছু পিছু আসে। টেবিলে বসে খসখস করে পদত্যাগপত্র লেখে। কালকেতুর পরিষদে ও আর সদস্য থাকবে না। স্ত্রী জানতে চায়, কেন ছাড়ছ?

লেখা শেষ করে রমানি মুখ তোলে। বলে, একটাই কারণ।

আবার চুপ করে থাকে। স্ত্রী উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কী কারণ?

রমানি শান্তস্বরে বলে, মুত্তাকিনের মুখ।

মুত্তাকিনের মুখ? কোন মুত্তাকিন? পাশের বাসার শিহাবুদ্দীনের ছেলে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। যে মুখ থেকে চোখ উপড়ে ফেলা হয় তাদের সঙ্গে আমি কী করে থাকি?

রমানি উদ্‌ভ্রান্তের মতো কথা বলে দ্রুত পায়ে আবার বারান্দায় আসে। স্ত্রীর বিস্ফারিত দৃষ্টি ওকে স্পর্শ করে না। তীব্র যন্ত্রণায় ওর পারিপার্শ্বিক অবলুপ্ত হয়ে যায়।

স্ত্রী বিড়বিড় করে, আমরা কেউ কি জানি আমাদের কার চোখ কখন উপড়ে যাবে?

পরদিন কার্ফ্যু তুলে নেওয়া হয়। নগরের চত্বর উন্মুক্ত। একটি বিশেষ সীমানা টেনে দেওয়া হয়েছে। তার বাইরে দাঁড়িয়ে নগরবাসী দেখুক যে ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি কী। মানুষ স্রোতের মতো বয়ে আসে। কেউ হাঁটে না। একে অপরের গায়ের ধাক্কায় এগোয়। বাবা-মা-ভাইবোন আত্মীয়স্বজনের চোখ ভিজে ওঠে মাত্র। কেউ জোরে কাঁদতে পারে না। লাশ দেখার জন্য ঘণ্টা দুয়েক মাত্র সময়। কেউ দেখতে পায়, কেউ দেখতে পায় না। দূরে ভিড় জমিয়ে রাখে।

আজকের আকাশ স্বচ্ছ। মেঘ নেই। বাতাস নেই। দিন ঝকঝকে। শকুনের কর্কশ কণ্ঠের ডাক ভেসে আসে উঁচু থেকে। তীরন্দাজ বাহিনী লাশ পাহারা দিচ্ছে। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু পচা গন্ধ আসছে। মানুষের শরীর তো। গন্ধ তো ছড়াবেই। পাথর হলে না হয় গন্ধ ছড়াতো না। বিশাল ট্রাক আসে। লাশ তুলে নেওয়া হবে সৎকারের জন্য। জনসাধারণকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ তবু নড়ে না। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে। আত্মীয়স্বজনদের কাছে কোনো লাশ ফেরত দেওয়া হয় না। যারা নগরের বাইরে আছে তারা জানতেও পারে না খবর। এভাবে একসময় পরিষ্কার হয়ে যায় নগর চত্বর।থানায় বসে এসব খবর পায় মজিদ। বুঝতে পারে না এই লাশ

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রদর্শনীর মানে কী? ওরা কারা? কারা কাদের মারল? সবটাই তো একতরফা, ক্ষমতার লড়াই। কোনো তফাত নেই। নিজেরাই নিজেদের লোকদের হাতে নিহত হয়েছে। থানায় যারা কাজ করছে ওদের চেহারায় আতঙ্ক, মুখ শুকনো। মজিদ ভেবে দেখল এই মুহূর্তে ওর কোনো ভয় নেই। কারণ যারা ক্ষমতার লড়াই করছে ও তাদের অংশীদার নয়।

পরক্ষণে থমকে যায় ও। না, ওর চিন্তা বোধহয় ঠিক নয়। এই নগরের প্রতি পদক্ষেপে গর্ত। যে কেউই কোনো কারণ ছাড়া সে গর্তে পড়ে গিয়ে তলিয়ে যাবে। যেভাবে রিনিরা, ডেজিরা তলিয়ে যায়।

১৫

তিনদিন পর বাড়ি ফিরে আসে মজিদ। থানা থেকে ছেড়ে দিয়েছে ওকে। কেন ছাড়ল তার ও কিছুই জানে না। জানতেও চায় না। এই নগরীতে এমনই হচ্ছে। কেন ধরা হয় এবং কেনই বা ছাড়া হয় তার অনেক কিছু জানা যায় না। আবার দেখা যায় বড় বড় অনিয়ম করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে অপরাধী। আইনের দণ্ড ওদেরকে স্পর্শ করতে পারে না।

যাক গে, থানা থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে ভালোই লাগছে মজিদের। তবু তো এই নগর ওদের নিজস্ব। ও একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ে। মন্টির কথা খুব মনে হয়। বাড়ি ফিরলে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রঞ্জনা। বাসায় প্রতিবেশীরা ভিড় জমিয়েছে। রঞ্জনাই ওদেরকে খবর দিয়েছে। সবাই ওকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। রঞ্জনা জোরে জোরে বলতে থাকে, আমি ভেবেছি তীরন্দাজ বাহিনী বুঝি তোমাকেও মেরে ফেলেছে।

মজিদ মৃদু হাসে।

মিসেস আতিক বলে, এই নগরের ওপর দিয়ে তিনদিন যা গেল।

তিনদিন বলছেন কেন? যেন আমরা তিন যুগ পেরিয়েছি।

কত মায়ের কোল খালি হলো, কত মেয়ে স্বামী হারাল।

থাক এসব কথা আলোচনা না করাই ভালো। দেয়ালেরও কান আছে।

আসলেই। আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

যে যখন কথা বলে মজিদ তার দিকেই তাকায়। ওকে কেন্দ্র করে মানুষগুলো এ বাড়িতে জড় হয়েছে। ও কাউকে চেনে, কাউকে চেনে না তাতে কিছু এসে যায় না। ওরা ওর জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছে এটুকুই যথেষ্ট।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমাদের এখন যাওয়া উচিত। মজিদ সাহেব ক্লান্ত। বিশ্রাম নিন।

যে কথাটি বলে মজিদ তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। লোকটির সঙ্গে ওর বলতে প্রায় দেখা হয়। তেমন কথা হয় না। কেমন আছেন, ভালো আছি পর্যন্ত। আজ ওকে খুব আন্তরিক মনে হল। হয়তো লোকটি মজিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মজিদের বাড়িআলা কাশেম সাহেব জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় ছিলেন?

থানায়।

ধরে নিয়ে গিয়েছিল বুঝি? যাক তবু রক্ষা যে প্রাণে মেরে ফেলেনি। ঠিক আছে আমরা যাই। আপনি বিশ্রাম নিন। আপনার স্ত্রী তো প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল।

একে একে সবাই চলে যায়। কাশেম সাহেব জানতে চাইল না ওকে কেন থানায় নেওয়া হয়েছিল। তীরন্দাজ বাহিনীর এই কথার জের ধরে সে একটা সহজ সমাধান দিয়ে দিল। মজিদ অবসন্ন বোধ করে। ও একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল এ কথা কেউ আর জানল না। এভাবেই ওর নিজের ঘটনা আড়াল হয়ে গিয়ে কালকেতুর ঘটনা ওর জীবনে প্রধান হয়ে ওঠে। এভাবেই কালকেতু এই নগরের মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। বেতের চেয়ারে বসে মজিদ জুতো-জামা খোলে। মন্টিকে কাছে টেনে চুমু খায়, বুকে জড়িয়ে ধরে। কাজের মেয়েটাকে এক গ্লাস পানি আনতে বলে। রঞ্জনা কাছে এসে বসে। নরম স্বরে বলে, তোমাকে মারেনি তো?

না। শুধু আটকে রেখেছিল।

কোথা থেকে ধরে নিয়ে গেল? রাস্তা থেকে?

হ্যাঁ।

মজিদ রঞ্জনার কাছে ওর ঘটনা বলার উৎসাহ পায় না। ওর ঘুম পাচ্ছে। আসলে যে কাজটি ও করেছে তার জন্য রঞ্জনা ওকে সহানুভূতি জানাবে না, বলবে না যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তুমি ঠিক করেছ। কাজের মেয়ে পানি আনলে ও একটু একটু করে পানি খায়, যেন চা খাচ্ছে।

রঞ্জনা বলে, এই তিনদিন কি যে কষ্ট গেছে আমার। শুধু ভেবেছি তুমি মরে গেলে আমার যে কি হবে?

মজিদের অবসন্নতা কাটে না। ও বুঝতে পারে যে রঞ্জনা নিজের জন্য কেঁদেছে নিজের জন্য ভেবেছে। আসলে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ওকে কষ্ট দিয়েছে। এই কষ্ট এই নগরের সব মানুষেরই আছে। মজিদের জন্য রঞ্জনার দরদ কি একদম কৃত্রিম? থাক, এসব ও ভাবতে চায় না। এই প্রথম রঞ্জনা ওর শার্ট খুলে দিতে চায়, জুতোও।

মজিদ বাধা দেয়, থাক আমি পারব। অন্য কেউ আমার এসব করলে আমার অস্বস্তি হয়।

আমি বুঝি অন্য কেউ?

অভিমানে রঞ্জনার ঠোঁট স্ফুরিত হয়।

https://boierhut.com/fb

মজিদ উত্তর দেয় না। সোফার পেছনে মাথা হেলিয়ে দেয়। এতদিন পর রঞ্জনার এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। এইসব বোঝা রঞ্জনার বোধের অগম্য।

তোমার জন্য একটু শরবত আনি।

রঞ্জনা চলে যায়। মজিদ বাথরুমে ঢোকে। প্রচুর পানি দিয়ে গোসল করা দরকার। গায়ে ধুলোর আস্তর পড়েছে। এতক্ষণে মনে হয় ওর শরীর থেকে দুর্গন্ধও আসছে। ছিঃ ছিঃ এই গন্ধ নিয়ে ও এতগুলো মানুষের সামনে দাঁড়িয়েছিল। গায়ে পানি ঢালতেই ওর মাথা ঠাণ্ডা হয়। পানির স্রোতের সঙ্গে নতুন চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন করে। ও ভাবে, এই নগরীতে তীরন্দাজ বাহিনীর প্রয়োজন কী? এই এতটুকু একটা জায়গায় ওদের আলাদা করে পোষার জন্য নগরের রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয় হয়। বিনিময়ে কী পায় নগরবাসী? ওরা তো ক্ষমতার লোভে নিজেরা নিজেদের মারছে। ওর মনে হয় অধ্যাপক চন্দর কয়েক বছর আগে এ ধরনের কিছু কথা বলেছিল। কথাগুলো আরো গভীর তাৎপর্যবহ। ও আজ বিকেলেই চন্দরের ওখানে যাবে। চন্দর ওর কলেজ-জীবনের বন্ধু। অনেক দিন দেখা নেই।

ও শরীরের পানি না মুছে লুঙ্গি পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। বুক-পিঠ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, চুল থেকেও। রঞ্জনা তোয়ালে নিয়ে আসে।

মুছবে না?

না।

কেন?

ভালো লাগছে।

রঞ্জনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মজিদ বৈঠকখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর শরীরে পানি এবং খোলা বাতাসের স্পর্শ। ও রঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে যে, রঞ্জনা খুব অসহায় বোধ করছে। ও যেন এক নতুন মানুষ দেখছে।

নাও শরবত খাও।

ও হাত বাড়িয়ে গ্লাস নেয়। রঞ্জনা মৃদু হাসে। সে হাসি ওকে রহস্যময়ী নারী করে তোলে। যেন কোনো এক বিপর্যয়ের ফাঁড়া কেটে যাবার পর রঞ্জনার বয়স বেড়েছে, ও পারিপার্শ্বিক বুঝতে পেরেছে। অবোধ রঞ্জনার ব্যাকুলতা উপভোগ করে মজিদ। পরমুহূর্তে ওর বুক মুচড়ে ওঠে। হায় আবার কালকেতু। এই ঘটনাটি না ঘটলে রঞ্জনা কোনোদিনই হয়তো মজিদকে এত আপন ভাবতে পারত না। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, জয় কালকেতু।

কী ভাবছ?

রঞ্জনা ওর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

কিছু না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তুমি জানি কেমন করছ? তোমার কি কিছু হয়েছে?

না, কিছু হয়নি।

রান্না হয়ে গেছে। তোমাকে খাবার দেই। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো।

তাই দাও। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

বুঝতে পারছি থানায় তোমার ঘুম হয়নি।

ঠিক ধরেছ। বসে বসে কি ঘুমোন যায়। মন্টি কই?

ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।

ভালোই হয়েছে, তুমি খাবে না?

আমার তো গোসল হয়নি।

তুমি গোসল করে নাও। একসঙ্গে খাব।

ঠিক আছে, আমি পাঁচ মিনিটে গা ভিজিয়ে নিচ্ছি।

রঞ্জনা খুশি হয়ে চলে যায়। কাজের মেয়েকে টেবিলে খাবার দিতে বলে। ওর এই চঞ্চলতা মজিদকে মুগ্ধ করে। স্ত্রী বন্ধুর মতো। আবেগে-সোহাগে, বুদ্ধিতে-পরামর্শে দুজনে দুজনকে ভরিয়ে রাখতে না পারলে স্বামী-স্ত্রীর সংসার কি? রঞ্জনা কি এখন ওর জীবনে তেমন নারী হবে?

চায়ের পানি শুকিয়ে গেছে। মজিদ শোবার ঘরে এসে মাথা আঁচড়ায়। ঘরটাকে বেশ ছিমছাম লাগছে। রঞ্জনা কখনই গোছানো মেয়ে না। কাপড়চোপড়, জিনিসপত্র সব সময় এলোমেলো হয়ে থাকে। আজ ও গুছিয়েছে। বিছানায় পরিষ্কার চাদর, মশারি রডের সঙ্গে ঝুলে নেই, বালিশগুলোতে কভার আছে। ঘরের মেঝেতে স্যান্ডেল ছড়িয়ে নেই। দেয়ালে মাকড়সার জাল নেই। এমনকি ওর পড়ার টেবিলটাও গোছানো। মজিদ চিরুনি রেখে আবার বৈঠকখানায় আসে। ডায়েরি খুলে বসে। লেখা : তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিই এমন। এসব দেশের কালকেতুদের গণতন্ত্রবিরোধী হতে হবে, সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করতে হবে, চরিত্রহীন, দুর্নীতিপরায়ণ হতে হবে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেবীর মতো বৃহৎ শক্তিগুলোর পোষ্যপুত্র হতে হবে। এদের ঠোঁটে থাকে মধু, হৃদয়ে বিষ। এজন্যই ওরা ক্ষমতায় টিকে থাকে। কারণ ওরা যা বলে তা বিশ্বাস করে না, যা বিশ্বাস করে তা পালন করে না।

খুট করে বাথরুমের দরজা খুলে যায়। বেরিয়ে আসে রঞ্জনা। মজিদ ডায়েরি বন্ধ করে রেখে দেয়। হয়তো আরো কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ছেদ পড়াতে আর জোর করে লিখতে চায় না। আরেক সময় নিয়ে বসবে। রঞ্জনা পাটভাঙা শাড়ি পরেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়। অল্প কয়েকটি ঝরে গেলেও ওর চুলের সৌন্দর্য এখনো দারুণ। ধীর পায়ে মজিদের কাছে দাঁড়ায়।

এসো।

চলো।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দুজনে খাবার টেবিলে আসে। মজিদ দেখল ও যা পছন্দ করে তেমন খাবারই রান্না হয়েছে। রঞ্জনা আজ শুধু ওর জন্য নিজেকে নিবেদন করেছে। মজিদ খুশি হবে, না দুঃখ পাবে বুঝতে পারে না। ও চুপচাপ খায়। রঞ্জনা এটা-ওটা ওর পাতে তুলে দেয়। কুমড়ো বিচি দিয়ে ভর্তা বানিয়েছে, রূপচান্দা মাছের শুঁটকি রান্না হয়েছে, ধনেপাতার চাটনি, কাচকি মাছের কলাপাতা ভাজি, কতদিন এইসব প্রিয় জিনিস ওর জন্য তৈরি হয়নি। এমনকি গোটা গোটা পেঁয়াজ দিয়ে মুরগির কলজে ভাজি হয়েছে ওর জন্য। মজিদ বিস্ফারিত চোখে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না যে আজ কি সুখের দিন না দুঃখের।

রঞ্জনা গভীর তৃপ্তিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মজিদের খাওয়া ভালো লাগে ওর। তোমাকে আর একটু কাচকি মাছ দেব?

দাও।

মজিদ অবলীলায় ঘাড় কাত করে।

একটু চাটনিও দাও। খুব ভালো লাগছে খেতে। ধনেপাতার সঙ্গে এই তেঁতুলের টক আমার জিহ্বার বিস্বাদ কাটিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে তোমার জন্য বাকিটুকু রেখে দিচ্ছি। রাতে খাবে।

মজিদ মাথা নাড়ে। খাওয়া শেষে ও বুঝতে পারে যে খাওয়াটা বেশি হয়েছে। কেমন হাঁসফাঁস লাগছে। চট করে না শুয়ে বৈঠকখানায় একটু পায়চারি করে নেয় ও। তারপর বিছানায় গাড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম যখন ভাঙে তখন বিকাল শেষ হয়ে গেছে। দেখতে পায় চুলের গোছা এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে রঞ্জনা। কখন এসে ওর পাশে শুয়েছে যে টেরও পায়নি। ও ঝুঁকে পড়ে রঞ্জনার ওপর। কপালে, কপোলে ঠোঁট ছোঁয়ায়। জেগে যায় ও। দুহাতে মজিদের গলা জড়িয়ে ধরে। মজিদ প্রবল তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রঞ্জনাকে নিয়ে আসে অজন্তার গুহায়, যেখানে কত শত বছর ধরে গুহাচিত্র তৈরি করেছে মঠবাসীরা। সৃষ্টির সেই আদিক্ষণ দুজনের শরীরে চিত্রিত হয়। কারো মুখে কথা নেই, কেবল হৃদয়ে মুগ্ধতা।

সন্ধ্যার পর চন্দরের কাছে যাবে বলে তৈরি হয় মজিদ। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। অনেকদিন আগের ধোওয়া বলে কেমন একটা গন্ধ আসছে। ইস্তিরির ভাঁজও নষ্ট হয়েছে। মজিদ টেনেটুনে ঠিক করে নেয়। তবু ওর ভালোই লাগে। মনটা বেশ ফ্রেশ। বেরোনোর সময় মন্টি হাঁটু জড়িয়ে ধরে।

বাবা আমি যাব?

রঞ্জনা ওকে কোলে তুলে নেয়। বলে, না তুমি যাবে না। আমরা আজ রাতে বাবার জন্য পোলাও রাঁধব মামণি।

কী মজা পোলাও খাব। বাবা তুমি কিন্তু বাইরে ঘুমোবে না। আমি তা হলে কাঁদব। কয়দিন তুমি আসনি আমি খুব কেঁদেছি।

https://boierhut.com/fb

মজিদ মন্টির কপালে চুমু দেয়। রঞ্জনা গাঢ় স্বরে বলে, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু।

মজিদ মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসে। মনে হয় তিনদিনে গলির ঘাস আরো সবুজ হয়েছে। ইলেকট্রিক তারে বসে থাকা কাক দুটোর কালো ডানায় চিকনাই। দুপুরের পরে দেখা গলির এই পরিচিত দৃশ্য দুটো বারবার ওর মনে হানা দেয়। অন্ধকারে এখন ঘাস চেনা যায় না, ইলেকট্রিক তারেও কাক বসে নেই, তবু এ সবকিছুই ওকে পরিতৃপ্ত করছে। ও নিজেকে বেশি সুখী ভাবছে। এর কারণ হিসেবে ভেবে দেখল যে এ মুহূর্তে ওর মাথায় তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন কিছুই নেই। তাই ওর এখন সুখের সময়। আলো ঝলমল বড় রাস্তার ফুটপাতে ও দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দর কি এখন বাড়ি আছে? নিশ্চয়ই থাকবে। সন্ধ্যার পর ও সাধারণত কোথাও যায় না। নিজের থিসিস নিয়ে ব্যস্ত। ওর থিসিসের বিষয় তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন। এ ব্যাপারে ওর পড়াশোনা ব্যাপক। বিশ্বের সামরিক শাসনতাড়িত দেশগুলোর ইতিহাস ওর নখদর্পণে। ও চমৎকার বোঝে এবং বোঝাতে পারে। অর্থনীতিতে ওর দারুণ দখল। মজিদ মনে করে চন্দর একটি প্রতিভা। এ দেশে ওর যথাযথ মূল্যায়ন হলো না। ও একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ে। রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় কম, গাড়িও তেমন নেই। এই ভুতুড়ে নির্জনতা এই শহরের চরিত্র নয়, তবুও এখানে এখন থমথমে সময় পাখা মেলে আছে। মজিদের ভয় করতে থাকে। ও রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথা বলে অস্বস্তি কাটাতে চায়।

ও ভাই তোমার নাম কী?

আযমউদ্দীন।

ও ঘাড় না বাঁকিয়ে উত্তর দেয়। ওর পিঠ প্রশস্ত, ঘাড় সরু। গায়ে ছেঁড়া জামা। জামা পিঠের সঙ্গে লেপটে আছে।

সাব, নাম জিগান ক্যান?

এমনি।

তোমার বাড়ি কোথায়?

অহন তো এই শঅরে আছি।

আগে কোথায় ছিলে?

বার বছর জেলে আছিলাম। তারও আগে গাঁয়ে।

জেলে কেন?

আমার এক বন্ধু ডাকাতি কেসে আমার নাম কইয়া দিছিল। বিনা বিচারে জেল খাটছি।

বন্ধু এমন শত্রুতা করল কেন?

আযমউদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমিও জিগাইছিলাম বন্ধুরে। বন্ধু কেবল হাসে আর কয় তোর লগে মজা করলাম। ভাবলাম দুজনে একলগে জেলের ভাত খাইয়া আহি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আশ্চর্য তো!

হ, দুনিয়াডা বড় তাজ্জবের জায়গা।

তোমার দুঃখ হয় আযমউদ্দীন?

কি কন অইব না? আমি কি ফেরেশতা? বেশি দুঃখ অয় বউ-মাইয়ার লাইগা। দশ বছরের মাইয়া থুইয়া জেলে গেছিলাম, অহন কাউরে খুঁইজা পাই না। এত বড় শঅরে কোনহানে খুঁইজা পামু?

কত দিন ধরে খুঁজছ?

দুই মাস আগে ছাড়া পাইছি। তহন থাইকা খুঁজতাচি। কোন জায়গা বাদ রাহি নাই।

ওরা গাঁয়ে যায়নি তো?

নদীর ভাঙনে বাড়িঘর ভাইঙা গেলে তো শঅরে আইছিলাম। গেরামে তো থাঅনের জায়গা নাই। তাও আমি অনেক আশা লাইয়া গেরামে গেছিলাম। অরা গেরামে যায় নাই।

আহারে! কেমন করে মানুষের জীবন ওলটপালট হয়ে যায়।

বুজলেন সাব এই শঅরে কোনো আইনকানুন নাই।

কী বললে?

হ ঠিকই কই। এই শঅরে তাগো হাতে আইন যাগো হাতে পয়সা আছে। এইহানে আইনও কেনাবেচা অয়।

আযমউদ্দীনের কথায় চমকে ওঠে মজিদ। অভিজ্ঞতা ওকে কত গভীর করে ভাবতে শিখিয়েছে। নিজের জীবন দিয়ে ও এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। থাক, তবু ও বলেনি যে এই শহরে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। সর্বত্র বিশ্বাসহীনতা, কপটতা। কেউ প্রকৃত বন্ধু নয়, কেউ সদয় নয়।

তুমি কি গ্রামে ফিরে যাবে আযমউদ্দীন?

না, গেরামে গিয়ে খামু কী? নদীত বিডাটাও ভাইঙা নিছে। আমাগো লাহান মাইনষের লাইগা যাওনেরও জায়গা নাই, কবরেরও জায়গা নাই।

আযমউদ্দীনের হাসির শব্দ শুনতে পায় মজিদ। ভাগ্যিস ওর পিঠে দাঁত নেই। আযমউদ্দীনের দন্ত বিকশিত হাসি ও দেখতে চায় না। ভুতুড়ে হাসি দেখে ও নিজেকে অনুভব করতে চায় না। প্রাণপণে ভালো কিছু ভাবতে চায়। মজিদের মনে হয় ওর কান্না পাচ্ছে। মানুষের ব্যর্থ হয়ে যাওয়া জীবনের জন্য ওর অনুতাপ হয়। চন্দরের বাসা বেশ খানিকটা গলির ভেতরে, এবড়োথেবড়ো ইট বিছানো পথ। দুটো রিকশা পাশাপাশি যেতে পারে না। ও গলির মুখে আযমউদ্দীনকে ছেড়ে দেয়, দুটো টাকা বেশিই দেয় ওকে। অন্ধকারে আযমউদ্দীন হেসে উঠলে ওর সাদা দাঁত ঝকঝক করে ওঠে। আস্তে করে বলে, আমার কতা হুইনা আমার জন্য আপনের মায়া লাগছে না সাব?

মজিদ উত্তর দিতে পারে না। ও জানে এর কোনো জবাব হয় না। তবু অকারণেই বলে, তোমার সঙ্গে আমার কি আর কখনো দেখা হবে আযমউদ্দীন?

https://boierhut.com/fb

কে জানে হইবারও পারে। দুনিয়াডা বড় তাজ্জব জায়গা সাব।

আযমউদ্দীন রিকশা ঘোরায়। একজন যাত্রী যাবে কি না জিজ্ঞেস করে উঠে বসেছে। মজিদ অন্ধকারে পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খায়। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল, কোনোরকমে সামলে নেয়। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা টনটন করছে। পা টেনে টেনে হাঁটতে ওর কষ্টই হয়। তবু এই অল্প একটু রাস্তার জন্য ও আর ফিরে যেতে চায় না। চন্দর বাসাতেই ছিল। ওকে দেখে খুশিই হয়। চন্দরের বউ অঞ্জলি, মোটাসোটা মহিলা, মায়া-মায়া চেহারা। সবার সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলে। ওর পায়ের কথা শুনে বরফ নিয়ে আসে। মজিদকে বরফের টুকরো ব্যথার জায়গায় চেপে ধরতে বলে। বরফ লাগান হলে ওর বেশ আরাম লাগে। চন্দর একগাল হেসে বলে, তোমার খবর কী বলো? অনেক দিন তোমার কথা মনে মনে ভেবেছি। একদিন তোমার অফিসে যাবার জন্য তৈরিও হয়েছিলাম। পরে কী কারণে যেন আর যাওয়া হয়নি।

মজিদ কণ্ঠ নামিয়ে বলে, শহরের এতকিছু ঘটনার পর তোমার কথাই মনে হলো। ভাবলাম তোমার কাছেই আসি। চিন্তা কারো সঙ্গে ভাগ করতে না পারলে মাথা ভার হয়ে থাকে। স্বস্তি পাই না।

চন্দর মৃদু হাসে। আস্তে করে বলে, তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে যেদিন থেকে সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছে সেদিন থেকে এটা নির্ধারিত হয়ে গেছে যে ক্ষমতার লড়াইয়ে এমন হানাহানি চলবেই। এর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই মজিদ। কষ্ট একটাই যে এত লোকক্ষয়, এত জীবনের অপচয়। তুমি ভেবে দেখো এইসব দেশে স্থায়ী সামরিক বাহিনী রাখার প্রয়োজন আছে কি?

মজিদ ধীরকণ্ঠে বলে, নেই।

আমিও বলি নেই। কারণ অর্থসম্পদ এবং আয়তনের দিক দিয়ে এইসব দেশ এত ছোট যে কোনো একটি বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ রাষ্ট্রের রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয় করতে হয় এদের পেছনে। ওদের কাজ কী? কাজ তো বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত এলাকায় সাহায্য দেওয়া আর জনগণের মিছিলে গুলি করা। সেজন্য আমাদের এই ছোট দেশের জন্য স্থায়ী সামরিক বাহিনীর কোনো দরকার নেই। আমাদের প্রয়োজন সিটিজেন আর্মি।

ভেবে দেখো, কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনী সীমান্তের চোরাচালান পর্যন্ত বন্ধ করতে পারে না। পারবেও না। কারণ এসব তো রাজনীতির খেলা। কলকাঠি ওপর থেকে নড়ে। সেনাবাহিনী তো সামরিক রাজনীতির পুতুল। যেভাবে চলতে বলবে চলবে। যারা চলতে চাইবে না, তারা বিদ্রোহী হবে। হয় ব্যর্থ অভ্যুত্থানে মরবে নয়তো ক্ষমতা দখল করবে। শুরু হবে পুরনো বোতলে নতুন মদের ফোয়ারা। আর জনগণ? তারা যে তিমিরে থাকার সেখানেই থাকবে। কারণ এই বাহিনীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কি জান? এরা ক্ষমতায় এসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শত কণ্ঠে চিৎকার করবে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই টাকা বানানোর নেশায় সেই দুর্নীতির প্রবল পাঁকে নিমজ্জিত হবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একটানা কথা বলে থামে চন্দর। মজিদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। এই হাসি ওর অভ্যেস। মজিদ মগ্ন হয়ে ওর কথা শুনছিল। চন্দর থামতেই নড়েচড়ে বসে এবং ওর হাসি দেখে মুগ্ধ হয়। অঞ্জলি ওদের জন্য চা ও মিষ্টি নিয়ে আসে। মিষ্টি খেতে খেতে ও বলে, তোমার বৈশিষ্ট্যটি এখনো রয়ে গেছে দেখছি। চন্দর হো-হো করে হাসে। অঞ্জলি একটি মোড়া টেনে বসেছে। ধবধবে সাদা গায়ের রং, কিন্তু সে পরিমাণে চেহারায় লাবণ্য নেই। এক ধরনের ফ্যাকাসে ভাব অঞ্জলিকে বিষণ্ণ করে রাখে। ছোট ছেলেটি দৌড়াতে দৌড়াতে এসে অঞ্জলির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মা শমি মেরেছে? তুমি ওকে মারবে চলো।

দুষ্টুমি করে না অমি। যাও পড় গে।

না, আমি পড়ব না। কিছুতেই পড়ব না।

আহ্ অমি।

অঞ্জলি ওকে ধমক দেয়।

তুমি ওকে নিয়ে শোবার ঘরে যাও না, আমি মজিদের সঙ্গে কথা বলি।

চন্দর স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করলে অঞ্জলি উঠে চলে যায়। মজিদ চা শেষ করে।

চন্দর মনোযোগী ছাত্র পেয়ে নিজের বিষয়ে ফিরে আসে।

বুঝলে মজিদ, সিটিজেন আর্মি ছাড়া ছোট দেশগুলোর কোনো গতি নেই। সিটিজেন আর্মি হলো জনগণের সেনাবাহিনী। অর্থাৎ দেশবাসীকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। দেশের প্রয়োজনে তারাই এগিয়ে আসবে। প্রয়োজনে তাদের হাতেই অস্ত্র তুলে দিতে হবে। পৃথিবীর এমন অনেক দেশ আছে যাদের স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই।

মজিদ বলে, তাহলে তো এটা সত্য যে যেসব দেশে স্থায়ী সেনাবাহিনী আছে সেসব দেশে সামরিক শাসন, অভ্যুত্থান, পালটা অভ্যুত্থান ইত্যাদি চলতেই থাকবে।

চন্দর জোর দিয়ে বলে, এতে কোনো সন্দেহই নেই। এই পরিস্থিতি এসব দেশের জন্য অবশ্যম্ভাবী। তা ছাড়া এটাও সত্য যে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের সমস্যাগুলো কোনো সরকারই জাদুর কাঠি দিয়ে সমাধান করতে পারবে না, পারা সম্ভবও নয়।

এর সমাধান কী বলো তো?

সমাধান একটাই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর কোনো ভূমিকা থাকা উচিত নয়। তাদের কাজ দেশ রক্ষা। সে কাজের জন্য তাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।

আকস্মিকভাবেই হো-হো করে হেসে ওঠে মজিদ। চন্দর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, হাসছ কেন?

হাসছি এ জন্য যে কালকেতু এমন কথা শুনলে তোমার গর্দান নেবে। ও ছিল ব্যাধ। ও জানে শিকার কী? তা ছাড়া জানো তো বাঘ যেমন মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে ভুলতে পারে না, ক্ষমতাও তেমন। যারা ক্ষমতার ঘি-মাখন খায় তারা এর জন্য মারামারি হানাহানি করবেই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তোমার কথাই ঠিক। সে জন্য এসব দেশের ভাগ্যে বারবার সামরিক শাসন ফিরে আসে, বিভিন্নভাবে।

কথাগুলো বলে চন্দর বিষণ্ন হয়ে যায়। ওর ফুল্লরার কথা মনে পড়ে। ও কী কঠিন ভাষায় ওকে ভয় দেখিয়েছে। সত্যি কি চন্দরকে চরম মূল্য দিতে হবে? মুহূর্তে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। মজিদ অবাক হয়।

তোমার কী হলো চন্দর?

বুকে ব্যথা হচ্ছে। অস্বস্তি লাগছে।

ডাক্তার আনব?

না দরকার হবে না। মনে হয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

তা হলে আমি যাই। তুমি বিশ্রাম নাও।

চন্দর সামনের টেবিলে পা উঠিয়ে দিয়ে সোফায় মাথা হেলিয়ে দেয়। ফুল্লরা এক বিশাল সাঁড়াশি দিয়ে ওর মাথা চেপে ধরেছে। ও কোনোদিকে নড়তে পারছে না। ওর চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে।

রাস্তায় সোডিয়াম বাতি। তবু চারদিকে ভুতুড়ে অন্ধকার বলে মনে হয় মজিদের। ও একটি রিকশায় উঠে বসে। রাত তেমন বেশি হয়নি। রাস্তায় পায়ে হাঁটা মানুষ নেই। রিকশায় কম, দু-একটা গাড়ি কেবল সাঁই করে চলে যায়। মজিদ নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে। ভাবতে ভাবতে ও খুব দ্রুত নিজের বাড়িতে চলে আসে। শুনতে পায় রঞ্জনা মন্টিকে গল্প বলছে, রূপকথা। রাজপুত্র দৈত্য-দানব সব মেরে ফেলেছে, নগরবাসী খুশি, রাজকন্যা মুক্তি পেয়েছে। মহা ধুমধামে বিয়ে হচ্ছে রাজপুত্র আর রাজকন্যার। মন্টি প্রশ্ন করে, বিয়েতে ওরা কী খেল?

কত কী? পোলাও-কোর্মা, খাসি, মণ্ডা-মিঠাই দই-মিষ্টি আরো কত কী!

বাবা কী মজা! আমিও পোলাও খাচ্ছি।

মজিদ জামা খুলতে খুলতে মন্টির কথা শুনতে চায়। ও রঞ্জনাকে অজস্র প্রশ্ন করছে। রাজকুমার রাজকন্যাকে নিয়ে ওর বিস্ময় কাটে না। ওর প্রশ্ন শুনে হাসি পায় মজিদের। কল্পনার কত বিচিত্র পাখা মানুষের মনে কাজ করে। একদিন মন্টি জানবে ওইসব দৈত্য-দানো আমাদের জীবনকেও ছিন্নভিন্ন করে। মন্টির মতো রাজকুমারীদের সোনার কাঠি মাথার কাছে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। ওদের থাবা ভয়ানক হিংস্র—খুবলে নেয় মানুষের কলজে—ওরা কলজে খেতে ভালোবাসে। এমন কলজে খেতে চাওয়া মানুষের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শহরের অলিতে গলিতে। যাদের সঙ্গে মজিদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং যারা মজিদদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দিতে পিছপা হয় না।

রঞ্জনা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে মন্টিকে ঘুম পাড়াচ্ছে। মজিদ এসে বিছানায় বসে। গানের সুর ওর ভালো লাগছে। বালিশে রঞ্জনার চুল ছড়িয়ে আছে। ওদিকে তাকিয়ে মজিদের মনে হয় অন্ধকারের পটভূমিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। জ্বলজ্বল করছে রঞ্জনার মুখ। ও তৃতীয় বিশ্বের সামরিক শাসনে পীড়িত

https://boierhut.com/fb

অধিবাসী। ও জানে না ওর ভবিষ্যৎ কী। কে ওর নিয়ন্তা? কোথায় ওর যাত্রা? ওর একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে। সে অতীত স্মরণ করে ও ভবিষ্যতের আশায় দিন গোনে। মন্টি ঘুমিয়ে গেলে রঞ্জনা মজিদের ডান হাতটা নিয়ে নিজে গালে ঘষে। তারপর আস্তে করে বলে, চলো খাবে? খিদে পায়নি?

খুব খিদে পেয়েছে।

মজিদ ওর মাথা জড়িয়ে ধরে চুলের মধ্যে মুখ ঘষে। তেলের সৌরভে মনে হয় হাস্নাহেনার গন্ধ। কৈশোরে ওর জানালার কাছে এই গাছটি লাগিয়ে ছিল ওর মা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় ওর মা বলতেন, পড়তে পড়তে যখন ক্লান্ত হবি তখন এই ফুলের গন্ধে ঘুম আসবে তোর। আর এই ফুলের গন্ধ ধরে স্বপ্নে পরী আসবে তোর কাছে। পরীর কথা বলে মা দুষ্টুমির হাসি হাসত। লজ্জায় লাল হয়ে যে ও। কিন্তু মনে মনে পরীর আকাঙ্ক্ষা থাকলেও স্বপ্নে কখনো পরী আসেনি ওর কাছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার দুমাস পর মা মারা গেল। ও কিছু বুঝতেই পারল না। সেই যে বোবা হয়ে গেল আজো সে ভাবটা কাটেনি। এখনো কোনো বড় রকমের ঘটনায় অসহায়ভাবে বোবা চোখ মেলে রাখে। আজ রঞ্জনার চুলের গন্ধে মনে হয় মায়ের বলা স্বপ্নের পরী বুঝি ও। কত হাজার বছর পর ও একটি স্বপ্ন খুঁজে পেয়েছে। এ স্বপ্ন নিয়ে শহরের রাস্তায় হেঁটে যাবে ও। সোডিয়াম বাতি থাকুক আর নাই থাকুক অন্ধকারে ফুল ফোটাবে। ও রঞ্জনাকে চুমু খায়।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় মজিদের। কেবলই মনে হয় কোথায় যেন ভীষণ শব্দ হচ্ছে—বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে আর্তনাদ। হয়তো উত্তরপাড়ার ডোবায় পড়ে থাকবে যুবতীর লাশ কিংবা জোড়াখুন হবে তালপুকুর এলাকায়। অথবা নিখোঁজ হয়ে যাবে এমন একজন মানুষ যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকে। মজিদ উঠে বাথরুমে যায়। রান্নাঘরে আসে। এক গ্লাস পানি খায়। বুঝতে পারে পেটে গ্যাস জমেছে। জ্বলে যাচ্ছে বুক। ও পরপর তিন গ্লাস পানি খেলে জ্বলুনি কিছুটা কমে। ওর মনে হয় ও দূরে কোথাও গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ওর কেমন অবসন্ন লাগে। ও বৈঠকখানার জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব কাছে কোথাও কাক ডাকছে। এ অন্ধকার রাতে কাকের শব্দে মজিদের বুকের ভেতর ঢুপঢুপ শব্দ হয়। ও সোফায় বসে মোম জ্বালায়। মোমটা টেবিলের ওপর রাখলে বাতাসে মোমের শিখা কাঁপে। ওর মনে হয় কত অলৌকিক ছায়া দৌড়ে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। মজিদ একদৃষ্টে আগুন দেখে—হালকা নীলাভ আগুন। ও বিড়বিড় করে, বাইরে গুলির শব্দ এবং ঘরের ভেতর আগুন—এক সময় আমরা নিজেরা এই গুলি এবং আগুন নিয়ে নগরের রাস্তায় নেমে পড়ব। নগরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে আগুন। খসে আসবে নক্ষত্র, নীলিমা এবং কৃষ্ণবিবর। আমরা এই নগর থেকে নিশ্চিহ্ন করব কালকেতুর করোটি—ফুল্লরার লোভাতুর হাত।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমরা নক্ষত্রের ফুল ফোটাব নগরের সড়ক দ্বীপে। মজিদ অনুভব করে আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ওদের পরনে ছিন্ন পোশাক, ওদের পাঁজরে বিষবষ্প, ওদের নগ্ন পা ফাটা এবং রক্তাক্ত, ওদের চোখে ক্রোধ, ওদের হাত বিশাল হয়ে উঠেছে—নগরের চত্বরে আগুনের কুণ্ডলীতে ওরা ছুড়ে দেবে কালকেতু এবং ফুল্লরার নগ্ন শরীর। পুড়ছে কালকেতু ও ফুল্লরা—পুড়ছে—। পুড়ছে চামড়া, মাংস, রক্ত, পেশি, হাড়। পুড়ছে কালকেতু ও ফুল্লারা—পুড়ছে—। আজ উৎসব। আগুনের কুণ্ডলী ঘিরে নাচছে মানুষ—উল্লাসের নৃত্য। তারপর? মজিদ নিজের ভেতর প্রবল উত্তেজনা বোধ করে। ওর মা বোধহয় এমন স্বপ্নের কথাই বলেছিল। আজ ওর স্বপ্ন দেখার দিন—স্বপ্ন ফুটে ওঠার দিন। একটি মোম ফুরিয়ে গেলে ও আর একটি মোম জ্বালায়। আগুনের শিখা অনির্বাণ জ্বলে।

মজিদ হাঁটু গেড়ে বসে শিখা দেখে। ওর মনে হয় ঐ শিখা থেকে হাস্নাহেনার গন্ধ ভেসে আসছে। ঐ শাখার আড়ালে ওর মায়ের মুখ। ওর তখন মনে হয় ও আসলে যে শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সেটা বুটের শব্দ। অজস্র বুটের শব্দ ওর স্নায়ু বিকল করে দেয়। ও বিরক্ত হতে থাকে। ও তখন পাগলের মতো মোম খোঁজে—ও আরো মোমের শিখা জ্বালাতে চায়।

তখন গভীর রাত। তীরন্দাজ বাহিনীর জিপ এসে চন্দরের বাড়ির সামনে থামে। ওরা ফুল্লরার নিজস্ব লোক। সব সময় ওর হুকুমের অপেক্ষায় থাকে। চন্দর তখন বাইরের ঘরে মোম জ্বালিয়ে পড়ছিল। গভীর রাতে ও মোম জ্বালিয়ে পড়তে ভালোবাসে। লাইট জ্বালিয়ে ও পরিবারের অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত করতে চায় না। ও বলে, মোমের নীল শিখায় নাকি ওর মাথা খোলাসা হয়। ও অনেক জটিল বিষয় সহজে বুঝতে পারে।

তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা ওর দরজায় ধাক্কা দিলে ও নিঃশব্দে দরজা খোলে। লোকগুলো ওর চেনা। ও ওদের দেখেছে ফুল্লরার বাড়িতে। সে বাড়ির বিভিন্ন কোনায় কোনায় ওরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের হাসিহীন নিষ্প্রাণ চেহারায় নিষ্ঠুরতা। চন্দর বুঝতে পারে যে কেন ওরা এসেছে। ফুল্লরার কণ্ঠ ও শুনতে পায়—সেই বিষাক্ত কণ্ঠ—হিসহিস শব্দ। মুহূর্তে ওর মুখ শক্ত হয়ে যায়। চন্দর দুহাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকে।

লোকগুলো রোবটের কণ্ঠে উচ্চারণ করে, আপনাকে যেতে হবে।

আমাকে?

চন্দর আশ্বস্ত হয়। ও ভেবেছিল আঘাতটা ওর বাচ্চাদের ওপর আসবে। তাই তো দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল ওরা ঘরে ঢুকলে ওর লাশের ওপর দিয়ে ঢুকবে।

চলুন। কাপড় পালটে আসি?

না, যেভাবে আছেন সেভাবে আসুন।

চশমাটা?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দরকার নেই। চলুন। ঐ মোমটা নিভিয়ে দিয়ে আসুন।

ওটা জ্বলুক।

কাজটা তা হলে আমিই করি।

লোকটি ঘরে ঢুকে মোমটা নিভিয়ে দেয়।

কয়টা মোম আপনি নেভাতে পারবেন?

বাস্টার্ড!

লোকটি ওর ঘাড়ের পর রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। চন্দর লুটিয়ে পড়ার আগে বুঝতে পারে ওকে ধরে জিপে ওঠাচ্ছে।

বাড়ির লোকেরা কিছুই টের পায় না। ভোরবেলা বেশ দেরিতে ঘুম ভাঙে অঞ্জলির। কাজের মেয়েটি দরজা খোলা দেখে ভাবে সাহেব হয়তো বাইরে গেছে। রোজই তো সে ভোরবেলা বেড়াতে যায়। ও বৈঠকখানার দরজাটা বন্ধ করে রাখে। বাচ্চাদের আজ স্কুল নেই। অঞ্জলি গড়িমসি করে যখন বিছানা ছাড়ে তখন বেলা নয়টা। চন্দরকে না দেখে কাজের মেয়েটিকে ডাকে, মৌটুসি তোর সাহেব মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরেনি?

না আম্মা, আহে নাই তো?

চন্দর খুব গোছানো রুটিনমাফিক জীবনযাপন করে। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে সবকিছু করতে ভালোবাসে। রুটিনের ব্যতিক্রম হলে ও নিজেই বিরক্ত হয়। আজ কী হলো? অঞ্জলি চিন্তিত হয়। এতক্ষণে তো ফিরে গোসল করে নাস্তা খেয়ে বই নিয়ে বসে। অঞ্জলি চন্দরের টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। টেবিলে বই খোলা। কাগজ এলোমেলো। কলমটা টেবিলের নিচে পড়ে আছে। মোমটা অর্ধদগ্ধ। এমন তো হতেই পারে না। চন্দরের সবকিছু গোছানো থাকে। অনেক রাতে লেখাপড়া শেষ করে নিজ হাতে সব গোছায়। অঞ্জলি ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। শোবার ঘরে এসে দেখে চন্দরের প্যান্ট জামা জুতো সব ঘরে আছে। অর্থাৎ ও লুঙ্গি পরেই বেরিয়ে গেছে। চন্দর লুঙ্গি পরে বাইরে যায় না। হয় প্যান্ট-শার্ট পরে, নয় পায়জামা-পাঞ্জাবি। আজ এমন নিয়মের ব্যতিক্রম করে মানুষটি কোথায় গেল?

দুপুর গড়িয়ে যাবার পরও যখন চন্দন ফিরল না তখন অঞ্জলি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করতে শুরু করল। পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ কিছু জানে না। কোথাও চন্দরের কোনো খবর নেই। এই নগর চন্দরকে গায়েব করে ফেলেছে।

দুদিন পর পত্রিকার পৃষ্ঠার দুটি খবর পড়ে মজিদ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকে। এক. চন্দরের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ। দুই. বিচারপতি রমানির পদত্যাগ। ওর কেবলই মনে হয়, দুটো খবরের উৎস এক। কালকেতু হাতের মুঠিতে রেখে এই নগর নিয়ন্ত্রণ করে। গতকাল নগরে চত্বরে জনসমাবেশে ভাষণ দিয়েছে কালকেতু। থমথম করেছে নগরের পরিবেশ। নারকেল গাছের মাথায়

https://boierhut.com/fb

বসে ডেকেছে কাক। মজিদ অনেক পেছনে বসে সে ভাষণ শুনেছে। কী গম্ভীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ছিল কালকেতুর। কী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করছিল—যেন ভারী সিসা গড়িয়ে পড়ছে মুখ-গহ্বর থেকে। সে গহ্বরের ভেতরে অগ্ন্যুৎপাতের লাভা টগবগ করছে। কী নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই নগরের। মজিদ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। কালকেতু পরিষ্কার গলায় স্পষ্ট করে বলেছে : এই নগরের ভবিষ্যৎ তীরন্দাজ বাহিনী। এরা এই নগরকে নতুন করে গড়বে, রক্ষা করবে এবং পুরুষপরম্পরায় এর ক্ষমতার অধিকারী হবে। এই সত্য বাস্তব সত্য। কেউ এর বিরোধিতা করতে পারবে না। কেউ করলে আমি তা বরদাশত করব না। তবে ক্ষমতার হস্তান্তর একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে হবে। কীভাবে হবে সেই নীতি আমি নির্ধারণ করে দেব। তবে আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অন্য কারো ক্ষমতায় যাওয়ার অধিকার নেই। এই নগর আমি স্থাপন করেছি। আমি এর রক্ষক। যদি কেউ আমার জীবনকালে ক্ষমতার লোভ করে তবে তাদের দশা গতকাল যা ঘটেছে তাদের মতো হবে। আমি পিঁপড়ার মতো মারব। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করব এই নগর থেকে।

ভাষণ শুনতে শুনতে মজিদের মাথা বিস্তৃত হতে থাকে—বিস্তৃত হতে থাকে এ ভাষণ নগরের সর্বত্র—ছুঁয়ে ফেলে দিগন্ত নদী মাঠ আকাশের সীমানা। ও বুঝতে পারে এই ভাষণ নগরের প্রতিটি মানুষের মাথা ওর মতোই বিস্তৃত করে দেবে—অন্তত তাদের মাথা যারা এই নগরের সাধারণ জন। যারা নগর পত্তনে নিজেদের প্রতিটি শ্রমবিন্দু ব্যয় করেছে। আরো আছে অসংখ্যজন যারা ঐ সময় হারিয়েছিল তাদের প্রিয়জন। এখন কি করে শুধু তীরন্দাজ বাহিনী পুরুষপরম্পরায়—? না, মজিদ কিছুতেই ভাবতে পারে না। ক্রোধের এইসব মুহূর্তে চন্দরের খবরটি ওকে আরো কুপিত করে। ও খবরের কাগজটি ভাঁজ করে রেখে গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। অফিসে আজ লোকজন কম। কেউ কেউ এখন পর্যন্ত আসেনি, কেউ কেউ ছুটিতে গেছে। মজিদের কাজে মন বসে না। টেলিফোন ঘোরায় চন্দরের বাসায়। ফোন ধরে কেঁদে ফেলে অঞ্জলি।

ওকে এখন কোথায় খুঁজব বলুন তো? আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন মজিদ ভাই?

আমার ধারণা, ও যে বিষয়ের ওপর বই লিখছে তার খেসারত ওকে দিতে হচ্ছে।

মানে? অঞ্জলির বিস্মিত কণ্ঠ।

আমি একটু খোঁজখবর করে দেখি ভাবি। আমার দু-চারজন সাংবাদিক বন্ধু আছে। ওরা হয়তো কিছু বলতে পারলেও পারে।

আমাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। মনে হয়, প্রতিটি মুহূর্তে কেউ বুঝি আমার শরীরে কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছে।

ঘাবড়াবেন না। বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়। বাচ্চাদের সামলে রাখবেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওদের জন্যই তো এখনো বেঁচে আছি। নইলে আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। দোয়া করবেন আমার জন্য।

অঞ্জলি ফোন রেখে দেয়। মজিদ ভেবে পায় না যে কোথায় খুঁজবে চন্দরকে? ওর সাধ্যি কি চন্দরকে খুঁজে বের করার? ফাঁকা ফাঁকা আজকের অফিস ওর বুকের ওপর চেপে থাকে। অন্যরা থাকলে জমিয়ে আড্ডা দিলে হয়তো কিছুক্ষণ ভালো কাটত। অনেকদিন আগে সুতা-কেটে পড়ে যাওয়া ঘুড়ির কথা ওর প্রবলভাবে মনে পড়তে থাকে।

১৬

চন্দর জানে না ও কোথায়। এটা ফুল্লরার বাড়ি কি না তা ও বুঝতে পারে না। যারা ওকে দেখাশোনা করে তারা ওর সঙ্গে কথা বলে না। ও বোঝে এটা গোলকধাঁধা যেখান থেকে ডিডেলাস বেরুতে পারেনি—হ্যাঁ গোলকধাঁধা ওর নিজেরই তৈরি—এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। ও দাঁত কিড়বিড় করে উচ্চারণ করে একটি শব্দ, ফুল্লরা। ও পড়েছে অর্থনীতি, চিন্তা-ভাবনা করে রাজনীতি, সামরিক শাসন, সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে—পাশাপাশি বুঝতে পারে না যে ফুল্লরার এ কেমন নিষ্ঠুর খেলা। কী বিষাক্ত দ্রব্য দিয়ে মানুষের হৃদয় তৈরি—যে হৃদয় নিষ্ঠুরতায় উল্লসিত হয়, আনন্দ পায়?

আকারে বেশ বড়সড় এই ঘরটি এখন চন্দরের পৃথিবী। তিন দিকে জানালা আছে। ঘরের ভেতরে সে জানালা ভারী পরদা ঝোলানো। বাইরে দিয়ে জানালাগুলো আটকানো, কাচে কাগজ লাগানো এবং সে জানালাগুলো খোলা যায় না। বিছানাটি পরিষ্কার। প্রতিদিন চাদর বদলে দেওয়া হয়। তিন বেলা সুস্বাদু খাবার দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কোনো অসুবিধে নেই, এবং রাজকীয় বিলাসে আছে। কিন্তু যন্ত্রণা চন্দরের হৃদয়ে। এই নিষ্পেষণে ওর গাল তুবড়ে যাচ্ছে, চোখ বসে গেছে, উস্কখুস্ক চুল, রুক্ষ দৃষ্টি। ও এক প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় ক্রমাগত নিজের ভেতর শানিত হতে থাকে।

ফুল্লরা একদিন এ ঘরে এসেছিল। ক্রূর কণ্ঠে বলেছিল, ভেবে দেখেছি যে তোমাকে ধরাই সহজ। তোমাকে আমি সন্তান-সুখ থেকে বঞ্চিত করব। বাচ্চাদের ধরলে নগরবাসী হৈচৈ করবে। তুমি একটা ইস্যু বানাবে। তোমাকে ধরলে তুমি নিঃশব্দে হারিয়ে যাবে।

প্রবল ঘৃণায় ছটফটিয়ে ওঠে চন্দর। বলে, তুমি কিসের আশায় ছুটছ আমি জানি না। তবে তোমাকে উর্বর করতে আমার মিলন দরকার। নইলে তোমার অনুর্বরতা কাটবে কি করে?

ফোঁস করে ওঠে ফুল্লরা, তার মানে তুমি আমাকে ভোগ করতে চাও?

https://boierhut.com/fb

বাজে কথা বলবে না, নারী-পুরুষের মিলন আমার কাছে অত্যন্ত পবিত্র। এর সঙ্গে মানবজাতির অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। যারা ভোগের নেশায় মাতে আমি তাদের ঘৃণা করি।

হা-হা করে হেসে ওঠে ফুল্লরা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, কালকেতু ভোগ ভালোবাসে। ও মনে করে এটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

চন্দর মুখ ফিরিয়ে রাখে।

ফুল্লরা রেগে যায়, মুখ ফিরিয়ো না চন্দর। আমার দিকে তাকাও।

এ জীবনযাপনে তোমার ঘৃণা হয় না ফুল্লরা?

ঘৃণা? ঘৃণা হবে কেন? এমন রাজরানীর মতো জীবন কয়জনের ভাগ্যে হয়?

আবার হা-হা করে হাসে ফুল্লরা। হাসিতে কমনীয়তা বা স্নিগ্ধতা নেই। আছে ক্রূরতা এবং রূঢ়তা। চন্দরের কানে সে হাসি অস্বাভাবিক মনে হয়। একসময় হাসি থেমে গেলে চিবিয়ে বলে, তবে জেনো আমি খুব সুখী।

সুখী? সুখের নমুনা তো এই যে অন্যের জীবন নষ্ট করার চেষ্টা! এটা কেমন সুখ ফুল্লরা?

এও সুখ চন্দর। এ সুখ যে কী তুমি বুঝবে না। তোমাকে আমি বোঝাতেও চাই না।

ঠিক আছে আমিও বুঝতে চাই না। শুধু জানতে চাই কবে তোমার এ সুখের দিন ফুরোবে। কবে তুমি আমাকে ছাড়বে?

কেন এখানে তোমার কষ্ট কী? আমি তোমাকে সুস্বাদু খাবার দিচ্ছি, কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই। দিব্যি শুয়ে-বসে দিন কাটাচ্ছ। ভালোই তো আছ?

আহ্ ফুল্লরা ছেলেমানুষি করো না।

তোমার কিসের কষ্ট চন্দর?

কষ্ট তোমার এই আবাস, বিলাসী খাবার।

সন্তানের কথা মনে হয় না?

হয়।

ওদের জন্য খারাপ লাগছে?

আমি তো জানি তুমি সন্তানের কষ্টে আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাও।

ফুল্লরা হা-হা করে হেসে ওঠে, তুমি অনেক বেশি বোঝ। ছোটবেলা থেকেই তুমি একটু বেশি বুঝতে পার। তা হলে বুঝেশুনে ঘুমোও চন্দর। কেন ছেড়ে দেবার কথা বলছ?

তার মানে তুমি নিজেও জান না যে কবে তোমার এই সুখের খেলা ফুরোবে?

কিড়মিড় করে ওঠে চন্দরের শরীর। কথায় স্পষ্ট রাগের প্রকাশ।

তুমি আমাকে রাগ দেখিয়ো না চন্দর। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি কে?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এক মুহূর্তের জন্যও আমি তা ভুলি না। তোমার দেওয়া এই অপমানের ভাত রোজ খেয়ে আমি কি করে ভুলব যে তুমি কে? এই নগরের তুমি ছাড়া আর কার সাধ্য আছে যে আমাকে এভাবে আটকে রাখবে?

ফুল্লরা নীরবে চন্দরের কথা শোনে। তারপর মৃদু হাসে, এতকিছুই যদি জান তবে আর ছটফট করছ কেন? চুপচাপ থাকলেই পার?

চন্দর কঠিন গলায় বলে, তুমি কি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে?

ফুল্লরা ওর চোখে চোখ রেখে বলে, বলো ভেবে দেখি।

তুমি কি চাও আমার ছেলেমেয়েরা পিতৃহীন হোক?

ফুল্লরা চুপ করে থাকে। তারপর যেতে যেতে বলে, ভেবে এ প্রশ্নের উত্তর দেব। এসব নিয়ে আমি ভাবিনি।

চন্দর পেছন থেকে ডাকে, শোনো ফুল্লরা, এর পরিণতি ভালো হবে না কিন্তু।

উপদেশ দিচ্ছ?

ফুল্লরা বাঁকা চোখে তাকায়। চন্দরও গলায় সমান বিষ ঢেলে বলে, তোমাকে উপদেশ দেব এতবড় ধৃষ্টতা কি আমাকে মানায়?

ফুল্লরা জবাব না দিয়ে চলে যায়। দ্বাররক্ষী দরজা বন্ধ করে। চন্দর পর্দার চমৎকার নকশার দিকে তাকায়। ফুলগুলো সাপের ফণার মতো উদ্ধত হয়ে ওঠে। ওর মাথায় খুন চেপে যায়। ও টান দিয়ে পর্দাগুলো খুলে ফেলে। জানালার কাচ রঙিন কাগজ দিয়ে আটকানো। বুঝতে পারে যে চোখের সামনে বাইরের পৃথিবী অন্ধকার। দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় না। সাদা দেয়ালে একটিও টিকটিকি নেই। কেমন জনপ্রাণীশূন্য প্রান্তর চন্দরের চোখের সামনে ধু-ধু করে। ও কিছুতেই ঐ প্রান্তরটুকু পেরুতে পারছে না। হা-হা করে বাতাস ছুটে এসে চাবুকের মতো পড়তে থাকে মুখের ওপর। কপালের ওপর এখনো সেই কাটা দাগটি আছে। চন্দর হাত দিলে টের পায়। অসম্ভব চঞ্চল এবং দুষ্টু ছিল বলে বাবা একদিন রাগের মাথায় হাতের পাচন দিয়ে মেরেছিল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছিল রক্ত। সে রক্ত দেখে মূর্ছা গিয়েছিল ওর মা। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। দুদিন প্রচণ্ড জ্বরে বেহুঁশ থাকার পর যেদিন জ্ঞান ফিরল, দেখল বাবার উৎকণ্ঠিত মুখ ওর শরীরের ওপর ঝুঁকে আছে। সেই মুখে কি যে ব্যাকুলতা ছিল আজো চোখ বুঝলে তা দেখতে পায়। অনুতপ্ত হৃদয়ের গ্লানির সঙ্গে পিতার অন্ধ আবেগ মিশে গেলে সে চেহারায় একটা রং তৈরি হয়। চন্দর মনেপ্রাণে এখন নিজের দৃষ্টির সামনে সেই রং কামনা করে। ঐ রং পেলে ও হয়তো এই মুহূর্তে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। নইলে বড় দুঃসময় সামনে। ওর তৃষ্ণা পেলে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। দামি গ্লাস এবং জগ সাজানো আছে। জগ ভর্তি পানি। প্লেটে আপেলের টুকরো, সঙ্গে কিশমিশ আছে অনেকগুলো। ওর ছেলে কিশমিশ খেতে ভালোবাসে। চন্দর প্লেট উঠিয়ে নিয়ে দরজার কাছে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছুড়ে মারে। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে প্লেট, আপেল এবং কিশমিশও। চন্দরের চোখের মণি ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়, মাথা টনটন করে। ওহ্! কী ভয়ানক একটা নিঃসঙ্গ প্রান্তর—ছায়া নেই, জল নেই, শুধু পুড়ে যায় পায়ের নিচের মাটি। ও জগটা মুখে উঠিয়ে ঢকঢকিয়ে পানি খায়। পানি গড়িয়ে পড়ে ঠোঁট বেয়ে। ভিজে যায় শার্ট। এক সময় ঠক করে জগটা টেবিলের ওপর রাখলে দেখতে পায় দরজা খুলে গেল। কেউ একজন ঢুকল ঘরে। নিঃশব্দে তুলে নিয়ে গেল প্লেটের ভাঙা টুকরো এবং আপেল ও কিশমিশ। মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যায় মেঝে। জানালায় আবার পর্দা ঝোলে। বাথরুম পরিষ্কার করে গেলে সুগন্ধি ভেসে আসে। টেবিলে পাছা ঠেকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে এসব দেখে চন্দর। এক সময় আবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ওর হাতে ঘড়ি নেই। সময় কত তা ও বুঝতে পারে না। এখন কি রাত না দিন সেটা বোঝাও মুশকিল হয়ে পড়ে। এ কেমন অদ্ভুত জগৎ তৈরি করেছে ফুল্লরা। মানুষের পক্ষে কি সম্ভব এমন ভুবনে বসবাস? চন্দর বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে রাখে।

তখন কালকেতু প্রবল প্রতিপত্তিত্বে পরিষদ সদস্যদের দপ্তর পুনর্বণ্টন করতে থাকে। কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই। সবাই চুপ। কেবল কালকেতুর কণ্ঠ ওঠানামা করে এবং দেয়ালঘড়িতে টিকটিক শব্দ। সভাকক্ষের মাঝখানে পূর্বসূরিদের ছবি। উজ্জ্বল আলোয় চারদিকে আলোকিত। এমন মায়াবী পরিবেশে আটাশজন মানুষ পাংশু মুখে বসে আছে— ওদের বুকের ভেতর ধুকধুক ধ্বনি বন্ধ। ওদের মুখ দেখলে মনে হয় একটু পর বুঝি ওদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে। ওরা কেউ জানে না যে ওদের ভাগ্যে কী হবে। এই অনিশ্চিত উন্মুখ প্রতীক্ষা মৃত্যুর শামিল। কালকেতু তীরন্দাজ বাহিনীর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ওপর বক্তৃতা করছে। আগের চাইতে অনেক বেশি ক্রূর এবং নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে ওকে। ওর গায়ে কালো কোট। গলায় লাল রঙের টাই, কোটের পকেটে লাল রুমাল বেরিয়ে আছে। আটাশজনের প্রত্যেকেই চাচ্ছে এই রুমালের দিকে না তাকাতে। তাকালেই ওদের মনে হয় এক ভয়াবহ বিষাক্ত ড্রাগন তার লাল জিব বের করে আছে। ওরা সেই লেলিহান জিহ্বার স্পর্শে পুড়ে যাবে।

এই বিবর্ণ মৃতপ্রায় মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কালকেতু কৌতুকবোধ করে। এইসব মানুষকে নিয়ে খেলতে ওর ভালোই লাগে। ওদের মুখ ফ্যাকাসে, চোখ ঘোলাটে, ওদের ধমনিতে কোনো রক্ত চলাচল নেই। ও বেশ কড়া শব্দ চয়ন করে বক্তৃতা করছে। উদ্দেশ্য এদের ঠাণ্ডা করে রাখা। বিচারপতি রমানির পদত্যাগে কালকেতু ক্রুদ্ধ। কিন্তু কোনো মনোভাব প্রকাশ করে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না। এমন ভাব দেখায় যে এসবের ও তোয়াক্কা করে না। একসময় ওর কণ্ঠ থেমে গেলে ও ফুলদানির গোলাপের দিকে তাকায়। থমকে যায় আবেগ। কতদিন আগে যুবক নীলাম্বর পুজোর ফুল তুলে ঘরে ফিরত। একদিন অভিশপ্ত হয়ে ব্যাধের ঘরে জন্ম নিলে ও খুব দুঃখ পেয়েছিল। কিন্তু এখন এই জীবন ওর ভালো লাগছে। ও আর কিছুতেই ফিরে যাবে না স্বর্গে। এই

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নগরের অধিবাসী ওকে দেবতার মতো মানে। ও নিজের একটি স্বর্গ তৈরি করেছে। ও এখন শিব, নাকি ইন্দ্র, নাকি বিষ্ণু। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, আমি সব। আমি একের মধ্যে বহু সত্তার অধিকারী। আমি এক ক্ষমতাবান মানুষ।

সবাই উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কার ভাগ্যে কী আছে কেউ জানে না। এসব কথা কালকেতু আগে থেকে কাউকে বলে না। ও যা কিছু করে তা ওর একদম নিজস্ব। সেখানে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নাক গলাতে পারে না। কালকেতু মনে করে মানুষকে প্রশ্রয় দিলে মানুষ মাথায় ওঠে। তাদেরকে ওপর থেকে দেখাই ভালো। অনেক ওপর—যে ওপরে কেউ হাত দিয়ে ছুঁতে পারবে না। কালকেতু সামনের কাগজগুলো ওলটানোর আগে সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। কেউ, শানিত-বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার অন্তরাল থেকে উদ্বেগ উঁকি দিচ্ছে। কেউ ধুরন্ধর—নিজেকে প্রকাশের ব্যাকুলতা জোর করে চেপে রেখেছে। কেউ বোকা, যে দৃষ্টি দেখলে করুণা হয়—যারা অনবরত তোয়াজ করে ওপরে উঠতে চায়—নিজস্ব কোনো যোগ্যতা তেমন নেই। ভাঁড়ু দত্তকে বোঝা যায় না—ও অবলীলায় নিজেকে নিরেট গর্দভ বানিয়ে রাখতে পারে কিংবা ইঁদুর—অন্ধকারের কাটা যায় স্বভাব। কখনো সাধু—ভালোমানুষি যার স্বভাব—যে কখনো অপরের ক্ষতি করতে জানে না। তাই এই লোকটি কালকেতুর আস্থা অর্জন করেছে। কালকেতু ওকে বিনাদ্বিধায় নির্ভর করতে পারে। তবুও কালকেতু ওকে বশে রাখার জন্য দাবিয়ে রাখে। কখনো গুরুত্বপূর্ণ পদে এনে মাথা তোলার সুযোগ দেয় না। ভাঁড়ু দত্ত অল্পে তুষ্ট। মেরুদণ্ডহীন বলে ওর তেমন বাছবিচার নেই। যা পায় তাতেই বিগলিত চিত্ত। আজো এমন মুখ করে বসে আছে যেন দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন—দেবতাকে তুষ্ট করাই বর্তমান সাধনা। কালকেতু কৌতুক বোধ করে। আপন মনে হাসে। সে হাসির চকিত চমক ঠোঁটের কোলে খেলে যায়। যারা বুঝতে পারে তারা সে হাসির ইশারায় বিব্রত বোধ করে। শুধু বুঝতে পারে না যে কালকেতুর মনে কি আছে। আর যারা নির্বোধ তাকিয়ে আছে তাদের কেবলই অপেক্ষা। কালকেতুর খেলা বোঝা তাদের সাধ্যের বাইরে। কালকেতু পুরু লেন্সের চশমা চোখে দেয়। সোনার ফ্রেমের চশমা, এমন জিনিস এ নগরীতে আর কারো নেই। কালকেতু যা ব্যবহার করে অন্য কেউ তা ব্যবহার করতে পারে না। ওর সব জিনিস ভিনদেশ থেকে বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে আনানো হয়। চশমা চোখে দিলে ওর চোয়ালে একটা ভাঁজ পড়ে—এখন ওকে ক্ষমতালোভী দাম্ভিক শূকরের মতো দেখাচ্ছে, ক্ষুদ্র লেজটি অনবরত নাড়ানো যার অভ্যেস। ও উত্তেজিত হলে, টেনশনে থাকলে, বিপদগ্রস্ত বোধ করলে ওর লেজ নড়ে। সবাই এটা বুঝতে পারে না। সবাই মনে করে কালকেতু বড় বেশি ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু সামলায়। এমন ঠাণ্ডা থাকে বলে কৌশল ওর করায়ত্ত, তাই বিপদ ওকে স্পর্শ করতে পারে না।

সোনার ফ্রেমের চশমায় কালকেতুর চোখের জ্যোতি বেড়ে যায়। ও পরিষদ সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে, ভাঁড়ু দত্তকে দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র। বেশ কয়েকজন বাদ পড়েছে, বেশ কয়েকজন

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নতুন এসেছে। নতুনদের নাম ঘোষণা করা হলে একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। এমন অনেক আছে যাদের নাম কখনো শোনা যায়নি। তাদের কালকেতু কোথা থেকে পেল? এরা কারা? শপথ অনুষ্ঠানের দিন ওদের দেখা যাবে। এমনই কালকেতুর ইনটেলিজেন্স শাখা। ওরা কালকেতুর জন্য নতুন নতুন মাল সংগ্রহ করে। তাদের দিয়ে কালকেতুর বিশেষ কিছু কাজ হাসিল হলে ওদের দূরে নিক্ষেপ করে।

কালকেতু তীরন্দাজ বাহিনীতে অনেক রদবদল করে। যারা অভ্যুত্থানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল তারা নিহত হয়েছে। যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের সবাইকে অবসর দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোয় আরো বিশ্বাসী লোকদের নিয়োগ করা হয়েছে। কালকেতু এখন নিরাপদ বলে নিজেকে মনে করছে। ওর চিত্তে আনন্দ।

সভা শেষ হয়ে যায়। যারা বাদ পড়েছে তাদের মুখে কথা নেই। মনে মনে কালকেতুকে গালি দিলেও মুখে হাসি। ভাবটা এমন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এমন রদবদল হয়েই থাকে। কিছুই যায় আসে না। রমানি বলেই ফেলে, এমন উত্থান-পতনই তো জীবন। কালকেতু ক্ষমতায় থাকলে আমি আবার ক্ষমতায় ফিরে আসব। এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নেই। তারপর ফিসফিস করে বলে, দেবতা তুষ্ট থাকলে ভক্তের দিকে আবার নজর পড়বেই। অকারণে হা-হা করে হেসে নিজের ভেতর পৌরুষের প্রকাশ করে রমানি। কালকেতু গাড়িতে ওঠার সময় রমানির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেও গভীরভাবে হাত চেপে ধরে, চোখে প্রত্যাশার আলো। মনে মনে ভাবে, কালকেতুর ত্রাণ তহবিলে গতবারের চাইতে এবারে বেশি টাকা দিতে হবে। কমপক্ষে পঞ্চাশ লাখ।

বিশাল গাড়িতে কালকেতু চলে যায়। সবাই জটলা করে। পরস্পরকে অভিনন্দন জানায়। কেউ কেউ খুশি কেউ কেউ দুঃখিত। এমন দৃশ্য প্রায়ই ঘটে। বেশ কিছুদিন পরপর কালকেতু পরিষদ সদস্যদের মধ্যে রদবদল ঘটায়। এটা ওর কৌশল। বোঝা মুশকিল। রমানি ধীরেসুস্থে গাড়িতে ওঠে। বুক পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু মুখ খোলার উপায় নেই। প্রকাশ্যে কালকেতুর সমালোচনা করে নিজের আখের নষ্ট করার মানে হয় না। ক্ষমতায় ওকে আবার ফিরে আসতেই হবে। তবুও নিজের আবেগটা ভুস করে উড়িয়ে দেবার জন্য দাঁত কিড়মিড়য়ে দুঠোঁটের ফাঁকে বের করে দেয় শব্দটা, শুয়োরের বাচ্চা!

ওর গাড়ি ছুটে যায় রাস্তায়। দুপাশে বস্তি। ন্যাংটা ছেলেরা ঘুরে বেড়ায়, মেয়েরা ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। নারীরা ইটের চুলোয় রান্না করে, ধোঁয়া ওড়ে। কাগজের টুকরো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি ছড়িয়ে আছে চারদিকে। রাস্তার ওপরে রোদে শুকোচ্ছে শবেবরাতের রুটি। রমানির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বিড়বিড়িয়ে বলে, কালকেতুর তিলোত্তমা নগরী। ওর হৃদয়ে নিষ্ঠুর আনন্দ খেলে যায়। মনে মনে বলে, কালকেতুর কেবল বড় বড় কথা। কেবলই চালবাজি। কী নগরীর শ্রী, তার আবার তিলোত্তমা! রহমানের ডান হাতে তিনটি আকিক, গোমেদ আর প্রবালের পাথর। ও

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেই আঙুলগুলো দিয়ে গলা চুলকোয়। ওর খুব খারাপ লাগছে। ওর ইচ্ছে করছে কোথাও দুদণ্ড বসতে। কিন্তু না, কোথাও ওর যাবার জায়গা নেই, অন্তত আজকের এই মুহূর্তে। এই শহরে কেউ ওর আপন নয়। সবার কাছে ওর প্রয়োজন, অন্যরাও প্রয়োজনেই ওর কাছে আসে। এখনও কারো কাছে গিয়ে থিতু হতে পারবে না। এমনকি ঘরেও না। খবর শুনলে স্ত্রী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। টিটকারি করবে, তীক্ষ্ণ বাণে হুল ফোটাবে। একমাত্র সান্ত্বনা মেয়েটি। ওকে নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলে হয়। ওকি ঘরে আছে? ওর তো অনেক বন্ধুবান্ধব। সারাক্ষণই হৈচৈ করতে ভালোবাসে মেয়েটি। রমানি হতাশা বোধ করে। আগে কখনো এমন খারাপ লাগেনি। তখন ওর মজিদের কথা মনে হয়। রমানির মনে হয় অহংকারও আছে। এক ধরনের মানুষ থাকে যারা খুবই সামান্য কিন্তু চেতনায় ওরা পরাক্রম। মজিদ তেমন। সেজন্য রমানি মজিদকে পছন্দ করে। মজিদের বাড়ির সামনে গাড়ি যাবে না। বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে রমানি গলিটুকু হেঁটে আসে। সামান্য পথ, তবু ওর বুক ধড়ফড় করে। কপালে, গলায় ঘাম জমে যায়। সাফারি ভিজে ওঠে। প্রতিদিনের অভ্যেসমতো দরজা খুলে পত্রিকা পড়ছে মজিদ। রমানিকে দেখে ও প্রথমে অবাক হয়, পরে কৌতুক বোধ করে। রমানি লোকটি ভালো, দিলদরিয়া স্বভাব। লোকজনকে খাওয়াতে ভালোবাসে। ছাত্রজীবনে খাওয়াত বাপের পয়সায়, এখন খাওয়ায় নিজের পয়সায়। মজিদ ওর সঙ্গে করমর্দন করে।

এমন ঘেমেছিস কেন? আয় বোস।

রমানি ফ্যানের নিচে বসে রুমাল বের করে ঘাম মোছে। রঞ্জনা এগিয়ে এলে মজিদ বলে, রঞ্জনা ওকে এক গ্লাস লেবুর শরবত দাও।

কী খবর রে? কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট তো এখনো হয়নি। মন্ত্রিত্ব কখন গেল?

রমানি চোখ গোল করে মজিদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীর গলায় বলে, হয়নি। হবে।

তুই বুঝি কালকেতুর ওখান থেকে এলি?

হ্যাঁ রমানি মুখ নিচু করে।

মজিদ হাসতে হাসতে বলে, খেলাটা এমনি। কেউ জানে না কালকেতুর পায়ের বলটা কার কপালে লেগে ধাম করে গোল করবে।

রমানি এতক্ষণে বড় করে শ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করে, শুয়োরের বাচ্চা।

হা-হা করে হাসে মজিদ। রঞ্জনা শরবত নিয়ে আসে। রমানি গ্লাস নিতে নিতে বলে, কেমন আছেন ভাবি?

ভালো। কী ভাগ্য যে আপনি আমাদের বাসায় এসেছেন।

রঞ্জনা কিছুটা হাসিখুশি উচ্ছল হয়ে ওঠে রমানিকে দেখে। রমানিরও মনে হয় আজ রঞ্জনাকে ভীষণ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। ও অনুভব করে এদের সঙ্গে আজ কাটিয়ে গেলে ওর যন্ত্রণা কমতে পারে।

https://boierhut.com/fb

রমানি ভাই আপনি তো ডিমের হালুয়া খেতে ভালোবাসেন, আমি তৈরি করি? বেশিক্ষণ লাগবে না।

চমৎকার। আপনার হাতের খাবার পেলে তো আমি বর্তে যাই।

কী যে বলেন।

রঞ্জনা চলে যায়। রমানি হাসতে হাসতে মজিদকে বলে, কালকেতুর ওখান থেকে বেরিয়ে এই প্রথম আমার ভালো লাগছে মজিদ। আমি সেজন্য তোর এখানে এসেছি।

জানি, আমি তা বুঝতে পেরেছি। তোদের জীবনে এমনই হবে। তোরা তো তপ্ত বালুর ওপর থাকিস। তাই ছায়া খোঁজা তোদের জন্য দরকারি।

রমানি চুপ করে থাকে। মজিদ হাসতে হাসতে বলে, তবুও জানি ঐ তপ্ত বালুই তোদের কাম্য।

ঠিকই বলেছিস। দেখিস আমি আবার ক্ষমতায় ফিরে যাব।

সেই ভালো। চন্দরের কথা তো তোর মনে আছে রমানি?

হ্যাঁ, খুব মনে আছে। আমি অবশ্য পড়িনি, শুনেছি ও খুব কড়া কড়া প্রবন্ধ লেখে। ওর উপন্যাসও খুব জনপ্রিয়।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

অবশ্য কালকেতু এসবের তোয়াক্কা করে না। বলে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেই কি তাকে গুরুত্ব দিতে হবে?

মজিদ রমানির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ আমরা জানি যে কালকেতু ভালো করেই জানে কাকে গুরুত্ব দিতে হবে, কাকে দিতে হবে না। যাকে গুরুত্ব দিতে হয় তাকে ও পিঁপড়ের মতো মারে। কালকেতুর নিষ্ঠুরতা সীমাহীন।

রমানি চুপ করে মজিদের কথা শোনে। ও বোঝে মজিদ যা বলেছে তার সবটাই সত্যি। কিন্তু ও প্রতিবাদ করে না। মজিদকে হাতে রাখা ওর দরকার। ও সুবিধা-খোঁজার দলে, সবাইকে ওর দরকার। রমানি অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, মজিদ তোর কাছে তো বিসমিল্লাহ খানের সানাই আছে জানতাম। আছে এখনো?

আছে।

নিয়ে আয়। একটু রিলাক্স করি ।

বুঝিছি, তোর এখন দরকার কালকেতুকে মাথা থেকে নামিয়ে দেওয়া। কালকেতু মাঝে মাঝে মাথার প্রেসার ক্রিয়েট করে না রে?

তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে?

রমানি সোফার পেছনে মাথা এলিয়ে দেয়। মজিদ শোবার ঘরে যায় ক্যাসেট আর ক্যাসেট-প্লেয়ার আনতে। এর মধ্যে রঞ্জনার হালুয়া তৈরি হয়। ঘরে পনির আর বাখরখানি ছিল। সবকিছু

https://boierhut.com/fb

নিয়ে আসে রঞ্জনা। সবাই মিলে খায় আর সানাই শোনে। সানাই বাজনা শেষ হয়ে গেলে রমানি বড় করে একটা ঢেঁকুর তোলে। মজিদের কানে সে শব্দ বড় বিশ্রী শোনায়। রমানি হেলান দেওয়ার অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বলে, চন্দরের কথা তুই যেন কি বলছিলি?

ওকে পনের দিন যাবৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বলিস কী?

রমানি মাথা চুলকায়। তারপর মজিদের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, জানতাম ওর সঙ্গে ফুল্লরার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল।

সে তো অনেক কাল আগে চুকেচুকে গেছে। মজিদ বিরক্তি বোধ করে।

রমানি বড় করে শ্বাস ফেলে, কোনো কিছুই কি আর চুকে যায়! এখন তো তিনি আবার এই নগরের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি। কি বলিস?

আমি এসব নিয়ে ভাবি না। আমি ভেবেছি যে কেউ ওকে কিডন্যাপ করেছে।

রমানি চোখ বাঁকা করে তাকায়, ফুল্লরাই বা কিডন্যাপ করবে না কেন?

পারবে না তা নয়। তবে কেন করবে?

রমানি হা-হা করে হাসে, হৃদয়ের খেলা কে বুঝবে?

সে হাসিতে উদ্দীপ্ত হয় রঞ্জনা। হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন রমানি ভাই।

মজিদ ভুরু কুঁচকে রঞ্জনাকে দেখে। সেদিনের পর রঞ্জনা ওর হয়েছিল, আজ রঞ্জনার চেহারায় নতুন রং। ও নিজস্ব পদ্ধতিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। মজিদের সঙ্গ ওকে এমন উৎফুল্ল করতে পারে না। অথচ অন্য কেউ কোনো কারণ ছাড়াই রঞ্জনাকে উৎফুল্ল করে। ফুল্লরা কি কালকেতুকে নিয়ে ক্লান্ত? ও কি চন্দরকে ধরে রেখেছে উৎফুল্ল হওয়ার জন্য? ওহ্, বলে মজিদ মাথা চেপে ধরে ।

কী হলো তোর?

ভালো লাগছে না।

চল, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। হয়তো ভালো লাগবে। আপনিও চলুন ভাবি।

রঞ্জনা ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

জানি না। মজিদ যেখানে যেতে চাইবে।

চলো না গো অনেক দিন কোথাও যাইনি।

মজিদের মনে হয় রঞ্জনার কণ্ঠ থেকে সুশীতল পানির নহর বইছে। শুধু একবারই ঐ নহরের কাছে যাওয়া যায়। ও আচ্ছন্নের মতো বলে, ঠিক আছে তুমি তৈরি হয়ে নাও।

রঞ্জনা খুশি হয়ে চলে যায়। মজিদ ঠাণ্ডা স্বরে বলে, চন্দরের জন্য তোর কিছু করার নেই রমানি?

https://boierhut.com/fb

দেখ এসব ব্যাপার নিয়ে আমি খাটাখাটি করতে চাই না। আমাকে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতেই হবে।

বুঝেছি।

কী বুঝেছিস?

বুঝলাম মানুষের জীবনের চাইতে ক্ষমতার মূল্য তোর কাছে অনেক বেশি।

ঠিক বুঝেছিস। পরের জন্য নাকি কান্না কাঁদার সময় নেই আমার। আমার কোনো বিপদ হলে আমার বউ যদি তোর কাছে সাহায্যের জন্য যায় তা হলেও কি তুই এ কথাই বলবি?

দেখতে হবে সাহায্যের ধরনটা কী? যদি নিজের কোনো ক্ষতি করে সাহায্য করতে হয় তা হলে আমি তেমন সাহায্য করতে পারব না। জানিস তো আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভালোবাসি।

সেজন্য তোকে ধন্যবাদ।

কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?

দূরে কোথাও? কোনো নদীর ধারে।

নদীর ধারে কেন?

মনে এল তাই বললাম।

ঠিক আছে, নয়ারহাটের পরে একটা নদী আছে। চলো সেখানে যাই।

জানিস আমার মন খারাপ হলে আমি বুড়িগঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকি।

হা-হা করে হাসে রমানি, এসব পাগলামি তোদেরকে পোষায়। আমার তো মন খারাপ করারও সময় নেই।

কে বলল নেই? আজ? এখন?

থমকে যায় রমানি। বুকের ভেতরে চড়চড় শব্দ ওঠে। কি ঠিক বলিনি?

বলেছিস?

রমানির কণ্ঠ ম্রিয়মাণ। উঠে ঘরের ভেতরে একটুখানি হেঁটে নেয়। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের সামনে এসে দাঁড়ায়। ক্যালেন্ডারে একটা নদী আছে। নদীর পাড়ে সরষে ক্ষেত। অনেক দূরে একটা তালগাছ। রমানি বিড়বিড় করে, নদী? ছোটবেলায় গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে কত দুরন্ত সময় কেটেছে। বিশেষ করে শীতকালে নদী ছোট হয়ে এলে ঢালু বেয়ে সাঁই সাঁই করে গরুর গাড়িতে নেমে পড়ত। অনায়াসে পেরিয়ে যেত নদী। মাঝে মাঝে ও গাড়ির ওপর উঠে বসত। কী যে মজা লাগত তখন। তখন তো মনে হয়নি নদী এমন আপন। মজিদ আপন ভাবে কেন? মজিদকে কথাটা জিজ্ঞেস করার জন্য ঘুরে দাঁড়ালে দেখল মজিদ নেই। ও যেখানে বসেছিল সে জায়গাটি শূন্য। শূন্য? রমানি ভাবল শূন্যের একটা বিস্তার আছে। শূন্যতা নদীর মতো প্রবাহিত হয়। তার ভেতরে গরুর গাড়ি এসে নামে। সে গাড়িতে দশ বছরের বালক থাকে

https://boierhut.com/fb

যে ঢালু বেয়ে নেমে আসা গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দে হাততালি দিয়ে হেসে উঠত। গাড়োয়ান গরুর লেজ ধরে টান মারত। কী অপরূপ দৃশ্য ছিল সেটি। এখন? এখন ও নিজে সেই গাড়িতে জুড়ে দেওয়া প্রাণী। একজন গাড়োয়ান লেজ ধরে নাড়া দেবার পরই মাত্র ও দৌড়তে পারে। দৌড়তে দৌড়তে নদীতে নেমে যায়। ও বুকের ভেতর ধরে রাখা দৃশ্যটি মনের পর্দায় দেখল। দেখল ছোটবেলার সেই গাড়োয়ানের সঙ্গে কালকেতুর চেহারার হুবহু মিল আছে। লেজ ধরে তাড়া দিয়ে গরুগুলোকে নামিয়ে দিচ্ছে নদীতে। ও কি তা হলে সেই নদী দেখতে যাচ্ছে যে নদীতে ওর অবস্থান? রমানির মাথার ভেতর চক্কর দিয়ে উঠলে ও চেয়ার ধরে নিজেকে সামলে নেয়।

রমানি চোখ তুললে দেখতে পায় দরজায় রঞ্জনা দাঁড়িয়ে। লাল-পেড়ে সাদা শাড়ি পরেছে। কপালে লা টিপ। পিঠের ওপর চুলের গোছা। রমানি মুগ্ধ চোখে তাকায়। রঞ্জনা বোকার মতো হাসে। মন্টি এসে ওকে জড়িয়ে ধরে। মন্টির চুলে সাদা রিবন, পায়ে লাল জুতো। রঞ্জনা ওকে কোলে তুলে নেয়। তারপর দুপা এগিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। রমানির কাছাকাছি। রমানি দুচোখে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে বলে, আপনি রেডি? মজিদ কৈ?

বাথরুমে, আসছে।

আপনার মেয়েটি ফুটফুটে। কী নাম?

মন্টি।

আপনার নাম কী ভাবি?

রঞ্জনা।

বাহ্ চমৎকার। আপনি যেমন সুন্দর, নামটাও তেমন সুন্দর। কি যে বলেন, রঞ্জনা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

আপনি নদী ভালোবাসেন?

না। নদী আমার ভালো লাগে না।

আমারও লাগে না। কিন্তু মজিদ পছন্দ করে।

ওর কোনোকিছুই আমার পছন্দ না।

তাই?

রমানি অকারণে হাসে।

কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?

গুলশানে। চাইনিজ খাব, আইসক্রিম খাব। তারপর গুলশান মার্কেটে ঘুরে বেড়াব। যদি কিছু পছন্দ হয় কিনব।

বাহ্, চমৎকার আইডিয়া। চলুন আমি আপনাকে শাড়ি কিনে দেব।

আপনি যা চাইবেন আমি কিনে দেব। কেনাকাটা করতে আমার খুব ভালো লাগে।

https://boierhut.com/fb

আমারও লাগে। কিন্তু মজিদের তো অঢেল নেই সেজন্য কিছু করা হয় না। তাই আমি মার্কেটে ঘুরে বেড়াই।

আহা কী কষ্ট আপনার।

আমার অনেক কষ্ট। আপনি বুঝবেন না।

রঞ্জনার চোখ ছলছল করে উঠলে রমানির মুগ্ধতা আরো বেড়ে যায়। ওর কাজলটানা চোখের পাতায় কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। তখন মজিদ ঢোকে।

বেরুবি? রেডি?

হ্যাঁ, চল।

শেষ পর্যন্ত মজিদকে কিছু না জিজ্ঞেস করে রঞ্জনার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয় রমানি। ওর মাথার মধ্যে স্বপ্ন—রঞ্জনা ওর শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর শাড়ি পরে রঞ্জনা ওর জন্য ডিমের হালুয়া বানাচ্ছে। বাথরুমে রঞ্জনা ওর শাড়ি খুলে নগ্ন হচ্ছে, রঞ্জনার শরীরে নদীর জল। উত্তেজনায় রমানি নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারছে না। গুলশান দুই নম্বরে কিনটুকি রেস্তোরাঁয় রমানি ওদের নিয়ে আসে। মজিদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এখানে এলি যে?

রমানি মজিদের ঘাড়ে হাত রাখে, আমি তো এখানেই আসব মজিদ। তুই ভালো করে জানিস। আমি হলাম শিল্পপতি। খাওয়া আমার অভ্যেস। না খেলে আমার ভালো লাগে না। তুই বল নদীর বাতাস খাওয়া কি আমার শোভা পায়? তা ছাড়া কালকেতুর সঙ্গে কাজ করে অনেক রকম খেতে শিখেছি। ঐ হারামজাদা নিজেও খেতে জানে, আমাদেরও খাওয়া শিখিয়েছে।

রমানির প্রগল্‌ভতায় মজিদ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। লোকটিকে অশ্লীল, স্থূল মনে হয়।

চল, ভেতরে চল।

দেখ রমানি আমি খাওয়া পছন্দ করি না। জীবনধারণের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুই আমার চাহিদা।

এখানে দাঁড়িয়ে দর্শন আওড়াতে হবে না।

বাবা, চল।

মন্টি হাত ধরে টানাটানি করে। রঞ্জনা বিরক্তি সহকারে বলে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। মজিদ অদ্ভুত বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, ঠিক আছে তোমরা খাও। আমি এ রাস্তা ধরে খানিকটুকু হেঁটে আসি।

রঞ্জনা এক মুহূর্তে দাঁড়ায় না। খুশি হয়ে রমানির সঙ্গে ভেতরে চলে যায়। নিজেকে একা এবং পরিত্যক্ত মনে হয় মজিদের। ও ধীর পায়ে রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাতে উঠে আসে। ওর ভীষণ খারাপ লাগছে। না, রঞ্জনা খারাপ মেয়ে নয়। ও ক্লান্তিকর একঘেয়েমি থেকে মুক্তি চায়। মজিদ কয়দিন বাড়িতে না থাকার ফলে ওর একঘেয়েমি কেটেছিল, এখন রমানি আর এক রকমের ক্লান্তিহরণ

https://boierhut.com/fb

বটিকা। এই খুশিতে রঞ্জনার কয়েকদিন ভালো কাটবে। তারপর? তারপর কী করবে ও? মজিদের মতো লোকেদের স্ত্রীরা এভাবেই সুখ খোঁজে। স্বামীরা সুখ দিতে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ? থমকে দাঁড়ায় মজিদ। ব্যর্থতার সংজ্ঞা কী? ব্যর্থতা মানে কি ফুটপাতে এক দাঁড়িয়ে থাকা? এক প্রবল পরাক্রান্ত পরিত্যক্ত শূন্যতার ঘোরে ওর চোখ জড়িয়ে গেলে দেখতে পায়, রঞ্জনা রমানির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। রকমারি সুস্বাদু খাবার দেখে ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মুখ-গহ্বর ভেসে যাচ্ছে স্যালাইভার সিক্রেশনে। মজিদ দ্রুত হেঁটে অনেকটা পথ পেরিয়ে আসে। মনোরম বিকেল, চারদিকে স্নিগ্ধতা। বাতাস বইছে, গাছের পাতা নড়ছে, পাখি উড়ে যাচ্ছে, চারদিকে মানুষ, মানুষের ভিড়— মানুষের গভীর নিশ্বাস, নিশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মজিদ ব্যাকুল হয়ে সবার মুখের দিকে তাকায়। দেখে তো মনে হয় না কারো মনে কোনো ব্যর্থতার গ্লানি আছে। সবাই কি আপন আপন বলয়ে সুখী? তখন ও একজন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা খায়। ধাক্কা খেয়ে লোকটির কাছে মাফ চাইলে ওর মনে হয় আসলে সকলে রঞ্জনার মতো সুখী। ভিক্ষুকের মতো দুটো পয়সা পেয়েই বর্তে যাচ্ছে। মান-সম্মানের তোয়াক্কা করে না, বিবেকের তো বালাই নেই। হায় কালকেতুর তিলোত্তমা নগরীর মানুষগুলোও তিলোত্তমা, মেকি সৌন্দর্যের আড়ালে অন্তঃসারশূন্য, ফাঁপা। মজিদ নিস্পহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অ্যাসফল্টের মসৃণ রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি ছুটে যাচ্ছে—আইল্যান্ডে সবুজ ঘাস, সাদা এবং গোলাপি রঙের চেরিফুল ফুটে আছে। সোডিয়াম বাতি আলো বিকিরণের অপেক্ষায় বড় বড় বাড়িগুলো রঙিন ফানুস— সাজানো গোছানো, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, আলোকিত—শুধু মানুষ নেই। এই নগরীতে এরা কারা? কোন ভিনদেশি এইসব প্রাণী।

একজন পথচারী মজিদের কাছে এসে দাঁড়ায়, আপনাকে দেখছি অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

এমনি। এদিকে বেড়াতে এসেছি।

আমিও বেড়াতে এসেছি। শহরের এদিকটা এখনো ফাঁকা। দুদণ্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

আমার তো মনে হয় এই নগরে হাঁফ ছাড়ার জায়গা নেই।

পথচারী কথা বলে না। একটুক্ষণ আনমনা হয়। তারপর হেসে বলে, চলেন না পার্কের ঐ বেঞ্চটায় গিয়ে বসি।

চলুন।

দুজনে পার্কে ঢোকে। মজিদ পথচারীর দিকে তাকায়, আপনি কী করেন?

এই যা আমার পরিচয়ই দেওয়া হয়নি। আমার নাম আকবর আলি। স্কুলের টিচার। যেটুকু পড়াই তার চেয়ে বেশি করি টিউশনি। কী করব বলেন। আয়ের সঙ্গে মেলে না যে। সেটুকু টিউশনিই করি যেটুকু করলে সংসারের ব্যয়টুকু মেটে।

অর্থাৎ আপনি এখনো এই লাইনে ব্যবসায়ী হতে পারেননি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আকবর আলি কষ্ট পায়। ভুরু কুঁচকে থাকে। মজিদ তড়িঘড়ি বলে, আমি আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্য বলিনি।

ঠিকই তো বলেছেন। এখন তো এমনই হচ্ছে আমরা তো স্কুলে পড়াই না। পড়াই বাড়িতে। এই গোঁজামিল কোথায় নেই বলুন তো?

গোঁজামিল সর্বত্র।

হো-হো করে অকস্মাৎ প্রাণখোলা হাসি হাসে মজিদ। ওর হঠাৎ মনে হয় আকবর আলির সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালো লাগছে। লোকটি ভণ্ড নয়। এক বুক সরলতা নিয়ে সৎ।

আকবর আলি কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়ে বলে, আপনি হাসছেন, জানেন মাঝে মাঝে অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কষ্টে আবার বুক ফেটে যেতে চায়।।

মজিদ কপট বিস্ময়ের ভান করে, কেন? কষ্ট কেন? নগরের সব মানুষ তো দিব্যি হেসে-খেলে দিন কাটাচ্ছে। এ দিন কি কাটছে? নাকি বুকের ওপর চেপে বসছে? বলুন তো কী আমাদের ভবিষ্যৎ? আমাদের কী হবে?

মজিদ চুপ করে থাকে। বড় কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্ন তো রাতদিন ওকেও ভাবায়। রাস্তার সব বাতি জ্বলে উঠেছে। পুরো সন্ধ্যা হয়নি। চারদিকে বিদায়ী সূর্যের শেষ আলো, মনোরম স্নিগ্ধ।

আকবর সাহেব আপনার কি আলো ভালো লাগছে?

হ্যাঁ খুব। এইসব সামান্য প্রাকৃতিক আনন্দের জন্যই আমি ঘর ছাড়ি তখন কাউকে আমার ভালো লাগে না। যদি একা ঘুরে বেড়াই। আজ বড় আকস্মিকভাবেই আপনার সঙ্গে আমার এই আলাপ।

কথা বলতে কি আপনার ভালো লাগছে?

আকবর আলি হেসে ফেলে, আপনার সঙ্গে লাগছে। ওর পান-খাওয়া দাঁতগুলো লাল। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, বগলের কাছে ছেঁড়া। ইস্তিরিবিহীন পায়জামার নিচের অংশ ময়লা হয়ে আছে, পায়ে বাটার স্যান্ডেল। মজিদ মনে মনে বলে, তবু লোকটির ভেতরে কিছু চিন্তা আছে। যে চিন্তা দিয়ে মানুষ নিজের পারিপার্শ্বিক বুঝতে পারে। সে বোঝা দিয়ে ও ভালো থাকতে চায়। তাই ও এমন নিঃসঙ্গ। কালকেতুর নগরে মানুষগুলো এমন বিচ্ছিন্নই। যে যার স্বার্থ নিয়ে অসম্ভব মগ্ন কিংবা ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় সকাল-সন্ধ্যা উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় বলেই একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ নেই।

কী ব্যাপার আপনি চুপ করে রইলেন যে?

মজিদ ম্লান হাসে, এমনি। আপনি আসলে ভালো মানুষ।

ভালো আর থাকতে পারলাম কৈ? নিজের জীবিকার সঙ্গেই তো আমার সততা নেই।

হো-হো করে হাসে আকবর আলি।

https://boierhut.com/fb

ঠিক আছে, আসি।

মজিদ হাত মেলায়। আলি আকবরের সঙ্গে হাঁটতে চায়, কিন্তু পরক্ষণে ওঠে না। বসে দেখে আলি আকবরের চলে যাওয়া। মনে হয় ঐ মানুষটির ভেতর থেকে একটি কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে, ওর সারা শরীরে ঝুমঝুম শব্দ। শব্দ ছড়িয়ে যায় শহরের রাস্তায়—বাড়ি-ঘরে—ইলেকট্রিক তারে—পাখির ডানায়। শব্দ চলে যায় দূর-দূরান্তে। মজিদের বুকের ভেতর অপার্থিব আনন্দ জেগে ওঠে। এখানেই হবে। মানুষের এসব ভাবনা দিয়ে একদিন রাজপথ উচ্চকিত হবে এবং ধসে যাবে কালকেতুর তাসের প্রাসাদ।

ও ধীর পায়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকে। ভাবে, এখন ওকে ফিরতে হবে। কোথায়? যেখানে রঞ্জনা খানিকটা সুখের আশায় ওর বন্ধুর সঙ্গে রেস্তোরাঁর উপাদেয় খাবার খাচ্ছে। ওর মেয়েটিও শরিক হয়েছে। হঠাৎ মজিদ দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে—রাজপথে ওর ছায়া বিশাল হয়ে ওঠে। পথের এপাশ-ওপাশ জুড়ে বিস্তৃত হয় সে ছায়া। ওর মনে হয় রাস্তার দুপাশের লোকজন সে ছায়া দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। চারদিকে মানুষ আর মানুষ। মানুষের মাঝ দিয়ে পথ ঠেলে এগুচ্ছেও। কেউ কেউ ওর হাত ধরছে। সে হাত কেবলই বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে। এসব ভাবতে ভাবতে শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি খায় ও। সামনের খোলা ম্যানহোলে পা আটকে গিয়ে উলটে পড়ে যায় ও। আশপাশের লোকেরা এসে টেনে তোলে।

প্রশ্নবাণ ছুটে আসে চারদিক থেকে।

কী ব্যাপার এতবড় গর্তটা দেখতে পাননি আপনি?

কেমন মানুষ? কোন দিকে তাকিয়ে হাঁটছিলেন?

উনি বোধহয় কিছু চিন্তা করছিলেন?

এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলে কি চলে?

মজিদ কারো সঙ্গেই কথা বলে না। সবার মুখের দিকে বোকার মতো তাকায়। ওর হাতে তালু এবং কনুইয়ে লেগেছে। ব্যথা হচ্ছে। চিনচিনে জ্বালা ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। তেমন কিছু হয়নি দেখে একে একে সবাই চলে যায়। মজিদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খানিকটুকু হাঁটে। তারপর একটা রিকশা নেয়। ও ভেবে দেখল অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। এতক্ষণে ওর রঞ্জনার কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল।

গাড়ির কাছে ও যখন এল সবাই ওর জন্য উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়। রঞ্জনা ভুরু কুঁচকে বলে, এতক্ষণে এলে? আমরা কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

রমানি চোখ আকাশে তোলে, আমরা খেলাম, শপিং করলাম তবুও তোর পাত্তা নেই।

দেখ তো কাণ্ড! আমি এত নিষেধ করলাম তবু রমানি ভাই আমার জন্য কতগুলো শাড়ি কিনেছে।

https://boierhut.com/fb

কী যে বলেন না ভাবি। আপনার মতো মেয়েদের প্রচুর শাড়ি থাকতে হয়। শাড়িই তো মেয়েদের প্রাণ।

ঠিক বলেছেন। অন্ধকারেও রঞ্জনার মুখের হাসি আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন রঙিন ফানুস, চিরস্থায়ীভাবে জ্বলে উঠেছে।

শেষ বাক্যটি আসে মন্টির কাছ থেকে, আব্বু দেখো আমার পুতুল। চোখ খুলছে আর বন্ধ করছে।

মজিদ কোনো দিকে না তাকিয়ে বলে, তুই ঘরে ফিরবি না রমানি? ভাবি হয়তো চিন্তা করছেন।

রমানি শব্দ করে হেসে ওঠে, আমার জন্য ও চিন্তা করে না। জানে গোয়ালের গরু একসময় না একসময় ফিরবেই। তোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, আমার শরীর খারাপ লাগছে।

তুমি সবসময় এমনই করো। নিজে তো কোথাও নিয়ে যাও না। একটু বেড়াতে বেরিয়েছি কি তোমার শরীর খারাপ হতে শুরু করল।

রঞ্জনার ঝনঝন-কণ্ঠ চারদিকে ছড়িয়ে যায়। অবসন্ন বোধ করে মজিদ। রমানি চাপা কণ্ঠে রঞ্জনাকে ধমক দেয়, আহ্ রঞ্জনা এমন করে বলে না।

মজিদ রমানির চাপা-কণ্ঠ উপেক্ষা করে। গাড়ি ছুটে চলে সাঁই সাঁই। ঠাণ্ডা বাতাসে মজিদের মাথা খোলাসা হতে শুরু করে। শরীরে চিনচিনে জ্বালা করতে থাকে। কেউ কোনো কথা বলে না। মন্টি রঞ্জনার কোলে ঘুমিয়ে গেছে। মজিদের পায়ের কাছে ওর পুতুলটা পড়ে আছে। মজিদ জুতোর তলে পুতুলটা চেপে ধরে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় রমানি বলে, অনেক, অনেকদিন পর আজ বড় ভালো সময় কাটল রে। যতটা কষ্ট পাওয়া উচিত ছিল তোদের জন্য তা হয়নি। আসি রঞ্জনা।

রমানির গাড়ি ছেড়ে যায়। তার আগে ড্রাইভার পাঁচ-ছয়টা শাড়ির প্যাকেট বাসায় দিয়ে এসেছে। রমানি এই অল্পসময়ে রঞ্জনাকে ভাবি থেকে রঞ্জনা ডাকছে। ভালো সময় তো ওর কাটবে। এমন ভালো সময় পাওয়ার ভাগ্য অনেকের হয় না। রঞ্জনা উজ্জ্বল মুখে শাড়িগুলো খুলছে। বিছানার ওপর বিছিয়ে ফেলেছে। ওর খুশির শেষ নেই।

মাগো এত শাড়ি একসঙ্গে আমি দেখিনি। আজ যে কী ভাগ্য আমার! জানো, রমানি ভায়ের পছন্দ খুব ভালো। নিজেই সব পছন্দ করে কিনেছে। প্রত্যেকটা শাড়ি সুন্দর না?

মজিদ উত্তর না দিয়ে বাথরুমে ঢোকে। ওর শরীরের জ্বালা কমেছে। সেই জ্বালা এখন স্থির হয়ে গেছে মগজের কোষে। হাত-মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে আসে ও। মজিদ যে কোনো উত্তর দেয়নি সেটা রঞ্জনা খেয়ালই করেনি। আপন খুশিতে মগ্ন ও। মজিদ কাজের মেয়েকে ডাকে, মনু ভাত দে? শোবার ঘর থেকে রঞ্জনা চেঁচিয়ে বলে, তুমি খেয়ে নাও। আমি তো খেয়ে এসেছি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মজিদ একগ্লাস পানি খায়। বুঝতে পারে যে ওর ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল। বুকটা এতক্ষণে শীতল হলো। মনু ভাত তরকারি নিয়ে এসেছে। শুঁটকি মাছ রেঁধেছে ও। শুঁটকি মাছ মজিদের প্রিয়। ও ভাত খেতে শুরু করে। শুনতে পায় রঞ্জনা গান করছে। হয়তো মন্টিকে ঘুম পাড়াচ্ছে। অন্যদিনের চাইতে আজ কণ্ঠ উঁচু। চেয়ারের ওপর পা উঠিয়ে বসে মজিদ। অন্যদিনের চাইতে অনেক বেশি সময় নিয়ে ভাত খায়। মনে হয় ভাত খেতে ভালো লাগছে। ভাত খুব উপাদেয় খাবার। সঙ্গে শুঁটকি মাছ থাকলে সেটা অমৃত লাগে। ছেলেবেলায় মা বলত, পেট বেলুন। যত ভরবি ততই সেটা বাড়তে থাকবে। মজিদ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করত, কত বাড়বে মা? ফেটে যাবে না?

মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসত। প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়ে বলত, পেট কখনো ফাটে না। মজিদের মনে হয়, যে পেট ফাটে না সেটা কালকেতুর পেট। ওর তো মনে হচ্ছে খাওয়া বেশি হয়ে যাচ্ছে, এখনি বন্ধ করা উচিত। ও বন্ধ করে। হাত গুটিয়ে নেয়। কিন্তু কালকেতু বন্ধ করে না এবং হাত গুটায় না। প্রকৃত অর্থে কালকেতুর পেটটাই আসলে বেলুন। ও এ নগরে সবকিছু খেতে চায়। ওর পারিষদ ভাঁড়ু দত্তদের ছিটেফোঁটা দেয়। এতেই ভাঁড়ু দত্তরা খুশি। মজিদ পানি খেয়ে, হাত ধুয়ে শোবার ঘরে আসে। রঞ্জনা ঘুমিয়ে গেছে। মজিদ ওকে এক পলক দেখে। রঞ্জনা শাড়িগুলো ভাঁজ করে শাড়ির বাক্সে ভরে আলমারির সামনে মেঝের ওপর রেখে দিয়েছে। শাড়িগুলো ও আলমারির ভেতরে ঢোকায়নি। হয়তো কাল সকালে ওগুলো আবার নাড়াচাড়া করবে—মেলেখুলে দেখবে—খুশিতে রঞ্জনার ভুবন আলোময় হয়ে যাবে। এবং সেখানে মজিদের কোনো উপস্থিতি থাকবে না। সেখানে থাকবে রমানি—যে কোটিপতি—এ দেশের হাতেগোনা কয়েকজনের একজন।

ও টেবিলের ওপর থেকে রেডিওটা নিয়ে বৈঠকখানায় আসে। বাতি বন্ধ। রাস্তার বাতি থেকে আলো এসে পড়েছে ঘরে। দরজা খোলা। মজিদের ইচ্ছে করে আজ একটি পান খেতে। পরক্ষণে ভাবে, থাক। কাজের মেয়েটিও খেয়ে শুয়ে পড়েছে। বাড়িতে কেউ জেগে নেই। ও রেডিও ছাড়ে। সংবাদপ্রবাহ হচ্ছে। গত সপ্তাহে কালকেতুর কৌটিল্য যে বক্তৃতা দিয়েছিল রেডিওতে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলছে। কালকেতুর কৌটিল্য বলেছে, 'আমরা অস্টারিটি কালচার ভুলে গেছি। একটা কনজাম্পশন ওরিয়েন্টেড সোসাইটি হয়ে গেছি। অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষা করে এনে ভোগ করছি।' রেডিওর ভাষ্যকার এর ওপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। গা চিড়বিড়িয়ে ওঠে মজিদের। নিঃশব্দে রেডিও বন্ধ করে উঠোনে নেমে আসে। কেমন অস্থির লাগছে। ঘুম আসবে না আজ। আকাশে গোল চাঁদ। ভরা পূর্ণিমা নয়, ক্ষয়ে যাওয়া অংশ। এই ছোট্ট জায়গাটুকুতে দোপাটি লাগিয়েছে রঞ্জনা। ফুল ফোটেনি। প্রতিদিন পানি দেয়। সব মৌসুমে রঞ্জনা ফুল গাছ লাগায়। দোপাটি, ডালিয়া, সূর্যমুখী, কসমস, গাঁদা যখন যা পায়। মজিদের মাথার মধ্যে কৃচ্ছের সংস্কৃতি ভর করে। এই নগরের কোথাও কি কৃচ্ছ আছে? বড় বেশি ঢালাও এর আয়োজন। মনে তো হয় না এটি একটি দরিদ্রতম নগর। মজিদ পায়চারি করে। একসময় রান্নাঘর খুলে কেরোসিন আর দিয়াশলাই আনে। থমকে

https://boierhut.com/fb

দাঁড়ায় সিঁড়ির ওপর। বলে, অস্টারিটি কালচার অর্থাৎ কৃচ্ছের সংস্কৃতি। কৃচ্ছের সংস্কৃতি যারা করে না তারা কারা? তারাই তো অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষা করে এনে ভোগ করে। মজিদ শোবার ঘরে আসে। রঞ্জনার শাড়ির প্যাকেটগুলো নিয়ে আসে উঠোনে। আবার থমকে দাঁড়ায়। ভাবে, সাধারণ মানুষ তো কৃচ্ছের সংস্কৃতির মধ্যেই আছে। ওদের ভোগ কোথায়? ভোগ তো একটা বিরাট শব্দ। সাধারণ মানুষ তো ভোগ বোঝে না। বোঝে লবণ আর পান্তা। একটা আনতে গেলে আর একটা ফুরিয়ে যায়। তা হলে কার জন্য কালকেতুর কৌটিল্য অমন অমন বাণী নিক্ষেপ করে? ওর নিজের জন্য এবং রমানিদের জন্য। যারা পরের স্ত্রীকে খাইয়ে এবং শাড়ি কিনে দিয়ে ভোগবাদী হয়ে ওঠে। তা হলে এইসব ভোগের ওপর তো বহ্নি উৎসব হওয়া উচিত।

কৃচ্ছের সংস্কৃতিতে তো আমাদের জীবনযাপন করতে হয় রঞ্জনা। তুমি কেন ভোগবাদী হবে। রমানিরা এইসব করে অন্যদের উপদেশ দেয়। চলো আমরা ওদের ভোগে আগুন জ্বালাই।

মজিদ শাড়িগুলো জড়ো করে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

দাউ দাউ জ্বলে ওঠে আগুন—আলোকিত হয়ে যায় চারদিকে। বাড়ির বাইরে নৈশপ্রহরীর বাঁশি বাজে। মজিদ সিঁড়ির ওপর বসে থেকে আগুন দেখে। পোড়া কাপড়ের গন্ধে চারদিক পরিব্যাপ্ত হয়। ওর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ওর সামনে থেকে মুছে যায় ছোট্ট উঠোন—জেগে ওঠে প্রান্তর। আগুন পেরিয়ে যায় লোকালয়, মাঠ, ধানক্ষেত এবং দিগন্ত। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে। যে মানুষ মশাল নিয়ে ছুটছে সে মশালের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে কালকেতু।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রাতে ভালো ঘুম হয়েছে কালকেতুর। এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। দুর্গত এলাকা সফর করে গতকাল ফিরেছে ও। অসংখ্য লাশ এবং বিধ্বস্ত জনপদ দেখে সাময়িক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, খারাপ লাগছিল। দুদিন আগে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চল খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনো কোনো জনপদ একদম ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখানে কোনো কালে যে বসতি ছিল মনেই হয় না। গতকাল পর্যন্ত মানুষের আহাজারি ওর দুকান ভরে বেজেছে এবং খারাপ লেগেছে। এখন লাগছে না। ও হাঁসের ডানা থেকে পানি ঝেড়ে ফেলার মতো মন থেকে এইসব সেন্টিমেন্টাল ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দেয়। কালকেতু যতক্ষণ মানুষের মধ্যে ছিল ততক্ষণ তার চেহারায় দুঃখ ভাবটা ফুটিয়ে রেখেছিল। ক্রমাগত মানুষকে সহানুভূতি জানিয়েছিল। মানুষগুলো ভেবেছিল এমন প্রাণপ্রিয় মানুষ হয় না। ওরা কালকেতুর কাছে নিজেদের দুঃখের কথা উজাড় করে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এখন এইসব কথা ভাবতে কালকেতুর গা গুলিয়ে উঠছে। ও নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ভালো লাগার বোধে প্রবেশ করতে থাকে। ফলে মনে হচ্ছে এই ষাটের ওপর বয়সেও শরীরটা বেশি ফিট। প্রভাতের নিয়মমাফিক কাজগুলো শেষ করে ও খাবার টেবিলে আসে। টেবিলে নাস্তা শেষে আসে কালো কফি এবং খবরের কাগজ। কাগজজুড়ে লাশের ছবি, বিধ্বস্ত এলাকার ছবি। ও খবরের কাগজ বন্ধ করে রাখে। গতকাল থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরে ভিনদেশ থেকে অসংখ্য শোকবার্তা আসছে। সেগুলোও ওর কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো রিলিফ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে যে, কোন দেশ কত রিলিফ পাঠাচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তার কাছে পাঠাতে। রিলিফ তো সোনা। রিলিফ জীবন। দুর্গত এলাকায় আর কতটুকুই বা পাঠাতে হবে। গরিব মানুষের পেটের চামড়া তো পিঠের সঙ্গে লেগে থাকে। ওরা সামান্য পেলেই তুষ্ট। রিলিফের চিন্তায় কালকেতু টেবিলের ওপর তাল ঠোকে। এ ব্যাপারে ওর পররাষ্ট্র দপ্তরও তৎপর। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বিদেশ থেকে রিলিফ ম্যানেজ করতে পারে। কালকেতুর হৃদয় খুশিতে পূর্ণ হয়ে যায়। ও প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কালো কফি এক চুমুকে শেষ করে ফেলে। সাধারণ মানুষের জীবনের বিনিময়ে কালকেতুর হৃদয়ে থৈ থৈ নৃত্য। ও শিস বাজাতে বাজাতে একতলায় অফিস ঘরে আসে।

সেখানে অপেক্ষা করছিল ভাঁড়ু দত্ত। বিগলিত হাসির সঙ্গে কালকেতুর পদচুম্বন শেষ করে। কালকেতু চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে খবর কী? সবকিছু মঙ্গল তো?

ভাঁদু দত্ত বিগলিত হয়ে যায়, মঙ্গল, চারদিকে মঙ্গলের জয়ধ্বনি। ব্যবসা জমজমাট, দালালিতে মোট টাকা আয় হচ্ছে, রিলিফ আসছে অগাধ। এত মালপানি একসঙ্গে কামাই হয়নি।

আর নগরের অবস্থা?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নগর তো আমাদের হাতের মুঠোয়। ও নিয়ে ভাবনা কী?

ভুল করছেন। এত বেশি নিশ্চিন্ত থাকা ভালো নয়। দেখলেন না কিছুদিন আগে কেমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

ভাববেন না সব ঠিক হয়ে গেছে। বাজেটে তীরন্দাজ বাহিনীর খাতে পঁচাশি থেকে নব্বই ভাগ বাড়িয়ে দেওয়াতে ওরা খুশি। কেউ আর অভ্যুত্থান করে মরতে চাইবে না।

জনগণ?

জনগণ তো আপনার জন্য ফুলের মালা নিয়ে তৈরি। ওরা সন্তুষ্ট। আমরা যা করেছি এ দেশের জনগণ এক জীবনে এত উন্নয়ন দেখেনি। কী করিনি আমরা? রাস্তাঘাট, সেতু-কালভার্ট, দালানকোঠা, পার্ক-লেক কত কী?

আর জনগণের নেতারা?

ওরা এখন চুপ। আপনার কৌশলের সামনে ওরা খামোশ। নিজেদের ভেতরে কোন্দল তো বেধেই আছে। সেটাই আমাদের লাভ।

শাবাশ! এই তো চাই। আমার তীরন্দাজ বাহিনী কেমন রিলিফ ওয়ার্ক করছে?

চমৎকার! ওদের কোনো তুলনা হয় না।

হ্যাঁ, এই কাজটি ওরা খুব ভালো পারে। সেজন্যই ওদেরকে পাঁচ টাকা সের চাল আর ছয় আনা সের ডাল দেই। কি না দিচ্ছি আমি?

আপনি ঢেলে দিচ্ছেন। এমন কেউ দেয়নি। ওদের কাছে এই জীবন তো স্বর্গ।

স্বর্গ? স্বর্গ শব্দে আনমনা হয়ে যায় কালকেতু। ওর চেহারায় বিষাদের পলকা ছায়া দেখে ভাঁড়ু দত্ত আর কথা বাড়ায় না। কালকেতু আপন মনে বলে, স্বর্গে আমি ছিলাম। কী কষ্ট করেছি। ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটার ঘায়ে আমার দুহাত রক্তাক্ত হয়েছে। নিরম্বু উপবাসে তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করতাম। সে স্বর্গের কথা চিন্তা করলে আমার গা শিউরে ওঠে। সেজন্যই তো এই নগরকে আমি স্বর্গ বানিয়েছি। সব সুখই আমি এখানেই ভোগ করে যেতে চাইযে মৃত্যুর পরে আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা না থাকে।

এ কথা শুনে ভাঁড়ু দত্ত দুহাত ওপরে তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে, আমাদের ওপর ভগবানের অশেষ দয়া। আপনার কোনো আকাঙ্ক্ষা তিনি অপূর্ণ রাখেননি।

কথাটা সত্যি নয় ভাঁড়ু দত্ত।

সত্যি নয়?

না আমার আরো কিছু পেতে হবে।

ভাঁড়ু দত্ত চুপ করে থাকে।

কালকেতু রক্তচক্ষু মেলে তাকায় আমার কী নেই বলো তো?

https://boierhut.com/fb

সন্তান।

ভাঁড়ু দত্ত অবলীলায় উত্তর দেয়। ও জানে এই মুহূর্তে কথাটি বলা দরকার। নইলে কালকেতু ভীষণ রেগে যাবে। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলতে না পারলে কালকেতুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

ভাঁড়ু দত্তের উত্তরে কালকেতুর দৃষ্টি নেমে যায়। আস্তে করে বলে, হ্যাঁ ঠিক। আমার একটি সন্তান চাই।

আপনি চাইলে নিশ্চয় সে ব্যবস্থা হবে। একটি শিশু জোগাড় করা এমনকি কঠিন কাজ। আপনি কেবল মনস্থির করুন।

হা-হা করে হেসে ওঠে কালকেতু, মনস্থির করলেই কি হবে? দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে?

হাসতে হাসতে কালকেতুর চোখ লাল হয়। ভাঁড়ু দত্ত একদৃষ্টিতে কালকেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারছে না যে ও কী চায়। এতবড় নগর যার হাতের মুঠোয়, এত যার ধন-সম্পত্তি তার কী আর কিছু চাইবার থাকতে পারে।

হঠাৎ করে কালকেতু প্রসঙ্গে পালটায়, থাক এসব কথা। আজকে খবরে কাগজগুলোর ওপর আমি বিরক্ত।

ভাঁড়ু দত্ত জিজ্ঞেস করল না যে কেন? বরং কালকেতুর পরবর্তী কথার আশায় চুপ করে থাকে। কালকেতু নিজ থেকেই বলুক কেন। ভাঁড়ু দত্ত এই পরিমিতি বোধের জন্য টিকে গেছে। ও কখনো অনাবশ্যক কৌতূহল দেখায় না, কখনো অতিরিক্ত কথা বলে বিরক্তি উৎপাদন করে না। এবং ওর সবচেয়ে বড় গুণ যেটা সেটা হলো প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে। লোকে যেটাকে বলে, তেল দেওয়া। কালকেতু অফিসের খবরের কাগজগুলো দেখে দূরে ছুড়ে মারে। বলে, আমার তীরন্দাজ বাহিনী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্গত এলাকায় রিলিফ দিচ্ছে অথচ এই কাগজগুলো একটি প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেনি। ওদের ছবিও ছাপেনি।

সত্যি দুঃখ রাখার জায়গা নেই। এ নগরের জনগণ এমনই অকৃতজ্ঞ। আপনি রেডিও-টেলিভিশনকে বলুন আমার তীরন্দাজ বাহিনীর কৃতিত্বের খবর ফলাও করে প্রচার করতে। জানুক, সবাই জানুক। ওদের খবর প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক। কৃতজ্ঞ নগরবাসী ওদের বরণ করে নিক।

ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর গদগদ আবেগে অস্বস্তি বোধ করে। ও কিছুটা বিব্রতমুখে মাথা নাড়ে। কালকেতু আপন খুশিতে মগ্ন থাকায় ভাঁড়ু দত্তের বিব্রতভাব দেখতে পায় না। ভিনদেশ থেকে আসা শোক বাণীগুলো দেখতে থাকে। ওর সোনার ফ্রেমের চশমায় ভাঁড়ু দত্তের দৃষ্টি ঠিকরে পড়ে। ভাঁড়ু দত্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। কালকেতু না জানুক কিন্তু ও তো জানে তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নগরবাসী প্রসন্ন নয়। ওরা বলে, জনগণের করের টাকার সিংগভাগ ভোগ করে ওরা। ওদের রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ ওরা কালকেতুর ক্ষমতার উৎস।

অসংখ্যা লোকের কাছে এইসব শুনে ভাঁড়ু দত্ত কিছুটা হতচকিত। তবু কালকেতু যা চায় সেটা তো হতেই হবে। যতদিন কালকেতু ততদিন ভাঁড়ু দত্ত। নইলে তো ও খরচের খাতায় উঠে যাবে, এটা ও ভালো করেই জানে। পরক্ষণে ওর মনে হয় কালকেতুকে আর একটি আইডিয়া দেওয়া যায়। তীরন্দাজ বাহিনীর ওপর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানিয়ে রাখলে বিশেষ বিশেষ দিনে সেটা দেখানো যাবে। এটা প্রচারের আর একটি ভালো মাধ্যম।

ভাবতে ভাবতে ভাঁড়ু দত্ত দোতলায় উঠে আসে। ফুল্লরার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। গতরাতে একটুও ঘুমোতে পারেনি। তবু মাথার মধ্যে ক্লান্তি নেই, আছে ঝাঁ ঝাঁ ভাব। চোখের ভেরত থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়। কেউ কোথাও নেই। ড্রইংরুম খোলা, ফুলদানিতে তাজা ফুল। সকালবেলা বাগান থেকে তুলে আনা হয়েছে। ভাঁড়ু দত্ত একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝতে পারে না যে ফুল্লরাকে কীভাবে কথাটা বলবে। ফুল্লরা ভীষণ রেগে যাবে, তখন ওর কি করার থাকবে? নিঃশব্দে পা জড়িয়ে ধরা ছাড়া ও আর কিইবা করতে পারে। ও বিশাল ফুলদানির সামনে এসে দাঁড়ায়। ফুলের পাপড়ি স্পর্শ করে। পাপড়িগুলো ভেজা। কৈ গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। পাপড়িগুলো ভিজল কীভাবে? গতরাতে ও মল্লিকার গালে দুটো চড় মেরেছে। মল্লিকার টকটকে গায়ের রঙে পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছিল। রাতভর কেঁদেছে মল্লিকা। ভাঁড়ু দত্ত দাঁত কিড়মিড় করে, ঐ চড় মল্লিকার প্রাপ্য ছিল। ওকে মেরে ফেলা উচিত ছিল। ফুল্লরার সঙ্গে ব্যবসার ব্যাপারে কেউ যদি জটিলতা সৃষ্টি করে তবে তাকে মেরে ফেলাই উচিত। এই একটি ব্যাপারে নিজের স্ত্রীকেও ক্ষমা করতে রাজি নয় ভাঁড়ু দত্ত। পেকে ওঠা গোঁফের ওপর তর্জনী বুলোয়, এটা ওর অভ্যেস। মাথার ওপর হাজার চিন্তা গজিয়ে উঠলে ও এভাবে তর্জনীর ব্যবহার করে। গোঁফের মাথাগুলো নাকের ফুটোর নিচে চুপচাপ এলিয়ে তাকে, পোষা কার্পেট ডগ যেন, অসম্ভব প্রভুভক্ত। বেয়ারা এসে ড্রইংরুমে দাঁড়ায়!

স্যার?

ম্যাডামকে আমার কথা বলো।

বলেছি স্যার।

বলেছ? কখন বললে?

আপনাকে সিঁড়িতে দেখেই খবর দিয়েছি।

বাহ্ তুমি হেভি স্মার্ট তো।

হব না, সবই যে ম্যাডামের শিক্ষা।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেয়ারার মোচসর্বস্ব মুখে দন্ত বিকশিত বিগলিত হাসি। ভাঁড়ু দত্ত কৌতুক বোধ করে। ভাবে, একেই কি বলে আকর্ণ বিস্তৃত? হ্যাঁ, তাই।

ঠিক আছে তুমি যাও।

চা দেব স্যার, না কফি? কফি দিও। কালো কফি সঙ্গে স্ন্যাক্স।

বেয়ারা মাথা নেড়ে চলে যায়। ভাঁড়ু দত্ত ঘরের মাঝখানে আসে। পুরু কার্পেট পা দেবে যায়। পশ্চিম দিকে দেয়ালে বিশাল পেইন্টিং। ও দূর থেকে সে ছবি বোঝার চেষ্টা করে। যৌবনে একবার বোঝার চেষ্টা করেছিল অজন্তার পাহাড়ের গুহায় এবং পাহাড় কেটে তৈরি করা ইলোরার মন্দির। মানুষের সে কী অসাধ্য সাধন! বছরের পর বছরে ধরে শুধু তৈরি হয়েছে ইলোরার বিস্ময়কর শিল্পকর্ম। অজন্তার গুহাবাসী মানবেরা গুহার ভেতর বসে জীবন্ত করেছে প্রভু বুদ্ধকে। এই সাধনায় মগ্নতা আছে। ও মনে করে অজন্তার গুহা-চিত্র ধ্যান। সেটা মানুষের পক্ষে সম্ভব। কারণ মানুষ জগৎসংসার ভুলে ধ্যানে নিমগ্ন হয়। তার মাথার ওপর ছাদ ছিল, চারপাশে দেয়াল ছিল, হিংস্র পশুর ভয় ছিল না। তাই মনে হয়েছে এই কাজ মানুষের কাজবড় বেশি ভালোবাসার কারুকাজ। কিন্তু ইলোরার কাজটি কী করে সম্ভব? খোলা আকাশের নিচে পাথর খোদাই? ঝড়-জল বয়ে গেছে গায়ের ওপর দিয়েরোদ ঝলসে দিয়েছে চামড়ানিদাঘ দিন তৃষ্ণায় বুকের ছাতি চৌচির করে দিয়েছে। কী অমানুষিক পরিশ্রম! এ কাজ কি মানুষেরই কাজ। এটিও ধ্যান। ঝড়-জল উপেক্ষা করে রোদ গায়ে মাখে নাপিপাসার কথা ভুলে যায়। ইলোরা-অজন্তার শিল্পকর্ম দেখে ও যৌবনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, শিল্পী হবে। একজন শিল্পী হওয়ার চাইতে আর মহৎ কিছু নেই। তখন ও জীবন সম্পর্কে এক বিশাল ধারণা গড়ে তুলেছিল। সে ধারণায় দীর্ঘদিন ও বেশ সুখ অনুভব করেছিল। কিন্তু এখন? কোথায় উবে গেল শিল্পী হওয়ার চিন্তা। ও মনে করে না যে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হয়েছে। নিয়তই ভাবে জিতেছে, জেতাটাই সুখ। মাথায় এখন ইলোরা-অজন্তার ছায়াও নেই, পাহাড় খোদাই কি ও জানে না। ওর মগজে অজন্তার গুহাচিত্রের ধ্যানস্থ বুদ্ধ নেইসেখানে কোনো গাঢ় নীল রং ফুটে ওঠে না। এখন ও বোঝে ব্যবসা, হেরোইনের গোপন ব্যবসা, ইনভয়েসিং, ইনডেনটিং, কনস্ট্রাকশন, ইন্ডাস্ট্রিচমৎকার খেলে যায় মগজের শিরায় শিরায়। সেটা আরো পুষ্পিত হয় ফুল্লরার মতো শক্তিশালী ডান হাত থাকলে। সুতরাং এখানে যদি মল্লিকার মতো অষ্টাদশী হস্তক্ষেপ করে তবে ভাঁড়ু দত্ত সহ্য করবে কেন? আহ্ সুন্দরী মল্লিকা! ওর তৃতীয় স্ত্রী, ওকে ভালোবেসে ঘরে আনেনি ভাঁড়ু দত্ত। এনেছে লোভে, লালসায়—মল্লিকার নগ্ন শরীরের অসাধারণ বাঁক দেখলে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সেখানে পৌঁছুতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু মল্লিকা চায় ভাঁড়ু দত্তের সম্পত্তির সাম্রাজ্য। অন্য দুজন স্ত্রী এবং পাঁচজন সন্তানকে উপেক্ষা করে কীভাবে তা সম্ভব। কিড়মিড় করে ওঠে ভাঁড়ু দত্তের দাঁত। বিড়বিড়িয়ে বলে, ভেবো না আমি তোমার যৌবনের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সবকিছু তছনছ করব। এতটা মতিভ্রম আমার হয়নি। এতখানি বশ তুমি আমাকে করতে পারনি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরক্ষণে ও ঘরের মাঝখান ছেড়ে সোফায় এসে বসে। মাথা থেকে চিন্তা নামে না। মল্লিকা ড্রাগসের ব্যবসার খবর জেনে গেছে। প্রতিদিন ওকে শাসাচ্ছে। বলছে সব সম্পত্তি লিখে না দিলে সবকিছু ফাঁস করে দেবে। ভাঁড়ু দত্তের কপালে ঘাম জমে ওঠে। ও রুমাল বের করে মুখ মুছে নেয়। রুমালে সুগন্ধি মাখানো থাকে। এই মুহূর্তে সুগন্ধিটুকু প্রয়োজন ছিল ভাঁড়ু দত্তের। ও নাকের ওপর রুমালটা চেপে ধরার পরই ফুল্লরা আসে। ভাঁড়ু দত্তের মনে হয় ফুল্লরার আগমনে চারদিক ঝলমল করে উঠল। যেমন পোশাক, তেমন হীরের গহনার দ্যুতি, তেমনি সুগন্ধির তীব্রচ্ছটা। মুহূর্তে ওর মাথা ঝিম মেরে গিয়ে সোজা হয়ে যায়। ভাঁড়ু দত্তের ইচ্ছে করে পায়ে লুটিয়ে পড়তে। কিন্তু ফুল্লরার নিষেধ আছে, ও এসব পছন্দ করে না। তাই ভাঁড়ু দত্ত অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নেয়।

ফুল্লরা মরালি গ্রীবা বাঁকিয়ে সোফায় এসে বসে। ভাঁড়ু দত্ত দাঁড়িয়েই থাকে, কারণ ফুল্লরার কাছ থেকে বসার ইঙ্গিত পায়নি। প্রসন্ন সকাল, এখনো দিনের ব্যস্ততা শুরু হয়নি, তবু ফুল্লরা গম্ভীর। দুই ভুরুর মাঝখানে ঈষৎ কুঞ্চন। বোঝা যায় মেজাজ খুব ভালো নেই। এত ভোরেও মুখে মেকআপ, চোখে কাজলটানা। কাজল চোখের ক্লান্তি মুছতে পারেনি। ভাঁড়ু দত্তের মনে হয় গম্ভীর হলেও ফুল্লরা কিছুটা বিষণ্ণও। ইদানীং ফুল্লরাকে এমন বিষণ্ন দেখায়। যদিও বিষণ্নতা ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ভাঁড়ু দত্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুধাবন করে যে ফুল্লরার ভেতরে ক্লান্তি এসেছে, কোথাও ভাঙচুর চলছে। কিন্তু এত সত্যি ফুল্লরা কখনো তা প্রকাশ করবে না এবং ফুল্লরার উদ্যম ব্যাহত হবে না।

ফুল্লরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, বসুন।

ভাঁড়ু দত্ত পায়ের সঙ্গে পা লাগিয়ে হাত দুটো কোলের ওপর রেখে জড়সড় হয়ে বসে। কোনোভাবেই যেন ঔদ্ধত্য ভাব বা বেয়াদবি প্রকাশ না পায় তাই এই চেষ্টা।

ফুল্লরা চোখের ভারী পাতা টেনে তুলে ভুরু কুঁচকে বলে, বলুন, কী বলবেন?

মল্লিকা ড্রাগস ব্যবসার খবর জেনে গেছে। খুব ঝামেলা করছে।

কী ধরনের ঝামেলা?

বলছে ওকে সব সম্পত্তি লিখে দিতে হবে। আমার অন্য স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা কিছুই পাবে না। নইলে ও সব ফাঁস করে দেবে।

কী করে এমন ভুল করলেন?

ফুল্লরার দৃষ্টিতে আগুন। মুহূর্তে ওর ক্লান্তি কেটে যায়। সোজা হয়ে বসে ফুল্লরা। তীক্ষ্ণ শরীর ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে ওঠে। ভাঁড়ু দত্ত ভয় পায়। ওর হাঁটু কাঁপে। বুক শুকিয়ে যায়।

ফুল্লরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, সুন্দরী স্ত্রীর কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছেন? নিজের রিপুকে দমন করতে পারেননি?

ভাঁড়ু দত্ত মিনমিন করে বলে, এটা একটা দুর্ঘটনা। ও আকস্মিকভাবে জেনে গেছে। মানে আমার অসাবধানতার জন্য।

https://boierhut.com/fb

মিথ্যে কথা বলবেন না। আপনি তো জানেন আমি কোনো ত্রুটি সহ্য করি না। মল্লিকা যখন আপনার সম্পত্তি চায় তখন আপনার জানা উচিত ছিল যে আপনার সামান্যতম ত্রুটি ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে।

ভাঁড়ু দত্ত মাথা নিচু করে রাখে। কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোয় না।

ফুল্লরা চেঁচিয়ে ওঠে, বলেন, জানেন কি না?

জানি।

তবে কেন ভুল হলো? জানি আপনার জবাব নেই। এর জন্য আপনাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

শাস্তি?

ফুল্লরা চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, মল্লিকা বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

ম্যাডাম!

ভাঁড়ু দত্ত বিস্ফারিত চোখে ফুল্লরার দিকে তাকায়। ঘনকুয়াশায় সে মুখ মুছে গিয়ে জেগে ওঠে এক ডাইনির চেহারা। বীভৎস কদাকার। সে মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ভাঁড়ু দত্ত মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এই দৃশ্য ও দেখতে চায় না। এই দৃশ্য দেখা ওর জন্য পাপ। প্রয়োজনে মল্লিকাকে ও মেরে ফেরতে পারবে, কিন্তু ফুল্লরাকে হারাতে রাজি নয়।

ফুল্লরার কণ্ঠে হিসহিস ধ্বনি জাগে, আমি যা বলেছি সেটাই চূড়ান্ত। আপনি কখন, কীভাবে করবেন সেটা আপনি জানেন।

ভাঁড়ু দত্ত মাথা নিচু করেই থাকে। ও আর মাথা তোলে না। ফুল্লরা ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেয়ারা ওর জন্য কালো কফি এবং স্যান্ডউইচ নিয়ে আসে। ভাঁড়ু দত্ত বেয়ারার মুখের দিকে তাকায়। ও ঠোঁটের দুপাশের বড় গোঁফ ঝুলিয়ে দিয়েছে। গোঁফের মাথা বেঁকে আছে। লোকটার মুখ হনুমানের মুখের মতো লাগে। গোঁফটা হনুমানের বিশাল লেজ। হনুমানের হাতে বড় সাইজের স্যান্ডউইচ। তার মধ্যে মাংস ভরা। চমৎকার সুস্বাদু খাবার। কেন একদিন ফুল্লরা ওকে একটি কথা বলেছিল তা ও কখনো ভোলে না। ভুলতে পারে না। ফুল্লরা বলেছিল, শুনুন ভাঁড়ু দত্ত, মনে রাখবেন আমি ব্যাধের মেয়ে ও ব্যাধের স্ত্রী। যৌবনে কালকেতু যখন পশু শিকার করে ঘরে ফিরত তখন আমি একটা ধারাল দা-বঁটি দিয়ে সেই পশু কেটে টুকরো করতাম। মাংস কাটা আমার অনেক প্রিয় অভ্যেসের মধ্যে একটি। এখন আমি নিজের হাতে মাংস কাটি না, কিন্তু কাটাতে ভালোবাসি। জানবেন আমি কোনো ত্রুটি সহ্য করি না।

স্যার কফি?

বেয়ারার ডাকে চমক ভাঙে ভাঁড়ু দত্তের।

রাখো। চমৎকার স্যান্ডউইচ দেখছি!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

স্পেশাল স্যার। ভেতরে মাংসের পুর আছে।

মাংস? মাংস তো থাকবেই।

বেয়ারা এক পলক ভাঁড়ু দত্তের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়। ভাঁড়ু দত্ত স্যান্ডউইচ দুহাতে ধরে কামড় বসায়। ধীরেসুস্থে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবে, কোটি কোটি টাকার হেরোইনের ব্যবসার কাছে মল্লিকার মতো মেয়ের জীবন তো তুচ্ছ। ও তো হাতির পায়ের নিচে একটা পিঁপড়ে মাত্র। ভাঁড়ু দত্ত নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে কালকেতুর শকট রেডি। কালকেতু বেরিয়ে গেলে ভাঁড়ু দত্ত বেরুবে। সুতরাং ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুটা চিন্তান্বিত, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। বারবারই মনে পড়ে একসময় ইলোরা-অজন্তা দেখে ও শিল্পী হতে চেয়েছিল। এখন ওর ভেতরে কিছু অবশিষ্ট নেই। ও যন্ত্র। যন্ত্রের মতো মানুষকে পিষ্ট করে।

একসময় কালকেতু বেরিয়ে যায়। সামনে অশ্বারোহী, পেছনে অশ্বারোহী। পথে কালকেতুর চলাচল সবসময়ই পথচারীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কালকেতুর শকট যখন যায় তখন রাস্তার দুপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে পথচারী। সেদিনও রাস্তায় ভিড়। অশ্বারোহীর অশ্বের গলায় ঘণ্টা আছে। ঘোড়াগুলো দৌড়ুলে ঘণ্টা বাজে টুং টুং করে। পথচারী বুঝতে পারে কে আসছে। তখন রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়।

সেদিনও রাস্তার পাশে ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে দাঁড়িয়েছিল ভবানি। কালকেতুকে দেখে ওর নাক ফুলে ওঠে। নিশিকান্ত বলে, দেখ, কালকেতুকে কী সুন্দর লাগছে। ওকেই এই কলিঙ্গের সম্রাট মানায়।

ভবানি বুড়ো আঙুল উঁচু করে, একদিন ঐ লোকটা আমার বন্ধু ছিল।

নিশিকান্ত হি-হি করে হাসে, পেঁয়াজি দেখাচ্ছিস।

এখন ওকে আমি ঘৃণা করি। আমার ইচ্ছা করে ওর মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেতে।

নিশিকান্ত আবারো হি-হি করে হাসে।

ভবানি ওর কলার চেপে ধরে, হাসছিস যে?

নিশিকান্ত এক ঝটকায় ভবানির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলে, নেংটি ইঁদুরের ধানের গোলার মালিক হওয়ার শখ!

নিশিকান্ত আবার হাসতে শুরু করলে ভবানি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হাসবি না! খবরদার হাসবি না শুয়োরের বাচ্চা। নেংটি ইঁদুরগুলো এক হলে ধানের গোলা ওদেরই হয়। উড়ে যায় মালিকের মাথা। যেমন উড়ে যাবে কালকেতু।

কী বললি?

নিশিকান্ত রুখে দাঁড়ায়।

ও ঠিকই বলেছে।

এগিয়ে আসে নূর হোসেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ও ঠিকই বলেছে।

এগিয়ে আসে তাজুল।

ও ঠিকই বলেছে।

এগিয়ে আসে বসুনিয়া।

নিশিকান্ত বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ও তো কখনো টের পায়নি যে এত লোক ভবানির দলে। ভবানি একটা নেংটি ইঁদুর, ছেঁড়া ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পাঁজরের হাড়, নিশিকান্ত যাকে পিঁপড়ের মতো মনে করে, তার দলে এত লোক?

নূর হোসেন নিশিকান্তের কাঁধ খামচে ধরে, চোখ-কান খুলতে শেখো বন্ধু। দেখতে পাও না এ নগরের সাজানো গোছানো কঙ্কালের নিচে আমরা চাপা পড়ে আছি। মরে যাচ্ছে আমাদের হৃদয়, মানবিক মূল্যবোধ। আমরা বাড়িয়ে আছি রগ ওঠা হাত—ভিক্ষার হাত। আমাদের কী ভবিষ্যৎ? জৌলুসের জোগান দিতে দিতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। দেখতে পাও না করের বোঝা? কাকে কর দিচ্ছি? কেন দিচ্ছি? বিদেশি সাহায্য চলে যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। আমরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। দেখতে পাও না এই সোডিয়াম বাতির নিচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অন্ধকার—নিকস কালো অন্ধকার।

বসুনিয়া ওর চুল ধরে ঝাঁকি দেয়, তোমার চোখ নেই? দেখতে পাও না কেন? আর কতকাল অন্ধকারে থাকবে? তোমরা বেরিয়ে এসো। আমরা সবাই একজোট হব।

এসব আবার কী কথা? এমন কথা তো শুনিনি?

তাজুল বলে, এখন থেকে শুনবে। রাস্তায়, বাড়িতে, পার্কে, মাঠে, অফিসে-আদালতে সর্বত্র শুনবে।

কারা বলবে?

কোটি কোটি মানুষ বলবে।

আমি তো বলব না।

তোমার মতো দু-চারজন আমাদের পায়ের নিচে পড়ে থেঁতলে যাবে।

তাই নাকি?

নিশিকান্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। কালকেতুর শকট দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেছে। ছুটতে ছুটতে ওর হাঁফ ধরে যায়। ভাঁড়ু দত্ত রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায় নিশিকান্ত দৌড়াচ্ছে। ভাবে সন্ধ্যায় জানা যাবে কেন এই পলায়ন। নাকি কাউকে ধরার প্রচেষ্টা? নিশিকান্ত ওর খুব অনুগত। নগরের খবরাখবর নিশিকান্ত যত বেশি দিতে পারে অন্যরা তা পারে না। নিশিকান্তের খবরের মধ্যে যতটা সত্যতা থাকে, অন্যদের খবরে তা থাকে না। এ জন্য ভাঁড়ু দত্ত নিশিকান্তকে আলাদা বকশিশ দেয়। যেটা অন্যরা পায় না। ভাঁড়ু দত্ত বুঝতে পারে না যে এই ভণ্ডামির শহরে নিশিকান্ত এতটা সৎ কেন? যেখানে সবাই গোঁজামিল দিয়ে চলে সেখানে নিশিকান্ত খুব সততার

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সঙ্গে কাজটি করে। ও কি বোকা, সরল? নাকি এখনো এ নগরের মানুষ হতে পারেনি? নাকি ওর পূর্বজন্মের কোনো পুণ্য আছে। ভাঁড়ু দত্ত ধরে নেয় যে ওর পূর্বজন্মের পুণ্য আছে।

সন্ধ্যায় নিশিকান্ত ভাঁড়ু দত্তের কাছে ওর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলে, ঐ নেংটি ইঁদুরগুলো জড়ো হচ্ছে কালকেতুর মুণ্ডু চিবানোর জন্য। ওরা বলে কালকেতুর গোলায় নাকি কোটি কোটি মণ শস্য জমেছে। কালকেতু এই নগরের মানুষের হাড়মাংস চিবিয়ে শস্য জমায়। এই নগরীর লোক এটা আর বেশিদিন সহ্য করবে না।

ভাঁড়ু দত্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে যে নিশিকান্ত এই কথাগুলো বলার সময় উত্তেজিত হয়ে যায়। সচরাচর খবর বলার সময় নিশিকান্তর এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় না। আজ ও একটু অন্যরকম কেন? ওকি ওদের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে?

তুমি থাম নিশিকান্ত। তুমি কী ওদের এইসব কথা বিশ্বাস করো?

নিশিকান্ত চুপ করে থাকে। ও ঠিক কী বলবে বুঝতে পারে না। ওর মনে দ্বিধা এবং সংশয়।

চুপ করে আছ যে নিশিকান্ত?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?

করি।

তবে তোমার দ্বিধা কেন?

ওদের চোখেমুখে আমি অন্য কী যেন দেখতে পেয়েছি।

কী?

আমি বলতে পারব না।

বলতে তোমাকে হবে নিশিকান্ত।

আমি তো বুঝতে পারিনি যে কী। আমি কেমন করে বলব?

তুবি ভেবে বলো? তুমি বুঝে নিয়ে বলো?

আমার মনে হয় আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ওদের বোঝার শক্তি আমার নেই।

ভাঁড়ু দত্ত প্রচণ্ড ক্রোধ এবং দম্ভ নিয়ে বলে, তুমি যা বলেছ তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। নইলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ।

নিশিকান্ত ভীত চোখে ভাঁড়ু দত্তের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভাঁড়ু দত্ত নিশিকান্তকে গ্রাস করতে চায় এমন ভঙ্গিতে বলে, ওদের চোখে কী দেখেছ তা তোমাকে প্রমাণ করতেই হবে নিশিকান্ত। নইলে তুমি বাঁচতে পারবে না।

বাঁচতে পারব না?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তুমি নিজেই বলেছ যে ওরা নেংটি ইঁদুর। নেংটি ইঁদুরদের আমি পায়ের নিচে পিষে মারতে পারি।

কয়টা মারতে পারবেন?

কী বললে?

ঠিকই বলছি। আপনি আমাকে সহজে মারতে পারেন, তা সত্যি। কিন্তু ওদের পারবেন না। ওদের ধারালো দাঁতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন।

তোমার এত সাহস নিশিকান্ত? তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলছ?

নিশিকান্ত একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ভাঙা গলায় বলে, আপনি প্রমাণ চেয়েছিলেন না? আমার মনে হয় ওদের মুখে এই শক্তি দেখেছি।

তুমিও কি শক্তি পেয়েছ নাকি?

আমার এখন মনে হচ্ছে ওদের কাছে গেলে মানুষ কিছুটা বদলে যায়।

নিশিকান্ত?

প্রচণ্ড ধমকে ভাঁড়ু দত্ত চোখ গরম করে।

আমাকে ধমকাবেন না। আমি আপনার সঙ্গেই আছি। তবে আমার কি মনে হয় জানেন? ওরা খুব দ্রুত শক্তি বিস্তার করবে।

ভাঁড়ু দত্ত কিছুটা আত্মস্থ হয়ে নিশিকান্তর দিকে তাকায়। জানে লোকটা সত্য কথা বলে। ওকে চটিয়ে লাভ নেই। ওকে তেল দিয়ে খবর জোগাড় করতে হবে। নিশিকান্ত হাঁটু চুলকাচ্ছে। মুখ নিচের দিকে। এই মুহূর্তে ওর দৃষ্টি দেখা যায় না। ভাঁড়ু দত্তের ভয় হয়। মুহূর্তের জন্য হলেও তো নিশিকান্ত ওদের মতো হয়ে উঠেছিল। কেন? নিশিকান্তর বিশ্বাসে কি চিড় ধরেছে?

ভাঁড়ু দত্ত খুব নরম কণ্ঠে ডাকে, নিশিকান্ত?

বলেন।

তোমার খিদে পেয়েছে?

হ্যাঁ।

ভাঁড়ু দত্ত নিশিকান্তর জন্য খাবার আনতে বলে। খানিকক্ষণের মধ্যে প্রচুর খাবার আসে। ঘন দুধের পায়েস, মিহিদানা, কচুরি, লুচি আর খাসির মাংস। সবরি কলা আর দই। নিশিকান্ত খুব তৃপ্তি সহকারে খায়। খাওয়া শেষে ও যখন ঢেঁকুর তোলে তখন ভাঁড়ু দত্ত বলে, নিশিকান্ত কালকেতু এই নগরের সর্বেসর্বা। আমাদের উচিত নয় কি কালকেতুর মঙ্গলের জন্য জীবন দেওয়া।

নিশিকান্ত মাথা নিচু করে হাঁটু চুলকাতেই থাকে। মাথা তোলে না। ওর সামনে শূন্য বাসনকোসন। একটু আগে ও ভাঁড়ু দত্ত প্রদত্ত খাবার পেট পুরে খেয়েছে। এখন ওকে কালকেতুর প্রশংসা করতে হবে। এর আগে ও সবসময়ই প্রশংসা করেছে। বিনা দ্বিধাতেই করেছে। আজ ওর বলতে দ্বিধা

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

লাগছে। কারণ ও বুঝতে পারছে যে, এতদিন ও ভাঁড়ু দত্ত কর্তৃক তাড়িত হয়েছে এবং ও ভাঁড়ু দত্তের কেনা। তাড়িত এবং ক্রীত ব্যক্তিদের প্রশংসায় কি এসে যায়?

কথা বলছ না যে নিশিকান্ত?

একটা জিনিস আমার ভাবনায় এসেছে।

ভাবনা? তুমি ভাবতে শিখলে কবে নিশিকান্ত?

শিখিনি। এখন মনে আসছে। ঐ নেংটি ইঁদুরগুলোর সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই আমার মাথাটা কেমন ওলটপালট করছে।

তুমি আমার নুন খেয়েছ নিশিকান্ত।

আমি জানি। নুন খেয়েছি বলেই তো আমি আপনার কেনা।

সত্যি কথা।

কেনা মানে, আমি আপনার গোলাম।

সত্যি কথা। তোমার ভাবনা খুব স্বচ্ছ দেখছি।

এতদিন আমি আপনার গোলাম হয়ে কালকেতুর প্রশংসা করেছি।

ভাঁড়ু দত্ত লাফিয়ে ওঠে। লোকটির ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণে ভাঁড়ু নিস্তেজ হয়ে বসে যায়। বুঝতে পারে নিশিকান্ত এখন আর ওর হাতের মুঠোয় নেই। যা বলছে জেনেশুনেই বলছে। অন্তরের তাগিদ থেকে বলছে। কোনোকিছুই বানানো নয়। ও আমাদের নুন খেয়েছে। তাই ও আমার দ্বারা তাড়িত ও ক্রীত। নিশিকান্ত বদলে গেছে। এভাবে যদি নিশিকান্তরা বদলে যায় তবে ভাঁড়ু দত্তদের পক্ষে কে থাকবে। ভাঁড়ু দত্ত প্রবলভাবে অসহায় বোধ করে।

আজ আমি যাই। নতুন খবর পেলেই আসব।

তোমার টাকা লাগবে?

দিন।

ভাঁড়ু দত্ত ওকে মুঠি ভরে টাকা দেয়। নিশিকান্ত মুঠিভরা টাকা পকেটে রাখে। তার পর নিঃশব্দে নেমে যায়। ভাঁড়ু দত্ত বুঝতে পারে যে আজ নিশিকান্ত কিছুটা চিন্তামগ্ন।

রাতে ভাঁড়ু দত্ত ঠিকমতো ঘুমোতে পারে না। দু-একবার তন্দ্রা এলেও প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নে আঁতকে ওঠে। ও বিছানায় উঠে বসে। পাশে মল্লিকা নিঃসাড় ঘুমোচ্ছে। ও বিছানা থেকে নামে। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। স্নিগ্ধ বাতাস। তবু মনে হয় গায়ে বিছুটির জ্বালা। সারাদিনের ঘটনা তলিয়ে দেখার পর ওর ক্রোধ বাড়তে থাকে। সকালে ফুল্লরা বলেছে মল্লিকাকে সরিয়ে দিতে। ও ভাবে, শুধু মল্লিকা নয়। নিশিকান্তকেও সরিয়ে দিতে হবে। নিশিকান্তর বাঁচার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কারণ ও ভাবতে শিখেছে। মৌলিক চিন্তা! ফুঃ হারামজাদার গলায় দড়ি না পরানো পর্যন্ত শান্তি নেই। ও দাঁত কিড়মিড় করে বলে, নিজের মতো করে কথা বলার শাস্তি তোকে পেতে হবে নিশিকান্ত। প্রচণ্ড

https://boierhut.com/fb

ক্রোধে ভাঁড়ু দত্তের হাত নিশপিশ করে। হাত ও নিজের ঘাড়ের চারপাশে ঘোরায়। পায়চারি করে। কিন্তু ক্রোধ দমন করতে পারে না।

তখন ঘুম-জড়ানো চোখে মল্লিকা উঠে আসে, তুমি এখানে কী করছ? হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে দেখলাম দরজা খোলা। কেউ এসেছে নাকি তোমার কাছে?

ভাঁড়ু দত্ত দুহাতে মল্লিকাকে চেপে ধরে বুকের সঙ্গে পিষ্ট করে। ওর গায়ে যেন অসুরের শক্তি। মল্লিকা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

আহ্ ছাড় ব্যথা পাচ্ছি। কি হলো তোমার? এমন করছ কেন? আমি—

মল্লিকার আর কথা বলা হয় না। ভাঁড়ু দত্তের কালো মোটা ঠোঁট মল্লিকার পাতলা ঠোঁট চেপে ধরে। নিবিড় চুমু নয়। মল্লিকার মনে হয় কেউ বুঝি ওকে ধর্ষণ করছে। ও প্রাণপণ শক্তিকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। ওর কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফোটে না। ভাঁড়ু দত্তের আঙুলগুলো ওর কণ্ঠনালিতে চেপে বসে আছে। ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ওর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। ওর হাত শিথিল হয়ে আসছে। ও এখন বারান্দার মেঝেতে শায়িত। ও নির্জীব হয়ে এলে ভাঁড়ু দত্ত ওকে শুইয়ে দেয়। মল্লিকার দম ফুরিয়ে আসে। যে হাত এতদিন ওকে আদর করেছে, সে হাত এখন সাঁড়াশির মতো ওর কণ্ঠ বেষ্টন করে আছে। ওর চোখ বুজে এসেছে। ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটু পর ওর ঘাড় কাত হয়ে যায়। ঘাড়ের চারপাশে নীল হয়ে জেগে থাকে আঙুলের দাগ।

মল্লিকার নিস্পন্দ শরীরের দিকে তাকিয়ে ভাঁড়ু দত্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কাজটা এত সহজে হয়ে যাবে ও ভাবতেই পারেনি। ও মল্লিকাকে কোলে করে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। খুব ভোরে মল্লিকার বাবার কাছে লোক পাঠাতে হবে। গরিব কেরানি, কত টাকায় মেয়ের ব্যাপারটি রফা করবে সেটা ও দ্রুত ভেবে নেয়। লোকটির টাকার খাঁই বেশি। কম পয়সায় রফা করতে জানে না। বিয়ের সময়ও অনেক টাকা দিয়েছে—দশ লক্ষ। এবার হয়তো পঞ্চাশ লক্ষ চাইবে। কিছু এসে যায় না। ভাঁড়ু দত্ত ভেবে দেখল মল্লিকার বাবাই কালকেতুর নগরে যোগ্য নাগরিক। মানবিক মূল্যবোধ নামের নাকি কান্নায় ফ্যাচ ফ্যাচ করে না। তার এক কথা, ফেল কড়ি মাখ তেল। যথার্থ পুরুষ মানুষ একজন।

যত ঝামেলা ঐ নিশিকান্তদের নিয়ে। ওরা আবার নতুন করে কিছু ভাবতে চায়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শাড়ি পুড়িয়ে দেবার পর রঞ্জনা মজিদের সঙ্গে কথা বলে না। পরের দিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কতক্ষণ চিৎকার এবং গালাগাল করে অসুস্থ হয়ে যায়। এরপর থেকে একদম চুপ। মজিদও নিজের থেকে কোনো কথা বলে না। কাজের মেয়েটা খাবার দেয়। ও চুপচাপ খায়। রাত্রিবেলা পড়াশোনা করে সোফার ওপর ঘুমিয়ে থাকে। সকালে উঠে অফিসে যায়। ওর ক্লান্তি লাগে না, শরীরও খারাপ করে না। মানুষ কত সহজে সামান্য অভ্যেসকে বদলে ফেলতে পারে। মজিদের মনে হয় এই জীবনযাপনের মধ্যেও ভালো লাগা আছে। সবকিছুকে সহজ করে নিতে পারাটাই সুস্থতা।

ও অনেক রাত জেগে বই পড়ে। ইদানীং বই পড়াটা নেশার মতো হয়ে গেছে। দু-একদিন তো সময়ের হিসেব ভুলে গিয়েছিল। ফজরের নামাজের আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওর চমক ভাঙে। তারপর ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেয়। তাতে তো জীবনযাপনের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। শরীরও ভালো থাকে। তবে আর কিসের ভয়? না। ও পড়ার টেবিলে বসে আছে। দুদিন ধরে ও যে বইটি পড়ছে তার নাম 'মিলিটারি উইথড্রয়াল ফ্রম পলিটিক্স'। লেখক তালুকদার মনিরুজ্জামান। মজিদের প্রিয় লেখক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর সরাসরি শিক্ষক না হলেও মজিদের সঙ্গে নানা কারণে ভালো যোগাযোগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার পর ওর সঙ্গে একদমই যোগাযোগ নেই। তিনি বেশিরভাগ সময় নানা গবেষণা কাজে বিদেশেই থাকেন। তাঁর নতুন বইটি পেয়ে মজিদ দারুণ খুশি। রঞ্জনার এই মৌনব্রত একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। ও নিজের মতো থাকতে পারছে। মাঝে মাঝে এই ধরনের পরিবর্তন ভালোই। ও টেবিলে মোম জ্বালায়। ইলেকট্রিক বাতি বন্ধ করে। মোমের শিখার এক চমৎকার সৌন্দর্য আছে। বইয়ে পড়া ভেনাসের সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে ও একটা মিল খুঁজে পায়। চেয়ারে বসার আগে ও সিগারেট জ্বালায়। তারপর বইয়ের পাতা ওলটায়। নিজের দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর কথা লেখক বলেননি। বলেছেন তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের কথা। তবু লেখক কতগুলো সাধারণ কথা বলেছেন। যেগুলো সব দেশের জন্যই প্রযোজ্য। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকে। বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ বা অন্যান্য কারণে তারা সাময়িকভাবে নিজের আস্তানায় ফিরে যায়। কিন্তু আবার অপেক্ষা করতে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। ক্ষমতায় থাকার ফলে তারা বেশকিছু পদ্ধতি শিখে ফেলে। তখন তারা অতীতের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে নিজেদের আসন দৃঢ় করে নেয়। তাই দেখা যায় অভ্যুত্থান পালটা অভ্যুত্থানের পরও তাদের শাসন আরো দীর্ঘ হয়। যেমনটি হয়েছে ইরাক, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া। আরো দেখা গেছে সামরিক বাহিনীর ভেতরে যদি একই স্বার্থ বা লক্ষ্যবিশিষ্ট দলগুলো একত্র হয় তখন তারা দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে পারে। তাদের নাড়ানো খুব সহজে সম্ভব হয় না। মজিদ ভেবে দেখল এর মধ্যে রাজনৈতিক

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দলগুলো যদি ঐক্যে মিলিত হতে না পারে তা জাতির জন্য খুব দুর্ভাগ্যজনক হয়। ক্যু করে যারা ক্ষমতায় আসে তারা প্রথমেই পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতির কথা বলার জন্য গলা ফাটিয়ে চেঁচায়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা নিজেরাই দুর্নীতির পাঁকে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে, মনে করে এটাই তাদের ন্যায্য পাওনা। তারা হালাল রুজি উপার্জন করছে।

মজিদের শরীর চিড়চিড়িয়ে ওঠে। ও জানালার কাছে এসে সিগারেট জ্বালায়। দূরে কোথাও থেকে আর্তনাদ ভেসে আসে। এইসব শব্দে এখন আর ওর ভয় করে না। ও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ও আবার টেবিলে ফিরে আসে। বইয়ের পাতা উলটে যায়। লেখা আছে, সামরিক বাহিনী দেশ শাসনের দায়িত্ব নিলে সমস্যার সমাধান তো করতেই পারে না, উলটো সমস্যা বাড়ায়। নাইজেরিয়া এর বড় উদাহরণ। এ দেশে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল জাতীয় সংহতির নামে। কিন্তু ফল দাঁড়ায় উলটো। শুরু হলো গৃহযুদ্ধ, পরিণামে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। দেশ বিভক্ত হয়ে যায়। কোথায় সংহতি? রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় থাকলে এটা হতো না। শুধু রাজনীতি নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও সামরিক সরকারগুলো নতুন কিছু করতে তো পারেই না বরং ব্যর্থ হয়। সামরিক বাহিনী ব্রাজিলে একুশ বছর ক্ষমতায় ছিল। এ সময় তারা ঋণ পেয়েছে এক শ' দশ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু দেশের উন্নতি? ওটা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেছে। দেশ হয়েছে দেউলিয়া। এই অবস্থায় এসে ওরা ক্ষমতা ত্যাগ করেছে। এমন অবস্থা ইন্দোনেশিয়ারও। এইসব সরকারের লক্ষ্য চাকচিক্য এবং জৌলুস, সমস্যার গভীরে ওরা যায় না এবং যাওয়ার কথা ভাবেও না। ভাবতে পারেও না। ক্ষণিকের মোহ নিয়ে সর্বনাশ করে দেশ ও জাতির। ভাবতে ভাবতে মজিদের হাই ওঠে। ও তো দেখতে পাচ্ছে এটা ওর নিজের জীবনেরও অভিজ্ঞতা। ও বইটা বন্ধ করে ফুঁ দিয়ে মোম নিভিয়ে দেয়।

রাত তখন পৌনে তিনটা। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়। জানালা দিয়ে রাস্তার আলো এসে পড়েছে ঘরে। ও টানটান হয়ে সোফায় শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে আসে। মনে হয় ঐ বইটাতে ও নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। এই খুঁজে পাওয়ার তৃপ্তিতে প্রবল ঘুম ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মজিদের এমনই হয়। ওর ভাবনাগুলো যখন অন্যের সঙ্গে একই সমান্তরালে অবস্থান করে তখন নিজেকে একজন সফল মানুষ মনে হয়। এই সাফল্য ওকে আনন্দ দিলে প্রশান্ত ঘুমে ওর রাত পেরিয়ে যায়।

ঘুম ভেঙে যায় খুব ভোরে। তখনো রঞ্জনা ঘুম থেকে ওঠেনি। কাজের মেয়েটি রান্নাঘরে রুটি বেলছে। ওর কখনো ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় না। ওর রুটিন বাঁধা জীবন। ওর কোনো অতৃপ্তি নেই। নাকি এসব ও বোঝে না। মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে মজিদ বাথরুমে ঢোকে। গোসল করলে বেশ ঝরঝরে লাগে শরীর। কাপড় পরে ও রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

কী রে হয়েছে তোর?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হ্যাঁ, দিতাছি।

মেয়েটি দ্রুত হাতে একটা ডিম পোজ করে। দুটো রুটি ভেজে দেয়।

দেখ তো গুড় আছে নাকি?

গরম রুটির সঙ্গে গুড় খেতে মজিদের ভালো লাগে। মেয়েটি গুড়ের কৌটা নিয়ে আসে।

আজ এত সকালে যাইবেন?

যাই, একটু কাজ আছে। দুপুরে কী রাঁধবি?

খালাআম্মা তো কিছু কয় নাই।

ও।

মজিদ খাবারে মগ্ন হয়। দুপুরের খাবারটা রঞ্জনার মর্জির ওপর নির্ভর করছে। ও জানে দুপুরে ফিরতে আড়াইটা বাজলে রঞ্জনা খেয়েদেয়ে মন্টিকে নিয়ে শুয়ে থাকবে।

ওর জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকবে না। না থাকলে কিইবা এসে যায়। একসময় না একসময় মানুষ তো এই সংসার জীবন নিয়ে ক্লান্তই হয়ে যায়। মজিদ সবকিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। খাওয়া শেষ করে বলে, এই একটা এলাচ দে তো। মেয়েটি ওকে এলাচ এনে দেয়। ও এলাচ মুখে পুরে বলে, তুই খুব ভালো মেয়ে। রাতে কি স্বপ্ন দেখেছিস রে?

হপন তো দেখি নাই। কোনখান দিয়ে রাত কাটে জানি না।

তাই হবে। সারাদিন কাজ করলে ক্লান্ত থাকিস তো। কাজ করতে তোর খারাপ লাগে?

না, খারাপ লাগে না। কাম তো বেশি না। তা ছাড়া গরিব মানুষের কাম না করলে কি হয়?

গরিব, বড়লোক কিছু না। কাজ সবাইকে করতে হয়। যাকগে। দরজাটা বন্ধ কর। আমি যাই।

রাস্তায় লোক চলাচল তেমন শুরু হয়নি। ফুটপাত ধরে হাঁটতে ভালোই লাগে মজিদের। এত তাড়াতাড়ি ও কোথায় যাবে? অফিসে গিয়ে বসবে কি? ওর কেবলই মনে হয় এই নিশ্চিন্তে হেঁটে যাওয়াটাই সত্য। এর বাইরে আর যা কিছু ঘটুক না কেন সেটা বাড়তি লাভ। কতদিন ধরে চন্দর নিখোঁজ। কেউ কোনো খবর দিতে পারছে না। সম্ভাব্য কোথায় গেল? নাকি কেউ ওকে গুম করে দিয়েছে? তুচ্ছ ঘটনায় খুন হয়ে যাওয়া তো এই শহরের স্বাভাবিক ঘটনা। কেউ তো এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। এই সকালে মজিদের কপালে ঘাম জমতে থাকে। ফুটপাতের পাশে বিশাল সেগুন গাছ। সাদা ফুলে ছেয়ে আছে। তখন ও দেখতে পায় উলটো দিক থেকে ভবানি আসছে। মজিদকে দেখে ভুরু কুঁচকে থামকে দাঁড়ায়।

কেমন আছ ভবানি?

আমার আবার থাকা কী? তুমি কেমন আছ?

এই চলে যাচ্ছে দিন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হ্যাঁ, তোমাদের তো চলেই যাবে। আর কতকাল এমন নির্বিরোধ জীবনযাপন করবে? কালকেতু কি তোমারও মগজ চিবিয়ে খেয়ে রেখেছে?

আহ্ ভবানি আস্তে বল।

ভবানি হা-হা করে হাসে।

এখন আর আস্তে বলব না মজিদ। আমার জামা ছিঁড়ে গেছে। বাচ্চার জন্য ডিম-দুধ কিনতে পারি না, বিশ্ববিদ্যালয় তো অর্ধেক বছর বন্ধই থাকে, ট্যাক্সের বোঝায় আমার কাঁধের মাংস ক্ষয়ে গেছে। আমি আর কত চুপ থাকব মজিদ? এই নগর পত্তনের সময় আমি জীবন বাজি ধরেছিলাম। মাটি কাটতে কাটতে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। মাটির ধসে চাপা পড়েছে আমার বাবা, মশকের তীব্র হুলে জীবন দিয়েছে আমার বড় ভাই। এখন এই নগরে আমার জীবন বাঁচানো দায়। তুমি আমাকে আস্তে কথা বলতে বলছ মজিদ?

মজিদ ভবানিকে জড়িয়ে ধরে।

তোমার কথা শুনে আমার বুক জুড়িয়ে গেল। আমি তো তোমার মতোই লোক খুঁজছি।

শুধু খুঁজলে চলবে কেন? আমাদের এক হতে হবে।

মজিদ ব্যাকুল হয়ে বলে, কবে, কখন সেদিন আসবে?

বলো তো এখন থেকেই শুরু করি। আমি তো টের পাচ্ছি যে হাজার হাজার মানুষ আছে আমাদের পাশে। কিছুই না, আমরা শুধু জড়ো হব। কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনী আমাদের কতজনকে মারবে? মারুক।

মজিদ দেখতে পায় ভবানির চেহারায় দীপ্তি। এ নগর পত্তনের সময় সবাই যখন জড়ো হয়েছিল তখন সবার মুখে এই দীপ্তি ছিল। তা হলে কি সেই সময়টি আবার ফিরে এল?

আমি যাই মজিদ। মনে রেখো শুধু জড়ো হওয়া। হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষের এক হওয়া। জানবে যাদের হাতে অস্ত্র আছে তারা এক হয় না। তারা তো অন্যের হুকুমে কাজ করে।

ভবানি চলে গেলে মজিদ বিস্ময়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এই লোকটি এত গভীর করে ভাবে? ভবানিকে তো সে এতদিন সামান্য বলেই জেনেছে। পরক্ষণে নিজের এই অনুভূতিতে লজ্জিত হয়। জানা মানে কি শুধু কিছুক্ষণের জন্য দেখা হওয়া বা আড্ডা। যেভাবে জানলে মানুষের ভেতরের তলটুকু দেখা যায় সেভাবে তো ভবানিকে জানা হয়নি। ভবানির ভেতরের আগুন ও টের পাবে কি করে? না, আসলে ওর দোষ নয়। ও বুঝতে পারছে যে এই নগর পত্তনের সময়কার আবেগটুকু আবার ফিরে আসছে। মানুষ এই নগরের সেই সময়টা ফিরে চায় যে সময়টা কালকেতুর নয়। ও গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে অফিসে চলে আসে। দেখে দারোয়ানের টুলের ওপর বসে আছে মনু মাঝি। মুখ শুকনো, চোখ বসে গেছে। ওর বিধ্বস্ত চেহারায় এই নগরীর তিলোত্তমা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই। তবুও মনু মাঝির চেহারায় ভবানির চেহারার দীপ্তি। মজিদ চমকে ওঠে।

https://boierhut.com/fb

কী খবর তোমার?

সাহেব গতকাল আমার ছেলেটাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

ও কী করছিল?

মিছিলে গিয়েছিল। বাজার দর কমানোর জন্য যে বড় মিছিলটা হলো, সেটায়।

মজিদ চুপ করে থাকে। ওর আনন্দ যেন ধরে না। বলে, তোমার ছেলেটার বয়স তো মাত্র উনিশ।

হ্যাঁ। কিন্তু পাকা কথা শিখেছে। বলে, বাবা নিজেদের কথা নিজেরা চেঁচিয়ে না বললে কোনো হারামজাদা আমাদের জন্য ভাববে না। ওরা যারা সরকারে আছে সবাই কেবল নিজের পকেট গোছায়। সত্যি কি সাহেব?

সত্যি।

আমার ছেলের কী হবে? আমি কি করব?

কোনো ভয় নেই মনু মাঝি।

ভয় নেই? ওরা যদি মেরে ফেলে? আমার বউ তো কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়েছে।

ছেলেমেয়েদের জন্য মায়েরাই তো কাঁদবে।

আপনি যেন কেমন কথা বলছেন।

তোমার ছেলে মিছিলে গেছে জেনে আমার খুব খুশি লাগছে। আমি তোমার সঙ্গে জেলে ওকে দেখতে যাব।

যাবেন?

মনু মাঝি মজিদের হাত চেপে ধরে। বলে, আমার বুকের ভেতরেও অনেক কথা। সব কথা তো আমি বলতে পারি না। ভয় নাই। কিন্তু আমার ছেলে ভয় পায় না। আপনার কি মনে আছে সাহেব, এই নগর পত্তনের সময় আমরা কত হিংস্র আক্রমণ সয়েছি, কিন্তু ভয় পাইনি।

আমাদের জীবনে তেমন সময় আবার ফিরে এসেছে মনু মাঝি। আগে লড়েছি পশুর বিরুদ্ধে। এখন লড়ব মানুষের বিরুদ্ধে।

মনু মাঝি ঝট করে ওর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

ছিঃ ছিঃ কী যে করো না?

মনটায় আনন্দ লাগল। মনে হলো আপনার মুখে এ কথা শুনে পেটে ভাত না থাকার দুঃখ ভুলে গেলাম।

চল, ঐ দোকানে বসে চা খাই।

আপনার অফিস?

আজ একটু সকালে এসেছি। অফিসের দেরি আছে।

https://boierhut.com/fb

দুজনে অফিসের পেছন দিকের চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। এর মধ্যে দোকানে দু-চারজন খদ্দের এসে বসেছে। ওরা শুধু চা নয়, পরোটা আর ভাজি খাবে। দোকানি তাড়াহুড়ো করছে চা এবং খাবার পরিবেশন করার জন্য। মজিদ দেখল ঐ দুজন খদ্দেরের বয়স কম। ওরা এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। চুমুক দিয়ে টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে পানি খাচ্ছে। মজিদ ভেবে দেখল ওদের বয়স কম। এই নগর পত্তনের সময় ওরা শিশু ছিল। তখন ও গলা উঁচু করে বলে, এই নগর আমরাই পত্তন করেছি মনু মাঝি। মাটি কেটেছি, বন সাফ করেছি, রাস্তা বানিয়েছি, পুকুর কেটেছি, ভবন তৈরি করেছি। তখন আমরা মানুষের জন্য দানছত্র খুলেছিলাম। সবাইকে পানি আর মুড়ি দিতাম, খিচুড়ি দিতাম। অসুস্থ হলে সেবা করতাম। কারো কোনো অভিযোগ ছিল না।

মনু মাঝি উৎসাহ নিয়ে বলে, আমার মনে আছে মাটি কাটতে কাটতে মোমিন তালুকদারের দুই হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। কী সাংঘাতিক অবস্থা! সেই ঘা শুকাতে সময় লেগেছিল দুমাস।

আমি দেখেছিলাম গাজী ফাত্তাহকে। বাঘ ওর ডান হাত খেয়ে ফেলেছিল। কী সাহসী! মানুষ জাপটে ধরেছিল বাঘটাকে। পরে আমরা সবাই মিলে সেই বাঘ পিটিয়ে মেরে ফেলি।

মনু মাঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কেতাব আলির বার বছরের ছেলেটাকে একদিন কুমির টেনে নিয়ে গেল। ওর বউ কাঁদেনি। বলেছিল, এই নগরের জন্য আমার ছেলে শহীদ হয়েছে। ভুলি না, কিছুই ভুলতে পারি না।

দেখো মনু মাঝি, নগর পত্তনের সময় তুমি ছিলে এক জায়গায়, আমি ছিলাম অন্য জায়গায়। এখন আমরা দুজনে এক জায়গায় এসে মিলেছি।

ঠিক বলেছেন। আমরা এখন এই নগরের সুদিন চাই। আমার জামা ছিঁড়ে গেছে, পায়ে জুতা নেই, ঠিকমতো খাবার জোটে না। আমি আর কষ্ট সইতে পারি না ।

তখন ছেলে দুটো নিজেদের টেবিল ছেড়ে ওদের টেবিলে এসে বসে। একজন বলে, আপনাদের কথা শুনে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমরাও এই নগরের সুদিন চাই।

সুদিন চাই বললেই তো পাওয়া হবে না। তার জন্য লড়তে হবে।

দুজনে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, আমরা লড়ব।

কষ্ট সইতে হবে?

আমরা পারব। আমাদের কী করতে হবে বলুন।

মজিদ অবিকল ভবানির কণ্ঠে বলে, জড়ো হতে হবে। এক হতে হবে।

ডাক এলেই আমরা জড়ো হব।

তা হলেই হবে। আমরা এর বেশি কিছু চাই না।

ততক্ষণে ওদের চা আসে। ছেলে দুটো ওদের টেবিলে বসেই নাস্তা খায়। খেতে খেতে বলে, লেখাপড়া শেষ করে আমরা দুজন বেকার বন্ধু। আমাদের চাকরি নেই, ব্যবসা করার পয়সা নেই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাবা-মায়ের কাছে হাত পেতে চলতে হয়। আমরা এই লজ্জা থেকে মুক্তি চাই। মজিদ উৎসুক চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর একজন বলে, আমাদের বাবারাও এই নগর পত্তনের সময় আহত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কথা কালকেতুর প্রচারযন্ত্র বলে না। ওরা কেবল তীরন্দাজ বাহিনীর প্রশংসা করে। দেখেশুনে মনে হয় তীরন্দাজ বাহিনীর সদস্যরাই এই নগরীর সব। আর কেউ কিছু না। আমার লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে প্রচারযন্ত্রগুলো।

অন্যজন বলে, ঐ তীরন্দাজ বাহিনীর জন্য কালকেতু দেবীর কাছ থেকে পাওয়া অর্থের আশিভাগ খরচ করে। তার এক ভাগ কমিয়ে আমাদের জন্য খরচ করলে আমরা বেকার থাকতাম না।

কী খাঁটি কথা! কী খাঁটি কথা! দিকে দিকে এই কথাগুলো রাষ্ট্র হওয়া উচিত।

এই নগরের সবকিছু কালকেতু একতরফাভাবে ভোগ করছে।

আমরা এসব বেশি দিন চলতে দিতে পারি না।

শেষ বাক্যটি বলে একজন যুবক এক গ্লাস পানি খায়। তারপর দোকানদারকে পয়সা মিটিয়ে চলে যায়।

আহা, কেমন সোনার ছেলে। আমার ছেলেটা লেখাপড়া শিখতে পারলে ওদের মতো হতো।

মনু মাঝি আক্ষেপ করে।

দুঃখ করো না মনু মাঝি। এই নগরে প্রত্যেকেরই মূল্য আছে। তোমার ছেলেও কম নয়। আমি দেখব ওর ব্যাপারে কী করতে পারি। চলো উঠি। অফিসের সময় হয়েছে।

মজিদ চেয়ারে বসতে না বসতে হকার এসে কাগজ দেয়। ও বাসায় কাগজ রাখে না। কাগজটা অফিসে রাখে। কারণ অনেক সময় ধরে কাগজটা পড়া যায়। অফিসে আসার আগে বাসায় কাগজ নিয়ে তাড়াহুড়ো করে পড়া হয় না। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সুন্দরী মল্লিকার ছবি দেখে এবং মৃত্যুর খবর পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় ও। কথা নেই, বার্তা নেই এমন তরতাজা মহিলা কীভাবে মারা গেল তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ওর কেবলই মনে হতে থাকে যে, এটা কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে মল্লিকা। অসম্ভব বলে মজিদ কাগজটা ছুড়ে ফেলে দেয়। এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো চক্রান্ত আছে। যেমন চক্রান্ত আছে চন্দরের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার। মল্লিকার তো কোনো অসুখের খবর জানা যায়নি। ভাঁড়ু দত্তের তৃতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রীর কোনো অসুখের খবর পত্রিকায় আসবে না, এটা তো হতেই পারে না। এতদিন তো সর্দিকাশি হলেও বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় খবর হয়েছে আর সেই মহিলা বিনা নোটিশে এমন বেমালুম মরে গেল? মজিদ টেবিলের ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। বশীর ঢোকে ওর ঘরে, কী কর্মবীর এমন চুপচাপ যে?

ভাবছি।

কাজ রেখে ভাবা? ভালো। শুভ লক্ষণ।

https://boierhut.com/fb

ভাঁড়ু দত্তের স্ত্রী মারা গেছে, শুনেছে?

শুনিনি। পত্রিকায় পড়লাম।

একই কথা। মনে কি হয় স্বাভাবিক মৃত্যু?

একদম না। তুমি তো জানো আমার ভুইল্যার ব্যবসা আছে। আর ভাঁড়ু দত্তের ব্যবসা হেরোইনের।

তার সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক?

আমার মনে হয় সম্পর্কটা এখানেই।

কেমন?

বিস্তারিত কিছু তো বলতে পারব না। অনুমান মাত্র। ওকে হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে।

বশীর হো-হো করে হাসে। বলে, ঐ সব লোকের কাছে জীবন-মৃত্যু সমান। সব ব্যাপার বড় বেশি সহজ। কেবল তুমি-আমি বসে বসে মাথা ঘামাই। বাজে ভাবনা।

ঠিকই বলেছ।

চা হবে নাকি এক কাপ।

শুধু চা? শিঙ্গাড়া নয়?

তোফা! হিপ্‌হিপ্ হুররে।

বশীর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসতেই থাকে। ও ছটফটে স্বভাবের লোক। গভীর করে কোনোকিছু ভাবার মতো ধৈর্য ওর নেই। তবু মল্লিকার মৃত্যুর খবর ও অন্যরকম করে বলেছে। ও কি ভেবে বলেছে, নাকি না ভেবেই যা মনে এল তাই বলেছে। ও তো সবসময় বলে এই নগরে কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নেই। যা ঘটে তার অন্তরালে একটি করে কারণ থাকে। তুমি কি বলবে ড. গোলাম কবীরের মৃত্যুটা স্বাভাবিক? আমি তো বলব ওকে মেরে ফেলা হয়েছে। এখন স্বাভাবিক সেই ঘটনাটি হবে যদি সেই ডাক্তারের অবহেলায় কবীর মরেছে তাকে রাজপথে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বলো ঠিক বলিনি? কিন্তু এমন স্বাভাবিক ঘটনা এই নগরে ঘটবে না।

চা, শিঙ্গাড়া এসেছে। বশীর চা খায়।

বাহ্, আমাদের সিকান্দার মিয়া আজ চমৎকার চা বানিয়েছে। বোঝা যায় তা হলে খুব মন দিয়ে বানিয়েছে। আচ্ছা মজিদ, সিকান্দর মিয়া কি মল্লিকার মৃত্যু সিলিব্রেট করছে নাকি?

মজিদ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বশীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বশীর আজ বেশ গলগলিয়ে কথা বলছে, দামি কথাও বলেছে। ভুইল্যা খেয়ে ওর মগজ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কী ব্যাপার মজিদ, তুমি যে একদম সিঁটিয়ে আছ দেখছি? মল্লিকার সঙ্গে তোমার প্রেম ছিল না তো?

না, আমি অন্য কথা ভাবছি।

কী?

https://boierhut.com/fb

ভুইল্যা খেয়ে তোমার মগজটা বেশ সাফ হয়ে গেছে।

হা-হা করে হাসে বশীর। চায়ের কাপ থেকে ছলকে পড়ে চা।

তোমার বসকে কয়েক শলাকা ভুইল্যা টানতে দিলে হয়। মাথার পোকাগুলো নেমে যেত। এখন তোমার সঙ্গে লাগে নাকি?

মজিদ মৃদু হাসে। কিছু বলে না। একসময় বশীর ওকে আপনি করে বলত। এখন তুমি বলে। বন্ধুত্ব গভীর হয়েছে। একসময় বশীর ওর দিকে তাকিয়ে রসিকতা করে বলে, মল্লিকার মৃত্যুতে তুমি খুব আঘাত পেয়েছ মনে হয়।

মজিদ হো-হো করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, মানুষের অনুমানের সীমা থাকা উচিত বশীর।

অনুমান কি বেশি করেছি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। কারণ ওকে আমি চিনি না।

তা হলে এমন মনমরা কেন?

কারণ আমরা জড়ো হওয়ার কথা ভাবছি।

জড়ো হওয়ার কথা?

কালকেতুর বিরুদ্ধে আমরা সব লোক জড়ো হব। তুমি থাকবে আমাদের সঙ্গে?

নিশ্চয় থাকব, নিশ্চয়।

বশীর ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলে, এই ব্যাটা নগরের জীবনব্যবস্থা নষ্ট করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা কোথায় দুর্নীতি নেই? এসবের মধ্যে মানুষের অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

বশীরের চেঁচামেচিতে তারেক, মান্নান ও আরো অনেকে এসে ঘরে ঢোকে।

কী হচ্ছে এখানে? চেঁচামেচি কেন?

বশীর চেঁচিয়ে বলে, আমরা এই নগরের সুদিন চাই।

হুম।

তারেক আর মান্নান চেয়ার টেনে বসে।

মজিদ ওদের জন্য চা আর শিঙ্গাড়া আনতে দেয়।

তোমরা কি আছ আমাদের সঙ্গে?

আমরাও সুদিন চাই।

তা হলে চল মল্লিকার মৃত্যু সেলিব্রেট করি।

কি বলছেন মজিদ ভাই?

ঠিকই বলছি। ওরা তো নিজেরাই আমাদের জন্য কারণ তৈরি করছে। আমরা এই কারণগুলোকে কাজে লাগাব। তাই না?

তাই।

https://boierhut.com/fb

ওরা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ওপরে তোলে। মজিদের বুক আনন্দে ভরে যায়। ভেতরে ভেতরে মানুষ তো তৈরি। কত সহজে এরা সাড়া দিচ্ছে। তা হলে কিসের অপেক্ষা? অবসান চাই করের বোঝার, দুর্নীতির, স্বজনপ্রীতির এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারিতার।

চা খেয়ে ওরা চলে গেলে মজিদ চন্দরের বউকে ফোন ঘোরায়। একদিন-দুদিন পরপরই ও যোগাযোগ রাখছে।

ওপাশ থেকে হ্যালো শুনতেই মজিদ বলে, ভাবি কেমন আছেন? আমি মজিদ।

আর থাকা। গভীর দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে। ছয় মাস হয়ে গেল মানুষটির কোনো খোঁজ নেই। কেউ কি ওকে মেরে ফেলল ভাই?

ছিঃ ছিঃ ভাবি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আমি তো চেষ্টা করে যাচ্ছি। নিশ্চয় একদিন না একদিন ওকে পাওয়া যাবে।

কবে, কখন, কেমন করে ওকে আমরা পাব? ভেঙে পড়া কণ্ঠ। তারপরই ফোঁপানির শব্দ।

ভাবি, প্লিজ ভাবি।

ওপাশে ফোন রেখে দেয়। মজিদ রিসিভার হাতে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। ও এমন নিখোঁজ হয়ে গেলে রঞ্জনা কি এমন ভেঙে পড়বে? আহ্ রঞ্জনা। বুকের ভেতর কাঁটা ফুটিয়ে রেখেছে। ও তখন ঠিক করে, আজ গিয়ে রঞ্জনার সঙ্গে আপস করবে। সংসারটাই এমন একসময় ভীষণ ক্লান্ত লাগে। মনে হয়, আর কত এক জায়গায় ফিরে যাওয়া। একবার একটি কবিতা পড়েছিল এমন। ঘর? কোথায় আমার ঘর? ওটা আমার ঘর নয়। ফুটপাতে ঘুমোলে আমার যেমন দিন কাটে ঘরটাও তেমন একটি ফুটপাত। উত্তাপ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, স্বস্তি নেই। কবিতার লাইনগুলো ওর মনে নেই। কিন্তু কবিতার অর্থ অনেকদিন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কবির নামও ভুলে গেছে। মনে হয়েছিল প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ অনুভূতি সে কবির; ঘর যার কাছে সত্যিকার ঘর হয়ে ওঠে না। ওর মনে হয় অনেকের ভাগ্যে ঘর জোটে না। বিশেষ করে যাদের ঘরে রঞ্জনার মতো বউ আছে। চন্দরের কি ঘর জুটেছে? হয়তো জুটেছে। চন্দরের বউকে তো মনে হয় ভালো। ও নিখোঁজ হবার পর থেকে বেচারির স্বাভাবিক জীবনযাপন বন্ধ হয়ে গেছে। কত দিকে দৌড়াচ্ছে, পীর ফকির ধরেছে। সামান্য সূত্র ধরে ওর আকুলিবিকুলির শেষ নেই। কই রঞ্জনার তো এমন আবেগ নেই। পনের দিন ধরে ওর সঙ্গে কথা না বলে তো রঞ্জনা খারাপ নেই। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করেছে, বাচ্চাকে নিয়ে খেলছে, গুনগুনিয়ে গান গাইছে। মজিদ নামের একটি লোক যে এই সংসারে অবস্থান করছে এটা ও বেমালুম উপেক্ষা করছে। এই উপেক্ষাটাই মজিদের অসহ্য লাগছে। রঞ্জনার বিষণ্ণতা নেই, দুঃখবোধ নেই। ক্রোধ এবং উপেক্ষা দিয়ে নিজের লোভকে সমর্থন করে যাচ্ছে। রঞ্জনার মতো মেয়েরা লোভী। অন্যের হাত থেকে উপহারসামগ্রী নিতে এদের বাধে না। ওরা লোভী হয় নিজের সংসারের সুখের বিনিময়ে। এমন মেয়ের সংখ্যাই এই নগরে বেশি। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মানুষের সঙ্গে জীবন টেনে নিয়ে একদিন মরতে হবে। উত্তেজনায় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। পায়চারি করে। দক্ষিণের দরজা খুলে বাইরে আসে। বহেড়া গাছে দশ-বারটা টিয়া লাফালাফি করছে। আসলে মানুষের হাজার কদর্যতার পাশে সবচেয়ে সুন্দর এইসব প্রাকৃতিক দৃশ্য।

বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে আবার হেঁটে হেঁটে বাসায় ফেরে মজিদ। এখন পাঁচটা। ও একটু দেরি করেই বেরিয়েছে, যাতে রোদের তেজ কম থাকে, হাঁটতে কষ্ট না হয়। এই চলমান জীবন দেখা ওর স্বভাব। ও শুধু একমনে হাঁটে না। চারদিকে তাকিয়ে হাঁটে, যে চারদিক থেকে দৃষ্টিতে উঠিয়ে নেয় ছোটোখাটো জিনিস, যেখানে তুচ্ছতা আছে কিন্তু বাহুল্য নেই—যে তুচ্ছতা সমগ্রর অংশ। ও দেখল সেই বড় গাছটার নিচে সুলেমান আর তারাবানু ওদের সংসার নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। তারাবানু ওকে দেখে একগাল হাসল।

কেমুন আছেন সাব?

ভালো। তোমরা কেমন আছ?

ভালো না সাব। আগে যাও একটু খাওন পাইতাম অহন তাও জোটে না।

সুলেমানের কণ্ঠে বিষণ্নতা, গেরামে যামু হেই পথও নাই।

তারাবানু খিলখিল করে হাসে। আল্লা তো আমাগোরে রাহনের লাগি বানায় নাই।

দুঃখ করে আর কী হবে!

দুঃখ তো করন লাগতো না। সরকার যদি আমাগোরে একটু দেখতো।

হ তোমার যা কথা। সাব আমারে একটা সিগারেট দ্যান?

ক্যান, আমি খারাপটা কি কইলাম?

তারাবানু চেঁচিয়ে ওঠে, কালকেতুর মুণ্ডুটা পাইলে আমি চাবাইয়া খামু।

হয়েছে, থাম, থাম। বুঝেছি ডাক দিলে তোমরা জড়ো হবে। সুলেমান, এই নাও সিগারেট। এই দুই টাকা তারাবানুর নারকেলের তেল কেনার জন্য। তোমাদের ছেলেরা কৈ?

কামে গেছে। ইটা ভাঙার কাম। পোলা দুইডাও অহন রোজগার করে। তাও প্যাড ভরে না। বাজারে যা দাম! হালার কালকেতু কিছুই সামাল দেয় না।

যাই।

আবার আসবেন সাব।

দুজনে খুশির স্বরে একসঙ্গে বলে। মজিদ মাথা নেড়ে হাঁটতে থাকে। ভালোই লাগে। পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে কিছু টাকা আছে। টুকটাক বাজার করে। মন্টি কতদিন আঙুর খাবে বলে বায়না করেছিল। ওর জন্য এক শ' গ্রাম আঙুর কেনার জন্য দোকানের সামনে দাঁড়ায়। দাম শুনে বিভ্রান্ত হয়ে যায় ও। তিন শ' টাকা কেজি! ও পিছিয়েই আসে। ভাবে, এটা কার দেশ? আমাদের

https://boierhut.com/fb

কি? কাদের জন্য এইসব জিনিসপত্র? আমাদের জন্য নয়। ও খুব হতাশা বোধ করে। আগেই কিছু মাছ তরকারি কিনেছিল। মন্টির জন্য দুটো লজেন্স কিনে ঘরে ফিরে আসে।

রঞ্জনা রান্নাঘরে। চমৎকার একটি গন্ধ আসছে। ও রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

বাহ্ চমৎকার গন্ধ তো, কী রান্না হচ্ছে?

রঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে বলে, রোস্ট করছি।

রোস্ট? কেন?

মন্টির খুব শখ। তাই একটা মুরগির বাচ্চা কিনেছি।

ও। এই যে, আমিও কিছু বাজার করেছি।

মজিদ ব্যাগটা রান্নাঘরের দরজায় রাখে। তারপর আস্তে করে বলে। আমার খুব খিদে পেয়েছে।

রঞ্জনার কাছে নিজেকে খুব পরাজিত মনে হয়। রঞ্জনা মেয়ের শখ মেটাতে পেরেছে। ও পারেনি। ও বাথরুমে আসে। ভাবে, আসলে পরাজয় ভাবছে কেন? রঞ্জনার টাকাটাও তো ওরই। হয়তো কখনো অল্প অল্প করে জমিয়েছিল। তাই দিয়ে মুরগি কিনেছে। এটাকে তো জটিল করে দেখার কোনো কারণ নেই। মুখে পানির ঝাপটা দিতে দিতে ভাবে, জীবনটা সহজ হোক, সহজ হোক।

বৈঠকখানায় ফিরে আসার পথে দেখতে পেল রঞ্জনা টেবিলে খাবার সাজিয়েছে।

আস্তে করে বলল, এসো খাবার দিয়েছি। ও আজ কিছুটা উৎফুল্ল। চেহারা প্রসন্ন। কোনো কারণ ঘটেছে কি? না বোঝার চেষ্টা করতেই চাইল ও। ও চেয়ার টেনে বসল। দেখল মুরগির রান ওকেও দেওয়া হয়েছে। পাউরুটি, মিষ্টি, দইও আছে।

না না, রোস্ট আমাকে দিও না। ওটা মন্টি খাক।

ও তো সবটা খেতে পারবে না।

রেখে দাও। পরে খাবে।

কিন্তু এত খাবার কোথা থেকে এল?

রমানি ভাই এসেছিল। সেই এনেছে। বলেছে তোমার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। সন্ধ্যার পর আবার আসবে।

ও তো জানে এই সময় আমি অফিসে থাকি।

আজ তুমি দেরি করে বাসায় ফিরেছ।

এমনিভাবে মাঝে মাঝে নাকি?

ছিঃ ছিঃ কী যে বলো।

শাড়ি এনেছে?

উহ্ অসহ্য!

https://boierhut.com/fb

রঞ্জনা চিৎকার করে ওঠে। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে মন্টি। কাজের মেয়েটা তড়িঘড়ি করে, আপনেরে টোস্ট আর চা দিই খালু?

তাই দে।

মজিদ স্থির হয়ে বসতে পারে না। রঞ্জনার কি দোষ? রমানি তো ওরই বন্ধু। কেন এসেছে? ও তো ইচ্ছে করলে শত মেয়ে কিনতে পারে। বন্ধুর স্ত্রী কেন? ওর খিদে নষ্ট হয়ে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ওর মনে হয়, উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছু পথ হেঁটে আসলে হয়। পা বাড়াতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পর রমানি আবার আসবে। কেন? কী এত জরুরি দরকার। মোড়ের দোকানের ছেলেটি অবাক হয়ে তাকায়, স্যার কী হয়েছে?

মন ভালো নেই।

যা দিনকাল পড়েছে তাতে কি মন ভালো থাকে।

তোর চাচা কেমন আছে?

এই তো যখন-তখন অবস্থা। সিগারেট দে।

সিগারেট নিয়ে মজিদ বাড়ি ফিরে আসে। সন্ধ্যা হয়েছে। মন্টি বৈঠকখানায় সোফায় বসে আছে। কোলের ওপর ছড়ার বই। রঞ্জনা শোবার ঘরে। কান্নার শব্দ নেই। ও মন্টির পাশে বসে।

কী করছ মামণি?

বাবা, এটা কী?

ভালুক।

ভালুক কি কামড়ায়?

মজিদ মন্টির দিকে তাকিয়ে থাকে। বুক মুচড়ে ওঠে ওর। সেই বন্ধুর গল্প মনে পড়ে। দুই বন্ধু যাচ্ছিল বনের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ ভালুকের সামনে পড়ে যায় ওরা। এক বন্ধু গাছে উঠতে জানত। অন্য বন্ধু জানত না। ভালুক দেখে এক বন্ধু দ্রুত গাছে উঠে যায়। অন্য বন্ধু কোনো উপায় না দেখে মাটিতে শুয়ে মরার মতো পড়ে থাকে। ও জানত যে ভালুক মরা মানুষ খায় না। ওকে ওভাবে দম বন্ধ করে পড়ে থাকতে দেখে ভালুক শুঁকে চলে যায়। তখন গাছ থেকে নেমে অপর বন্ধু জিজ্ঞেস করে, ভালুক তোমার কানে কানে কী বলছিল যেন? বন্ধুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ভালুক বলেছে বিপদের সময় যে সাহায্য করে না সে প্রকৃত বন্ধু নয়। ও কি এখন মৃত বন্ধুর ভূমিকায়, রমানি কি ওর প্রকৃত বন্ধু?

বাবা, কিছু বলছ না যে? বাবা ভালুক কি কামড়ায়?

মজিদ মন্টিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, কামড়ায়, বাবা কামড়ায়।

বাবা, আমি চিড়িয়াখানা যাব। ভালুক দেখব।

হাঁ, তোমাকে আমি ভালুক দেখাব।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কবে বাবা?

এই শুক্রবারে। যেদিন আমার অফিস ছুটি থাকবে।

কী মজা আমি ভালুক দেখব। বাবা, মাকে নেবে?

না। তুমি আর আমি যাব।

মা কি ভালুক দেখেছে বাবা?

হ্যাঁ, দেখেছে।

তখন রঞ্জনা তীক্ষ্ণস্বরে মন্টিকে ডাকে, মন্টি এদিকে আয়।

মন্টি দৌড়ে চলে যায়।

মজিদ সোফায় মাথা এলিয়ে দেয়। সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় কিন্তু রমানি আসে না। একটার পর একটা সিগারেট পুড়ে মেঝেতে ছাই গড়ায়। সিগারেটের টুকরো জ্বলে কিন্তু ও পায়ের নিচে চেপে নিভিয়ে দেয় না। অনেকগুলো সিগারেটের কারণে বেশ একটা আলোর দ্বীপ হয়েছে। একসময় পড়ার টেবিলে এসে বসে। ডায়েরি খুলে লেখার চেষ্টা করে। কিন্তু মাথা ফাঁকা। কিছুই চিন্তা করতে পারে না। কলম দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটে ডায়েরির পাতায়। তারপর না খেয়ে ঘুমিয়ে যায়।

আজো খুব ভোরবেলা বেরিয়ে আসে ও। নাস্তা খায়নি, এক কাপ চাও না। তবু শরীরটা ঝরঝরেই লাগছে। দু-এক বেলা না খেলে শরীরের ক্ষতি হয় না। ও আগের দিনের চায়ের দোকানে এসে বসে। গতকালকার ছেলে দুটো ওকে দেখে ওর টেবিলে এসে বসে। একজন বলে, কাল আপনার কথা ভালো লেগেছে। আমাদের কবে সময় হবে বলুন তো?

হবে, তাড়া কী? যখন হবে তখন টেরই পাবে না।

তা ঠিক।

আজ আমি তোমাদের খাওয়াব। বলো কী খাবে?

এখানে তো শুধু পরোটা আর ভাজিই পাওয়া যায়।

ঠিক আছে সবাই মিলে তাই খাই।

দোকানি ওদের নাস্তা দেয়। একজন যুবক খালি পেটে এক গ্লাস পানি খায়। অন্যজন টেবিলের ওপর তাল ঠোকে। যেন ও এই আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। মজিদ ওদের একমনে নিরিখ করে। ওর মনে হয় এরাই পারবে আগামী দিনগুলোকে সোনালি করে তুলতে। এরা চেষ্টা করছে, এরা পরিস্থিতি বোঝে, এরা পোড়খাওয়া যুবক। পোড়খাওয়া মানুষেরাই অভিজ্ঞ এবং সহিষ্ণু। বেয়ারা টেবিলে খাবার নিয়ে আসে। প্রত্যেকে প্লেট টেনে নেয়। চুপচাপ খায়। একজন হঠাৎ বলে, আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষ রাজনীতিসচেতন হলে দেশের পরিস্থিতি এমন খারাপ হতো না। একজন মানুষের খেয়ালখুশির হাতের পুতুল হয়ে গেছি আমরা।

https://boierhut.com/fb

আর একজন খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বলে, শালার ইচ্ছে হয় সবকিছু লাথি মেরে ওলটপালট করে দিতে।

মজিদ আপন মনে হাসে। একজন বলে, আপনি কিছু বলছেন না যে? তোমাদের কথা শুনছি। শুনতে ভালো লাগছে।

যখন আমাদের জড়ো হওয়ার সুযোগ আসবে, আপনি আপনার চাকরি ছেড়ে আসবেন?

নিশ্চয় আসব।

ভয় পাবেন না তো?

কিসের ভয়?

মধ্যবিত্তরা যেসব ভয় পায়।

কেমন?

পাখির নীড়ের মতো নীড়ের সুখটুকু হারানোর ভয়।

মজিদ ভেতরে ভেতরে ওদের কথায় চমকে ওঠে। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করে না। বরং দৃঢ় কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, পারব। তোমরা ডাক দিলে নিশ্চয় পারব। যতটুকু পেয়েছি ঐটুকু হারানোর কোনো ভয় নেই।

কারণ, ঐ পাওয়াটুকু পাওয়া নয়। তাই তো?

মজিদ ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

জানি জবাব দিবেন না। তবে এটাও সত্যি যে আপনি যতটুকু পেয়েছেন ঐটুকুও অন্যরা পায়নি।

সত্যি।

অথচ সবারই তো অধিকার ছিল ঐটুকু পাওয়ার?

ছিল।

কিন্তু কালকেতু ক্ষমতায় থাকলে মানুষ কোনো দিনই তার ন্যূনতম পাওনাটুকু পাবে না।

মজিদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে, হ্যাঁ পাবে না।

ছেলে দুটো ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মোহনী ভঙ্গিতে বলে, তাই কালকেতুকে সরতে হবে।

আর একজন বলে, ও সরবে না। ওকে সরাতে হবে।

তখন মজিদ জাদুভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করে, কীভাবে সরাতে হবে তা আমরা জানি। সামনে আমাদেরই সময়।

তিনজনের চোখের সামনে তিনজনই ব্যক্তি না থেকে জনগণ হয়ে যায়। এমনকি গ্লাস, প্লেট, চামচ, চায়ের কাপ, টেবিল, চেয়ার সব নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে মানুষের রূপ পায়। তিনজনই দেখতে পায় কোটি কোটি মানুষ। দেখতে পায় দোকানির চুলোটা, দাউ দাউ জ্বলছে। চুলোর ওপর চায়ের কেটলিটা কালকেতুর কুশপুত্তলিকা হয়ে জ্বলছে। আগুনের নীল শিখা নীলিমার সঙ্গে পাল্লা

https://boierhut.com/fb

দিতে উঠে যাচ্ছে আকাশে। এই আনন্দ বুকে নিয়ে মজিদ অফিসে আসে। অফিসে আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। অনেকে এসে গেছে। ও টেবিলে এসে দেখে হকার ছেলেটি কাগজ রেখে গেছে।

ও চেয়ারে বসে ড্রয়ার খোলে। কাগজপত্র বের করে। তারপর দৈনিক কাগজ হাতে নিয়ে চমকে ওঠে। একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির লাশের ছবি ছাপা হয়েছে। নাম নেই, পরিচয় নেই কিন্তু ও স্পষ্ট বুঝতে পারে যে ছবিটি নিশিকান্তর। বলা হয়েছে দা দিয়ে কুপিয়ে একে হত্যা করা হয়। মুখে কোথাও দায়ের কোপ নেই। যেন শান্ত নিরুদ্বেগ ঘুমিয়ে আছে নিশিকান্ত। মজিদ দাঁত কিড়মিড় করে, ভাঁড়ু দত্ত ওর সাহস হরণ করতে পারেনি। পারলে বিকৃত হয়ে যেত নিশিকান্তর চেহারা। আতঙ্কে বেরিয়ে আসত চোখ। দৃঢ়বদ্ধ না থেকে স্ফুরিত হয়ে যেত চোখ। অথচ কী আশ্চর্য শান্ত নিশিকান্ত! ও এক ভিন্ন মানুষ। মজিদের চোখে জল আসে। ও জানে একদিন নিশিকান্ত ভাঁড়ু দত্তের অনুচর ছিল এবং মাত্র একদিন ও ওর শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। ঐ মাত্র একদিনের জন্য নিশিকান্তকে মরতে হলো। ভালোই হয়েছে। এসব লাশ যত জড়ো হবে ততই ভাঁড়ু দত্তদের দিন গোনা শেষ হয়ে আসবে। ও নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। নিশিকান্ত লাশ হয়ে গেছে, নিজের এই বোধকে ও কিছুতেই ফুরিয়ে যেতে দেয় না।

কিছুক্ষণ পর ভবানি আসে মজিদের অফিসে। টেবিলের ওপর বিছানো কাগজ দেখে ও তিক্ত হাসে।

কী দেখছ?

মজিদ চমকে মুখ তুলে তাকায়। উত্তেজিত হয়ে বলে, দেখছ! নিশিকান্ত!

অবাক হয়েছ?

না, এ কথাটাই তোমাকে বলেছিলাম। চা খাওয়াবে?

বসো।

তাড়াতাড়ি আনতে বলো। বেশিক্ষণ বসব না।

তাড়া কিসের?

বোঝ না কত কাজ। কত জায়গায় যেতে হয়।

মজিদ মৃদু হেসে ভবানির হাত চেপে ধরে বলে, সময় আমাদের পক্ষে চলে আসছে ভবানি। খুব দ্রুত নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে।

জানি।

তারপর নিশিকান্তর ছবির ওপর আঙুল বুলিয়ে বলে, ওরা নিজেরা নিজেদের মাংস খেতে শুরু করেছে।

ভবানির জন্য চা আসে। চায়ের গরম ধোঁয়ার মতো ভবানির দৃষ্টি বহেড়া গাছের ওপর দিয়ে এই ভূখণ্ডের সমতলে পরিব্যাপ্ত হয়। মজিদ ওকে অনুসরণ করে। দেখে বহেড়া গাছের লক্ষ পাতা যেন

https://boierhut.com/fb

অজস্র মুখ। নিশিকান্তর মতো কারো চোখ বোজা নয়। প্রতিটি দৃষ্টি সংবেদনশীল তীক্ষ্ণতায় লক্ষ্যভেদী।

১৯

ফুল্লরাকে আলাদা করে দেয়ার পর একাই ঘুমোয় কালকেতু। গভীর রাতে দেবীকে স্বপ্ন দেখে থরথর করে কেঁপে ওঠে শরীর। ফুল্লরা বিছানায় থাকলে হয়তো ওকে জড়িয়ে ধরে ভয় কিছুটা প্রশমন করতে পারত। কিন্তু কেউ নেই। শূন্য ঘর। ও বিছানায় উঠে বসে আছে। হাত বাড়ালেই পানির গ্লাস। তবু টেনে নিয়ে খেতে পারে না। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। কালকেতু দুহাতে বুক চেপে ধরে বিছানায় গড়াগড়ি করে। মুখে শব্দ নেই। ভয়, শব্দ বেরুলে পাছে কেউ যদি শুনে ফেলে! কালকেতু কাতরোক্তি করে, এটা একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। এই নগরীর মানুষ জানে কালকেতুই একক অধিপতি। তার আবার ভয় কী? কিন্তু স্বপ্নে দেবী দেখা দিলে ভয় না পেয়ে উপায় কী? বিছানাজুড়ে কালকেতু গড়াতেই থাকে। ওর মনে হয় ওর কিছু করা প্রয়োজন, কিছু কাজ, খানিকটা আশ্রয়আহ্ ভুলে যেতে চাই স্বপ্ন। দেবী বলেছেন, অনেক তো হলো কালকেতু। এবার ফিরতে হবে স্বর্গে। তোমার অভিশাপের কাল শেষ হয়েছে। কালকেতু চিৎকার করে উঠেছে, না আমি আর আপনাদের স্বর্গে ফিরব না। আমি এই নগরকে স্বর্গ বানিয়েছি। এই নগর আমার মুঠোর মধ্যে। আমি ভুলে যেতে চাই আমার অতীত। আমার কোনো অভিশাপের জীবন ছিল না। এই নগরই আমার জীবনের সত্য।

দেবীর চোখে আগুন ঝরে। সে আগুনের উত্তাপ স্পর্শ করে কালকেতু। ঘুম ভেঙে যায় ওর। আস্তে আস্তে বুকের ব্যথা কমে গেলে ওর প্রচণ্ড জেদ হয়। ও লাথি দিয়ে বালিশ ফেলে দেয় বিছানা থেকে। পারলে এই লাথি ও দেবীকেই দিত। ও কাউকে তোয়াক্কা করে না। ওকে কেউ দমাতে পারবে না। ও হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলে নেয়। দু-তিন গ্লাস পানি খায়। এখন ওর একজন নারী চাই, যাকে নিষ্পেষণ করে ও নিজের ক্রোধ প্রশমিত করতে পারে। কালকেতু কারো উপদেশ শুনতে পারবে না, সে দেবীই হোক আর যেই হোক। একটু আগে যে আতঙ্ক মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল তার জন্য লজ্জিত হয়। ভয়ে বুকে ওর ব্যথা হয়েছিল, এটা ভাবতেই ওর শরীর কুঁকড়ে ওঠে। নিজের ওপর রাগ নিয়ে ও দরজা খোলে। পাশের ঘরে ফুল্লরা আছে। এই মুহূর্তে ফুল্লরাকে ওর চাই। ফুল্লরাকে ও ঠিক মন থেকে চাচ্ছে না। চাচ্ছে এই জন্য যে সময়টা খারাপ। এই মুহূর্তে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ও ইচ্ছে করলেই অন্য কোনো নারীকে ছুঁতে পারে না। দিনের বেলা কিংবা রাত বারোটার আগে হলেও কাউকে না কাউকে পেয়ে যেত। এখন এই এত রাতে ওর নিজেরও শকট চালিয়ে বাইরে যাবার ইচ্ছা নেই। অতএব ফুল্লরার দরজায় করাঘাত এও এক ধরনের পরাজয়। না, পরাজয় শব্দ কালকেতুর অভিধানে নেই। পরাজয় আবার কী? ফুল্লরার ওপর আছে ওর অধিকার। ও যা চাইবে তাই হবে। ও তখন প্রবল করাঘাতে জাগিয়ে দেয় পুরো বাড়ি। বিভিন্ন ঘরে বাতি জ্বলে। বেরিয়ে আসে কেউ কেউ। ঘুম-জড়ানো চোখে দরজা খোলে ফুল্লরা। ওকে একরকম ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকে কালকেতু। নিজেই দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘুমের আবেশে ঢুলুঢুলু ফুল্লরা। পাতলা, স্বচ্ছ নাইটির অন্তরালে মোহনীয় দেহবল্লরী। কালকেতু মুগ্ধ হয়ে বলে, চমৎকার ভেনাসের মতো দেখাচ্ছে। কতদিন পর তোমাকে দেখছি। মেদহীন ঝরঝরে শরীর বানিয়েছ দেখছি?

ফুল্লরার আবেশ কেটে যায়। রুক্ষ কণ্ঠে বলে, এতরাতে কী হয়েছে? প্রলাপ বকছ কেন?

কেন বুঝতে পার না?

কালকেতু প্রথমেই ফুল্লরার ঘাড়ে চুমু দেয়। তারপর গলার কাছে বাঁধা নাইটির ফিতা খোলে। ফুল্লরা ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে, যেভাবে দরজা ধাক্কা দিয়েছ, ভেবেছি নগরের ক্ষমতা বুঝি হারিয়েছ।

হা-হা করে হেসে ফুল্লরাকে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে কালকেতু। ওর শরীর প্রবল নিষ্পেষণে মুচড়ে দিয়ে বলে, এই নগরে এমন কোনো বাপের বেটা নেই যে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারে। তবে আমাকে সরাতে পারে একজনই?

ফুল্লরা মাথা তুলে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে, কে?

সে আমি নিজেই।

বা বা! কি যে ঘাবড়ে দিতে পার।

তা হলে তুমি ঘাবড়ে যাও?

যাই-ই তো। যতই তোমার সঙ্গে দিনের পর দিন কথা আমার বন্ধ থাকুক, তুমি ক্ষমতায় থাকবে না এটা আমি ভাবতে পারি না।

এ জন্য আজ রাতে তুমি মা হবে ফুল্লরা।

মা হব? আজ রাতে?

হ্যাঁ তোমাকে মা হতে হবে। ধরো আজ রাত থেকে চার মাসের মধ্যে?

মানে?

মানে সোজা। ভাঁড়ু দত্ত কোনো এক জায়গা থেকে আমাদের পুত্রসন্তান এনে দেবে। তুমি হবে তার মা। কেউ জানবে না কিছু।

এতবড় প্রতারণা?

https://boierhut.com/fb

প্রতারণা? কিসের প্রতারণা? ক্ষমতায় থাকার জন্য, আমার ইমেজ আরো গড়ে তোলার জন্য এটা একটা কৌশল। কৌশল? না আমি পারব না। আমার অপমান।

তোমাকে পারতেই হবে।

অকস্মাৎ হাসিতে ভেঙে পড়ে ফুল্লরা। তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গের হাসি। হাসি থামিয়ে বলে, তা হলে ক্ষমতায় থাকার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন হয়?

হ্যাঁ, হয়।

আর ক্ষমতায় থাকলে কত নারী এসে জোটে।

জুটবেই। এটাই নিয়ম।

চরিত্রহীনদের নিয়ম। অন্যদের নয়।

ফুল্লরা দুহাতে কালকেতুকে ধাক্কা দেয়। কালকেতু নিচে গড়িয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, কোন শালা চরিত্রহীন নয়? তুমি নিজে কি সতী?

তুমি এই মুহূর্তে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে খুশি হব।

এতবড় সাহস? পিঁপড়ের মতো গলা টিপে মেরে ফেলব।

পারবে না। কারণ তোমাকে ক্ষমতায় থাকতে হবে এবং আমাকে একটি পুত্রসন্তানের জননী হতে হবে।

ফুল্লরা হাসতেই থাকে। হাসতেই থাকে।

কালকেতু জগ থেকে পানি ঢেলে খায়।

হাসতে হাসতে ফুল্লরা বলে, জানি কাল সকালেই তুমি ভাঁড়ু দত্তকে বলবে যে, আমি মা হব তা নগরে প্রচার করে দিতে।

তুমি জানো, আমি যা করি, অনেক ভেবেচিন্তেই করি।

হ্যাঁ, কাঙ্গাল। তুমিই আমাকে নষ্ট করেছ।

কেউ কাউকে নষ্ট করে না। যদি না তার মধ্যে নষ্টের বীজ থাকে।

বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি, এ ঘর থেকে।

ফুল্লরা তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। যেন এই কথাগুলো ও আকাশে-বাতাসে প্রচার করে দিতে চায়ওর বুক ভেটে যায়ওর কাঁদতে ইচ্ছে করে। কালকেতু কাছে এসে বসে। আলতো করে ঘাড়ে হাত রেখে বলে, এমন চেঁচাতে নেই ফুল্লরা। চেঁচালে শরীর খারাপ হয়। তোমার এখন শরীর খারাপ করা উচিত নয়। তুমি মা হবে। ফুল্লরা তুমি মা হবে। আমি বাবা। আমরা দুজনে পিতামাতা। আমাদের সন্তান আসছে।

আমি মা হব? ফুল্লরা বিস্ফারিত চোখে কালকেতুর দিকে তাকায়। মা হব শুনতেই ওর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে। ও অনুভব করে ওর জরায়ুতে ভ্রূণ স্থাপিত হয়েছে। ও মা হবে। ওহ

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চারদিকে এত কিসের আলো? কিসের আলো? ফুল্লরা প্রবল আবেগে কালকেতুকে জড়িয়ে ধরে। কালকেতু ওর চুলে মুখ গোঁজে। বহুদির পর দুজনে খুব আন্তরিকভাবে কাছাকাছি হয়। একদিন এই জীবনে উচ্ছ্বাস ছিল, উন্মাদনা ছিল, যৌবনের মাদকতা ছিল। এখন সেই সময় নয়, সেই বয়স নয়, তবু তো সেদিনের মতো লাগছেওহ্ এত কিসের আলো? এত কিসের আলো? কালকেতু ফিসফিসিয়ে বলে, তোমার মাতৃত্বের। ফুল্লরা তোমার মাতৃত্বের। ফুল্লরার চোখ ভরে ওঠে জলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ও। কালকেতু কানে মুখ লাগিয়ে বলে, কাঁদছ কেন ফুল্লু বউ?

আনন্দে, গভীর আনন্দে।

তা হলে চলো আমরা আনন্দের বনে প্রবেশ করি, সন্ধান করি কস্তুরি আছে এমন মৃগীর?

চলো। ফুল্লরা হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নেয়। গভীর আবেগে কালকেতু ওর ঠোঁটে ঠোঁট স্থাপন করলে ফুল্লরা চোখ বোজে। দেখতে পায় বনের ধারের স্বচ্ছতায়া স্রোতস্বিনীতে নেমে যাচ্ছে ও। টলটলে জলে জলকেলি। সেদিন ছিল কার্তিক মাসের শুক্লাপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। আকাশে ছিল শুকতারা ও চাঁদের যুগ্ম অবস্থান। সেদিন ছিল এক মহা শুভলগ্ন। শুভলগ্ন! ফুল্লরা গভীর আনন্দে নিমজ্জিত হতে থাকে। বুঝতে পারে না যে, কীভাবে রাত পেরিয়ে যায়।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে ফুল্লরার। বিছানায় কালকেতু নেই। কখন যে উঠে চলে গেছে তা ও টের পায়নি। প্রবল খুশিতে ওর হৃদয় আপ্লুত। আমি মা হব, চিৎকার করে নিজেকে শুনিয়ে বলে ও। জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়। রোদে ঘর ভেসে যায়। রোদ, আমি মা হব। ও মেঝেতে পা রাখে। আলতা মাখানো পা নগ্ন। পায়ে রোদের ছোঁয়া। ওর নাচতে ইচ্ছে করে। ছুটে বাথরুমে যায়। মুখে জলের স্পর্শ। জল, আমি মা হব। ফুল্লরা কী করবে ভেবে পায় না। ঘরে ফিরে নাইটি খুলে ফেলে। নগ্ন শরীরে ফুরফুরে বাতাস এসে লাগছে। বাতাস, আমি মা হব। ও ধীরেসুস্থে শাড়ি পরে। মুখে হালকা মেকআপ লাগায়। বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখে। গলায়-কানে হীরের গয়না থেকে আলো ঝলকায়। হীরের দ্যুতি, আমি মা হব। ফুল্লরার আনন্দ প্রকাশ আর ফুরোয় না। ও যখন দরজা খুলে চিৎকার করে আয়াকে ডাকে সে কণ্ঠ অন্যদিনের চেয়ে ভিন্নসে কণ্ঠ মাতৃত্বের গৌরব এবং অহংকারের। ওর দৃষ্টিতে দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। আয়া বিস্মিত, হতচকিত দৃষ্টিতে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, টেবিল রেডি মেমসাহেব। ফুল্লরা ধীর পায়ে খাবার ঘরে আসে। ওর পদক্ষেপ সতর্ক। কারণ ও বুঝতে পারে ওর শরীর ভার, শরীরে একটি ভ্রূণ বাড়ছে। সে ভ্রূণের বয়স চার মাস। এখন ওর চঞ্চলতা মানায় না। ওর সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। এক চামচ পরিজ মুখে দিতেই ওর মনে হয় বমি হবে। ও একটুক্ষণ খাওয়া বন্ধ রাখে। তারপর আর এক চামচ মুখে দেয়। তারপর এক চামচ। তখন ওর সত্যি সত্যি বমি পায়। ও ছুটে বেসিনের কাছে যায়। যেটুকু খেয়েছিল তা বমি হয়ে যায়। আয়া ছুটে আসে।

মেমসাহেব শরীর খারাপ?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হ্যাঁ।

মাথা ঘোরাচ্ছে?

হ্যাঁ।

আয়া বিগলিত হাসি হাসে। বলে, আপনার গর্ভ হয়েছে মেমসাহেব।

আমাদের কোলজুড়ে খোকা আসবে। ওহ কী খুশির খবর! যাই সবাইকে বলি গিয়ে।

আয়া দৌড়ে চলে যায়। ফুল্লরা ধীর পায় ঘরে আসে। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বোজে। বড় করে শ্বাস নেয়। বুঝতে পারে ওর নিশ্বাসে কালকেতুর গন্ধ। ওর বোজা চোখের সামনে কালকেতু। হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক ধ্বনির মধ্যে কালকেতুর শব্দ। ফুল্লরার পুরো শরীরজুড়ে কালকেতুর ভারী পদক্ষেপ। ও কিছুতেই ভাবতে পারে না যে, কালকেতুর এ খেলার মধ্যে ফাঁকি আছে, কৌশল আছে, প্রতারণা আছে। ও দুহাতে স্তন চেপে ধরে। কলকল শব্দে ঝর্ণার মতো স্তনে দুধ ভরে উঠছে। একটি শিশুশুধু একটি শিশুর জন্য কালকেতু ফুল্লরাকে ক্রীতদাসী বানিয়ে ফেলেছে। চমৎকার আলোকিত দিন আজ। ঘরের মধ্যে রোদের যে লুটোপুটি সে রোদ বেয়ে একটি শিশু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ও দুহাত বাড়ায়, আয়, খোকা আয়। তোর জন্য আমার বুকের ভেতর কত যে সাধ! ফুল্লরা স্বপ্নের ঘোরে অভিভূত হয়ে থাকে।

দরজায় টুকটুক শব্দ হয়। আয়া খবর দেয় ভাঁড়ু দত্ত এসেছে দেখা করতে। ফুল্লরা বিছানা ছাড়ে। শাড়ির ভাঁজ ঠিক করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে। মুখে পাফ বুলোয়। দৃষ্টিতে হীরের দ্যুতি নিষ্প্রভ হয় না। ও ধীর পায়ে বৈঠকখানায় আসে। ভাঁড়ু দত্ত পা ছুঁতে গেলেই, ও থাক, থাক বলে দুপা সরে যায়।

ভাঁড়ু দত্ত বিগলিত হেসে বলে আজ আমাকে নিষেধ করবেন না। আমাদের এমন খুশির দিনে আমি আপনার পদ-চুম্বন করতে চাই।

ও ফুল্লরাকে সরে যাবার আর কোনো সুযোগ না দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পদ-চুম্বন করে বলে, আপনি মা হবেন এ তো শুধু আমাদের একার আনন্দ নয়। এ আনন্দ জাতির। জাতি আমাদের হুজুরের যোগ্য উত্তরাধিকারী পাবে। নগরজুড়ে উৎসব হবে।

ফুল্লরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এখন নয়।

না না, এখন নয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে। আপনার শরীর ভালো তো?

একটু মাথা ঝিমঝিম করে।

ও কিছু না, ও কিছু না।

ভাঁড়ু দত্ত অকারণে হাত কচলায়।

আপনার শ্বশুরের সঙ্গে সবকিছু ঠিকঠাকমতো মিটিয়েছেন তো?

https://boierhut.com/fb

হ্যাঁ, সব ঠিক করে ফেলেছি। এ নিয়ে আমার আর বিপদের কিছু নেই। জানি। টাকা দিয়ে সবকিছু হয়। এই ব্যাপারটা জানার জন্য আপনাকে ডেকেছিলাম। আপনি এখন আসুন। সময়মতো যোগাযোগ করবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে কোনো ত্রুটি আমি সহ্য করি না।

এটা আমি মনেপ্রাণে মানি বলেই তো মল্লিকাকে প্রাণ দিতে হলো।

এই জন্যই তো আমি আপনার ওপর নির্ভর করি। সব সময় তার যথাযথ মূল্য দিয়ে থাকি।

এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ফুল্লরা মৃদু হাসে। ভাঁড়ু দত্ত চলে যায়। ও ধীর পায়ে বারান্দায় আসে। সোফায় বসে সেদিনের কাগজটা তুলে নেয়। পড়তে ভালো লাগে না; কাগজ হাতে নিতেই ওর চন্দরের কথা মনে হয়। অনেক দিন চন্দরের সঙ্গে কথা হয়নি। ও কি করছে? বই পড়তে পড়তেই লোকটা মাথাটা খুইয়েছে। নইলে ওর মধ্যে চমৎকার সম্ভাবনা ছিল। বই ফুল্লরা একদম সহ্য করতে পারে না। ও তো মনে করে এই নগরীতে কোনো পাঠযোগ্য বই নেই। ও ধীর পায়ে চন্দরের ঘরে আসে। পাহারাদার ওকে দেখে তালা খুলে দেয়। চন্দর বিছানায় উপুড় হয়ে বই পড়ছিল। উস্কখুস্ক চুল। গাল ভেঙে গেছে। চোখ কোটরাগত। ফুল্লরা ওকে দেখে মনে মনে চমকে ওঠে, কিন্তু কিছু বলে না। স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা বলে।

কেমন আছ চন্দর?

বাজে কথা জিজ্ঞেস করো না।

চটছ কেন?

ফুল্লরা হেসে ওকে সহজ করার চেষ্টা করে।

যদি বলি ভালো আছি, সুখে আছি, তা হলে খুশি হবে?

হ্যাঁ, সেটাই তো সঙ্গত উত্তর। কারণ আমি তোমার আরাম আয়েশের সবরকম ব্যবস্থা করেছি। এমনকি বই ঘৃণা করা সত্ত্বেও যেসব বই তুমি চাচ্ছ তা এনে দিচ্ছি।

থুঃ।

চন্দর মেঝেতে একদলা থুতু ফেলে।

এমন করে মেঝেটা নোংরা করলে?

যেখানে আছি এটা তো একটা ডাস্টবিন। এর আবার নতুন করে নোংরা করা কী?

ফুল্লরা ওর কথার জবাব না দিয়ে একজন লোককে ডেকে মেঝে পরিষ্কার করতে বলে। চন্দর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। ফুল্লরার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা নেই। লোকটি মেঝে পরিষ্কার করে চলে গেলে ফুল্লরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চন্দরের বিছানায় বসে। ও আতঙ্কে ফুল্লরার দিকে তাকায়।

ঘাবড়িয়ো না। তোমাকে আমি ছোঁব না। একটা সুখবর দেব।

https://boierhut.com/fb

তোমার জীবনটাই তো সুখবর। নতুন আবার সুখবর কী?

কেবল খোঁটা দিয়ে কথা বলছ? এসব আমি গায়ে মাখছি না। শোনো, আমি মা হব চন্দর।

মা হবে?

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে মেঝেতে দাঁড়িয়ে হা-হা হাসিতে গড়িয়ে পড়ে চন্দর। ওর ব্যঙ্গের হাসিতে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ফুল্লরার। দুচোখে আগুন ছোটে।

হাসছ যে?

হাসির কথা বললে হাসব না।

হাসির কথা? তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার সঙ্গে রসিকতা করছি?

তা নয় তো কি? তুমি মা হলে তো ডাক্তারি শাস্ত্র মিথ্যা।

ফুল্লরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। চিবিয়ে বলে, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ?

অবিশ্বাস করার কথাই তো তুমি বলেছ।

চন্দর তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

ফুল্লরার কণ্ঠ ভেঙে খানখান হয়ে যায়।

বিশ্বাস করার তো কথা তুমি বলছ না।

তুমি কি ভেবেছ আমি মা হতে পারি না?

পার না, একদমই পার না। তুমি তো অনেক চেষ্টা করলে। ডাক্তারি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আমাকে পর্যন্ত। আর কত করবে? আর কত তোমার প্রয়োজন?

ঠিক আছে, এই অবিশ্বাসের শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।

ভয় দেখিয়ো না ফুল্লরা। আর কী করবে? বাকি আছে আমার মৃত্যু। যেটাই বাকি থাক সেটা জানার তোমার প্রয়োজন নেই। শুধু জানবে আমি কোনো বিরোধিতা সহ্য করি না। অবিশ্বাসীরা আমার কাছে শাস্তি পায়। কঠিন শাস্তি।

আবার প্রচণ্ড হাসিতে ঘর ভাসিয়ে দেয় চন্দর। ফুল্লরা দুপদাপ পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ও ফুল্লরাকে ডাকে, শোন ফুল্লরা, আর যাই করো প্রতারণা করো না।

অসহ্য। অসহ্য তোমার আচরণ।

ফুল্লরা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়। রাগে মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। এমন একটা স্বপ্নের আমেজ চন্দর নষ্ট করেছে। চন্দরের কঠিন শাস্তি প্রাপ্য হয়েছে। ও ভাবতে ভাবতে শোবার ঘরে আসে। ফোন বেজে ওঠে, ওপাশে কালকেতু।

ফুল্লু বউ কী করছ? কোমল মোলামেয় কণ্ঠ কালকেতুর। প্রবল আবেগ, গভীর মমতা ফুল্লরার জন্য। ঐ কণ্ঠ ফুল্লরাকে অবশ করে দেয়। ওর রাগ পড়ে যায়। ও দেখতে পায় ওর চারদিকে কেবলই কালকেতু। ও কালকেতুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একমুহূর্ত চুপ করে থাকে।

https://boierhut.com/fb

ফুল্লু বউ, সোনা আমার!

কী গভীর উৎকণ্ঠা কালকেতুর কণ্ঠে। যেন যৌবনের শুরু, কালকেতুর জীবনে ও একা, অন্য কোনো নারী নেই। ফুল্লরা গভীর শ্বাস ফেলে। সময়টা যদি সবসময় এমনই থাকত।

দীর্ঘশ্বাস কেন ফুল্লু বউ? শরীর খারাপ?

হ্যাঁ, সকালে খাবার পর বমি হয়েছে।

বমি হয়েছে? বমি তো হবেই। এ সময় এমনই হয়। তুমি কিছু ভেবো না। তোমার কি খেতে ইচ্ছে করে বলো?

কিছুই খেতে ইচ্ছে হয় না ।

চুপটি করে শুয়ে থাকো। শুধু স্বপ্ন দেখো ফুল্লু বউ যে, আমাদের সন্তান আসছে। এ যেন এক শুভলগ্ন।

ঠিক বলেছ, একদম ঠিক।

টেলিফোনে কালকেতুর কণ্ঠ কলবল করে। উচ্ছ্বাসে, রগড়ে সে এক আশ্চর্য কণ্ঠ। ফুল্লরা কোনোদিন কালকেতুর এমন কণ্ঠের আভাস পায়নি।

এক আশ্চর্য সুন্দর দিন। পবিত্র দিন।

রাখি ফুল্লরা। একটু ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। তোমাকে পরে আবার ফোন করব। তুমি কোথাও বেরিয়ো না। তুমি মা হবে এ খবর আমি আমার পরিষদ সদস্যদের জানিয়েছি। সবাই খুব খুশি।

কালকেতু ফোন রেখে দেয়। ওর কণ্ঠের মায়াজালে অভিভূত হয়ে ফুল্লরা উত্তেজনা বোধ করে। ও কি করবে বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে নিজেকে এক গভীর সাধনার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। এই সাধনা সব নারীর—যে যাত্রা ঈভের থেকে শুরু—যার কোনো শেষ নেই। তখন ফোন বেজে ওঠে। অর্থমন্ত্রী ওকে অভিনন্দন জানায়। প্রত্যেকের সঙ্গে গদগদ কণ্ঠে কথা বলে ফুল্লরা। ক্লান্তি নেই—এ এক ক্লান্তিহরণ করা সময়। ও ঘুরেফিরে লাউঞ্জে এসে বসে। তখন ওর চন্দরের কথা মনে হয়। এত আনন্দের মধ্যেও বিষ। বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে ফুল্লরার হৃদয়ে। ওকে মরতে হবে। ও দ্রুত ঘরে যায়। পায়চারি করে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠায় বিষ কেনার জন্য।

দুপুর গড়ায়। কালকেতু ফেরেনি। ফুল্লরা একা একা দুপুরের খাবার খায়। না, এখন ওর আর কোনো বমি পায় না। ওর এখন অন্য চিন্তা। ওর একা একা প্রয়োজন। সকালে তেমন খেতে পারেনি বলে এখন পেটপুরে খাচ্ছে। খাবারের কত আয়োজন। সবকিছু খেতেও পারে না। একটু পরপর হাত থেমে যায়। চন্দরের মুখ ভেসে ওঠে। সেই তো যৌবনের শুরু। এখন চন্দরের মাথার চুল অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে। চন্দর দুই সন্তানের জনক।

মেমসাহেব এই টকটা দেব? এখন টক খেতে ভালো লাগবে।

কিসের টক?

https://boierhut.com/fb

জলপাইয়ের চাটনি।

দাও একটু।

কিন্তু টকটা প্লেটে নিয়ে খেতে ভালো লাগে না ফুল্লরার। টক ও কখনো পছন্দ করত না। ও মুখ বিকৃত করে টকটা উঠিয়ে দেয়। আয়া মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে; ফুল্লরা টেবিল ছেড়ে উঠে আসে। চিত্ত কিছুটা বিক্ষিপ্ত। বারবারই ভাবে কাজটা ও নিজের হাতে করবে। ও দুপুরে বিশ্রাম নিতে পারে না। উঠে বসে, পায়চারি করে। বিকেল গড়ায়। ওর অস্থিরতা বাড়ে আজ, আজই শেষ দিন চন্দরের। এই নগরীতে অবিশ্বাসীর ঠাঁই নেই। ও আর কালকেতু যা বলবে সেটাই ধ্রুব সত্য।

সন্ধ্যার পর চন্দরের তরকারিতে নিজের হাতে বিষ মেশায় ফুল্লরা। আজ ওর জন্য একটাই আইটেম। খেতেই হবে। বেশি দিলে ছোঁয় না চন্দর। একটা তরকারি দিয়ে খেয়ে নেয়। তাই আজ আর বাছবিচারের সুযোগ নেই। ফুল্লরার নিজের হাতে এই বিষ মাখানো তরকারি চন্দরকে খেতেই হবে। তারপর? তারপর নীল হয়ে যাওয়া শরীর শকুনে খাবে। কাজের লোককে বলে দিল চন্দরের রাতের খাবার দেওয়ার পর ওকে যেন খবর দেওয়া হয়। তারপর ধীর পায়ে নিজের ঘরে আসে। গায়ে সুগন্ধি মাখে। কৌটা খুলে দুটো এলাচ মুখে দেয়। গা কেমন গুলাচ্ছে। ঠিক দুর্বলতা নয়, বিবমিষা। পিতা হবার বাসনায় কালকেতু মাতোয়ারা। কেন মাতোয়ারা? কিসের বাসনা? নিজেকে প্রশ্ন করতে গিয়ে ফুল্লরা আবার নিজের ভেতর গুটিয়ে যায়। এখন আর প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই। ও তো আসলেই মা হবে। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালে দেখতে পায় বিশাল চাঁদ আকাশে। এমন ভরা পূর্ণিমা ও কতদিন দেখেনি। আশপাশের কত কিছু কত সময় যে দেখা হয় না। যেন কতদিন ধরে চন্দর এখানে আছে অথচ কোনোদিন ওর খাওয়া দেখা হয়নি। আজ ওর শেষ খাওয়াটি দেখার জন্য ফুল্লরা অপেক্ষা করছে। এই প্রতীক্ষা সেই প্রতীক্ষা নয় যখন ও চন্দরকে জীবনের প্রথম পুরুষ ভেবেছিল। ওহ্ সেই কত যুগ আগের ঘটনা। সেই স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে গেছে। আজকের আকাশটা অদ্ভুত এক চিত্রিত আকাশ। মেঘগুলো কোনো শিল্পীর আঁকা ছবির মতো ঝুলে আছে। হালকা লাল-কালো রঙের মিশেল ফুল্লরার দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করে। তখন আয়া এসে খবর দেয় যে চন্দরকে খাবার দেওয়া হয়েছে। ঘরে নীল বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে ফুল্লরা। ও জানে ঐ খাবার খাওয়ার পর চন্দর নীল হয়ে যাবে। বিষক্রিয়ায় শরীর নীল হয়। তখন শিস বাজাতে বাজাতে ও ঘর থেকে বের হয়। নিঃশব্দে চন্দরের ঘরে এসে ঢোকে। টেবিলে খাবার। খেতে বসেছে ও। দরজার দিকে পিঠ। ফুল্লরাকে দেখতে পায়নি। কতটুকু খাওয়া হয়েছে ওর? ফুল্লরা দেখতে পাচ্ছে না। দুই লোকমা? পাঁচ লোকমা? ফুল্লরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে চন্দর খেয়ে যাচ্ছে। ও এক পা, দুপা করে এগোয়। হয়তো পায়ের শব্দ টের পেয়েছে চন্দর। মুখ না ফিরিয়ে বলে, কি আজ অল্প আয়োজন যে? আর কিছু আনবে নাকি? আজকের রান্নাটা ভালো হয়নি। আমার খুব খারাপ লাগছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফুল্লরা কথা বলে না। ঘরের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এবং তার অল্প কিছুক্ষণ পরই চন্দর চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে ওঠে।

তুমি?

তোমার খাওয়া দেখতে এলাম।

তুমি আমাকে কী খাওয়ালে ফুল্লরা? আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। ওহ্ কী কষ্ট! কী যন্ত্রণা!

চন্দর মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি যায়। ওর আর্তনাদে দরজার বাইরে লোকজন জড়ো হয়। ফুল্লরা দেখে চন্দর দুমড়াচ্ছে, মোচড়াচ্ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে ও যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করছে। চোখ বড় হয়ে যাচ্ছে। মণিগুলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। মুখে নীল দাগ ফুটে উঠেছে। ঠোঁটের কোনা বেয়ে লালা আসছে। গলায় গোঁ গোঁ ধ্বনি। ফুল্লরা চন্দরের বিছানায় বসে। ছুটে আসে মোহর আলি, মেমসাহেব, ডাক্তার ডাকবেন?

ফুল্লরা কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালে মোহর আলির গলা শুকিয়ে যায়। ভয়ে ওর পেটে ব্যথা ওঠে। ও দাঁড়াতে সাহস পায় না। ফুল্লরা দরজার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলে, বেরিয়ে যাও। সবাইকে যেতে বলো। দরজা বন্ধ করে রাখো।

চন্দরের গোঙানি থামে না, ওর গড়াগড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। মুখে হেঁচকি উঠছে। চোখের পাতা বুজে আসছে। নিশ্বাস প্রলম্বিত হচ্ছে। আস্তে আস্তে মুখটা হাঁ হয়ে থাকে। জিভ বেরিয়ে আসে। ঠোঁট আর বন্ধ হয় না। ফুল্লরা চিবিয়ে বলে, জেনে রাখ চন্দর আমি মা হব। হ্যাঁ, মা হব।

তখন চন্দরের গোঙানি থেমে যায়। দুবাহু শিথিল হয়ে পড়ে আছে দুপাশে। ঘাড় কাত হয়ে গেছে। চন্দরের গায়ে গেঞ্জি, পরনে সাদা লুঙ্গি। বুকের ওঠানাম নেই। নিথর শরীর। ঘরজুড়ে বই। বিছানা বালিশ উলটানো। ফুল্লরা চারদিকে তাকায়। প্রতিদিন একটি করে চাদর বদলানো হয়েছে এই বিছানায়। যখন যে বই চেয়েছে সে বই ওকে দিয়েছে ফুল্লরা। তবুও চন্দরের স্বস্তি ছিল না। স্বস্তি কী? ফুল্লরা শব্দ করে হেসে ওঠে। চন্দর যে ধরনের স্বস্তি চায় সে ধরনের স্বস্তির সঙ্গে ও পরিচিত নয়। ওর সবকিছুতেই স্বস্তি আবার কোনো কিছুতেই স্বস্তি নেই। টেবিলে প্রচুর কাগজ। এখানে বসেও চন্দর কী যেন লেখালেখি করছিল। ফুল্লরা কাগজগুলো টান দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেয়। তারপর দিয়াশলাই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। কেমন দাউ দাউ জ্বলে ওঠে আগুন। আগুনের পাশে চন্দরের লাশ। লাশ এবং আগুন—আগুন এবং লাশ ভাবতে ভাবতে ও লাউঞ্জে আসে। ওর বিশ্বস্ত অনুচরকে খবর দেওয়া ছিল। সে অপেক্ষা করছে লাউঞ্জে। ফুল্লরাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। ফুল্লরা ওকে দেখে রূঢ় কণ্ঠে বলে, তোমাকে যে নির্দেশ দেব তা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়।

লোকটি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একটুও নড়ে না। চোখের পলক ফেলে না। ঘাড় নাড়ায় না। শরীরে কোনো স্পন্দন নেই।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শোনো, নিচের ঘরে যে লাশটি আছে আজ রাত দুপুরে সেটি নিয়ে উত্তরপাড়ার শেষ প্রান্তে ফেলে আসবে। যেন লোকের চোখে পড়ার আগেই শেয়ালে এবং শকুনে খেয়ে ফেলে সে লাশ। দুদিন পর আমার কাছ থেকে একটি ফোন নাম্বার নেবে। সে নাম্বারে ফোন করে তার স্ত্রীকে জানাবে যে চন্দর খুন হয়েছে। অমুক জায়গায় ওর লাশ পড়ে আছে। ঠিক আছে?

লোকটি মাথা নিচু করে।

তা হলে যাও।

ফুল্লরা শোবার ঘরে আসে। বাথরুমে ঢুকে সব কাপড় খুলে ফেলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ায়। নগ্ন শরীর বেয়ে জলের ধারা গড়ায়। প্রচণ্ড কাঁপুনিতে ওর শরীর থরথর করে কাঁপে। গা গুলিয়ে উঠছে। ও হড়হড়িয়ে বমি করে। দুপুরে যা খেয়েছিল সব বেরিয়ে আসে। গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে। তবু রক্ষা যে জলের স্পর্শ আছে। ওর তখন এ বদ্ধ ঘরে নিজেকে বন্দি মনে হয়। ওর দম আটকে আসছে। ও বেরুনোর জন্য পাগলের মতো ছিটকিনি হাতড়ায়। খুট করে ছিটকিনি খোলার সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপর এলিয়ে পড়ে ওর শরীর।

অনেক রাতে ওর যখন ঘুম ভাঙে দেখতে পায় ও কালকেতুর বিছানায়। ঘরে নীল বাতি জ্বলছে। মাথার কাছে কালকেতু বসে আছে। ওর ডান হাত কালকেতুর হাতের মুটোয়। ওর মনে পড়ে একদিন এই ঘর থেকে কালকেতু ওকে বের করে দিয়েছিল। ও চোখ খুলতেই নরম স্বরে ডাকে, ফুল্লু বউ? ফুল্লরার মনে হয় মোটা, কর্কশ কণ্ঠস্বর কালকেতুর। ঐ কণ্ঠস্বর শুধুমাত্র একজন জল্লাদের হতে পারে। কালকেতু আবার ডাকে, ফুল্লু বউ কেমন লাগছে? দেখো আমি এসেছি।

তুমি কি কাউকে খুন করে এসেছ?

খুন? কী বলছ তুমি?

তোমার কণ্ঠস্বর এমন লাগছে কেন?

তোমার শরীর ভালো নেই ফুল্লু বউ। তুমি ঘুমোও।

আমি এখানে কেন?

এখন থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে। আমার আদরে এবং যত্নে। তুমি মা হবে ফুল্লু বউ। আমাদের সন্তান আসছে।

কালকেতুর মোহনীয় কণ্ঠে ফুল্লরা ঘুমিয়ে পড়ে। ফুল্লরার নিমীলিত চোখের দিকে তাকিয়ে কালকেতু দ্বিধায় পড়ে। কী হয়েছিল ফুল্লরার? বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে গেল। ওর আয়াকে জিজ্ঞেস করে কোনো সদুত্তর পায়নি। অন্যরাও বলেছে কিছু জানে না। ওরা সব ফুল্লরার বিশ্বস্ত অনুচর। এভাবেই ও নিজের জন্য একটি সাম্রাজ্য তৈরি করেছে। ওখানে কালকেতুর প্রবেশ নেই। একটু পর ফুল্লরা আবার জেগে যায়। বলে, ঘরের নীল বাতিটা বন্ধ করে দাও।

কালকেতু নীল বাতি বন্ধ করে দিয়ে সবুজ বাতি জ্বালায়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আবার জ্বালালে কেন? তুমি ঘুমোবে না?

আমার ঘুম আসছে না; আমি তোমার কাছে বসি।

আমার তো কিছু হয়নি। কেন আমার কাছে বসবে? তুমি শুয়ে পড়।

তুমি বুঝতে পারছ না ফুল্লু বউ এখন তোমার সুস্থ থাকাটা ভীষণ প্রয়োজন।

তুমি বসে থাকলেই কি আমি সুস্থ থাকব?

বাহ্ আমায় খেয়াল রাখতে হবে না। আবার যদি কিছু হয়?

ফুল্লরা চেঁচিয়ে ওঠে, আমার কিছু হবে না। তুমি শুয়ে পড়।

কালকেতু আর কথা না বাড়িয়ে বাতি বন্ধ করে দেয়। বিছানায় ঘুম আসে না ওর। বারবার মনে হয়, এ এক ভয়ঙ্কর খেলা। ফুল্লরার সঙ্গে ও এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে। তবে সন্তান ওর চাই-ই। ভাঁড়ু দত্ত সব ঠিক করে রেখেছে। ক্লিনিকের সঙ্গে সব কথাবার্তা পাকা। যে সন্তান দেবে তার সঙ্গে দামদস্তুর ঠিক করা হয়েছে। এখন কেবল অপেক্ষা। পৌরুষের অক্ষমতা ওকে বড় বেশি মর্মপীড়ায় তাড়িত করছে। এই অক্ষমতাটুকু বাদে ওর বাকি সবকিছু তো ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে আছে। ভাবতে ভাবতে ওর ঘুম পায়। সে রাতে ও স্বপ্ন দেখে যে নগরের চত্বরে ওর বিরাট স্বর্ণমূর্তি নির্মিত হয়েছে। মূর্তির পাদদেশে ফুলের মালার স্তূপ। স্বপ্ন দেখে ভোররাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেলে ও দরজা খুলে বারান্দায় আসে। আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। গভীর তৃপ্তি ওকে আচ্ছন্ন করে। এই জ্বলাটুকুই তো ওর। অন্ধকার ওর নয়।

মাস কয়েক পর একদিন গভীর রাতে ভাঁড়ু দত্ত একটি পুত্রসন্তান ফুল্লরার কোলে তুলে দেয়। শিশুটিকে বুকে নিয়ে ফুল্লরা পাগলের মতো আদর করে। তারপর কেঁদে ফেলে। কালকেতু ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, কাঁদছ কেন ফুল্লু বউ? তুমি মা হয়েছ। এই নগরীতে তুমি এখন মাতৃত্বের অহঙ্কারে পা ফেলবে। তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া উপলক্ষে আগামী সাত দিন নগরীতে উৎসব হবে। আমাদের আর কোনো ভয় নেই। একটি অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে গেল।

ফুল্লরা শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে, সোনা, আমার সোনা মানিক। কতকাল ধরে তোর অপেক্ষায় ছিলাম আমি। ফুল্লরার আদরে শিশুটি কেঁদে ফেলে। কালকেতুর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। এমন সহজ বিজয়ই তো ওর নিয়তি। ও যেখানে হাত দেয় সেখানেই ওর ভাগ্য ওর অনুকূলে কাজ করে।

ফুল্লরা ছেলেকে আদর করতে করতে ঘরে ঢোকে। ছেলের জন্য আগে থেকেই অজস্র জিনিস কেনা হয়েছে। এমন জিনিস বাদ পড়েনি যেটা শিশুর দরকার হবে। ফুল্লরা নিজে ঘুরে ঘুরে এইসব জিনিস সংগ্রহ করেছে। ও অবাক হয়ে লক্ষ করে যে, ওর কণ্ঠ থেকে ঘুম পাড়ানি গান ভেসে আসছে। দোলনায় শিশুটিকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ওর মুখের ভেতর দুটো আঙুল। আঙুল চুষে শিশুটি কি তৃষ্ণা মেটাচ্ছে? ফুল্লরা অপার বিস্ময়ে শিশুটিকে অবলোকন করে। কালকেতু ওর ঘাড়ে হাত রেখে দাঁড়ায়।

https://boierhut.com/fb

তুমি খুশি তো?

কেমন করে বলব কত যে খুশি হয়েছি।

শিশুর দিকে তাকিয়ে দুজনের চোখের পলক পড়ে না। দোলনা দুলতে থাকে।

ইচ্ছে করছে ওর মাথায় একটা সোনার মুকুট পরিয়ে দেই।

সঙ্গে সঙ্গে কালকেতু বলে, আমিও ভাবছি, যদি পারতাম ওকে একটি সোনার সিংহাসন বানিয়ে দিতে। বলতাম এই নগর তোর। আজ থেকে তুই আমার উত্তরাধিকারী। আর কেউ বলতে পারবে না যে কালকেতুই এই নগরের শেষ।

ফুল্লরা গাঢ় কণ্ঠে বলে, কে বলেছে আমাদের শেষ আছে? আমাদের কোনো শেষ নেই।

পরদিন নগরবাসী বিস্মিত হতবাক হয়ে দুটো খবর শোনে। সবগুলো প্রচারমাধ্যমে বারবার ঘোষণা দিয়ে সে খবর দুটো প্রচার করে। এক, কালকেতু পুত্রসন্তানের পিতা হয়েছে। দুই, নগরের চত্বরে কালকেতুর স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এ ঘোষণায় বিস্মিত হয়নি মজিদ। চন্দরের মৃত্যু ওকে গভীর শোকে মর্মাহত করে রেখেছে। ও জানে যে কারণে চন্দর মৃত্যুবরণ করে সেই একই কারণে কালকেতু পিতা হয়। এ দুয়ের উৎস এক। ক্ষমতার অপব্যবহার মানুষকে উন্মত্ত করে তোলে। কালকেতুর আছে অজগরের জিহ্বা। সে জিহ্বা গলাধঃকরণ করতে পারে পুরো নগর। চন্দরের মৃত্যু ক্ষমতার অপব্যবহারের চূড়ান্ত পর্যায় বলেই ও মনে করে। এ বিশ্বাসে ওর কোনো দ্বিধা নেই।

যেদিন অঞ্জলি টেলিফোন করে ওকে এক অদ্ভুত টেলিফোনের কথা বলে সেদিন মজিদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল যে চন্দর নেই। মানুষ কত নির্মম হয়ে গেলে ঠাণ্ডা মাথায় একজন মানুষকে খুন করে টেলিফোনে সে খবর তার স্ত্রীকে দিতে পারে? এই নগরে এতকিছু এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে। একেই কি দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বলে? পিছুনোর আর কোনো জায়গা নেই? চন্দরের লাশের ওপর কোনো গাছের ছায়া ছিল না। শেয়ালে থুবলে খেয়েছিল কলজে। শকুনে নাড়িভুঁড়ি। একটা চোখ ছিল না। পায়ের পাতাগুলো ছিন্নভিন্ন। গলিত মাংস খুলে পড়ছিল। উৎকট গন্ধ ছিল চারদিকে। ওহ্ কী বীভৎস সে দৃশ্য! চোখ বন্ধ করলে মজিদের শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। এই নগরের জন্য ভালোবাসা ছিল চন্দরের। নগরের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাত। নগরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান চেয়েছিল ও। এ জন্যই কি মরতে হলো ওকে? নাকি অন্য কিছু? ভবানি বলেছে, কারণ জেনে লাভ নেই। ওকে খুন করা হয়েছে এটুকুই সত্য। আমরা এই খুনের প্রতিশোধ নেব। চন্দরের মৃত্যু আমাদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছি। ভবানি যাই বলুক, চন্দরের মৃত্যুতে মজিদের মনে হয় ওর ভিত নড়ে গেছে। সবসময় ওর গা ছমছম করে। একা হয়ে গেলে ওর ভয় করে। চোখ বুজতে কষ্ট হয়। ইচ্ছে করে সারারাত জেগে বসে থাকতে। রঞ্জনা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। মজিদের জন্য ওর সুখদুঃখ নেই। ও আর মজিদকে নিয়ে ভাবে না। রমানি মাঝেমধ্যে আসে। কাজের মেয়ের কাছে এ খবরটুকু পেয়েছে। রমানি এলে রঞ্জনা খুশি হয়, মেয়েটি সে কথাও বলেছে। রমানি গাদা গাদা খাবার আনে। তার কোনো কিছু মজিদের সামনে আনে না। ও ধরে নিয়েছে যে, রঞ্জনাকে নিয়ে ও আর কোনোকিছু ভাববে না। রঞ্জনা এভাবেই থাকুক। ইদানীং অনেক রাতে ঘরে ফেরে ও। দেখতে পায় টেবিলে খাবার ঢাকা। রঞ্জনা ঘুমিয়ে গেছে। মেয়েটি ওকে দরজা খুলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ও একা ভাত খায়। তারপর পড়তে বসে। পড়তে বসলে পাহারাদারের বাঁশি ওর মগজে তীব্র হয়ে ওঠে। ওর মনে হয় ঐ শব্দটি আঁধার কেটে এগিয়ে আসছে। শব্দটি আলোর রেখার মতো। আজ রাতেও পাহারাদারের বাঁশির শব্দ ঐ ঘোষণা দুটো বয়ে আনে। পুত্রসন্তান প্রাপ্তি উপলক্ষে সাতদিন ধরে উৎসব এবং এই সাতদিনেই হবে কালকেতুর স্বর্ণমূর্তি।

https://boierhut.com/fb

মজিদ জীবনানন্দ দাশের কবিতা খুলে বসে। কতকাল আগের লেখা কবিতা। অথচ এই নগরের জন্য কত গভীরভাবে প্রযোজ্য। মজিদ নিচুস্বরে আবৃত্তি করে—অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;/ যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই প্রীতি নেই। করুণার আলোড়ন নেই। পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া/ যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়/ মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/ শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

মজিদ বারবার পড়ে—বারবার—বারবার। পড়তে পড়তে মনে হয় শকুন আর শেয়ালে খেতে আসছে ওকে। ও দৌড়ে যাচ্ছে এক জনপদ দিয়ে। চারদিকে ক্যাকটাসের ঝোপ। ছিঁড়ে যাচ্ছে হাত-পা। মুখে থুতু উঠে আসছে। কী ভীষণ অন্ধকার চারদিকে। মজিদের মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। সে আর্তনাদে ভেসে যায়। ঢোলের শব্দে। নগরীতে উৎসব। রাতদিন ঢোল বাজে। এক মুহূর্তের জন্যও বিরাম নেই। ঢোলের শব্দে ভেসে যায় আর্তনাদ। মজিদ সোফায় উপুড় হয়ে আনন্দধ্বনি শোনে। কালকেতুর ভাষায় মঙ্গলধ্বনি। নবজাতকের আগমনে নাকি চারদিকে মঙ্গল। এই নগরী মঙ্গলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

পরদিন অফিসে যাওয়ার পথে ও দেখতে পেল নগরের চত্বরে কালকেতুর মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষ। ওদের মধ্যে রঞ্জনা। মানুষ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তীক্ষ্ণস্বরে কথা বলছে। মজিদ ওদের মাঝে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। শুনতে পায় ওদের কথা।

কেন বানানো হচ্ছে এই মূর্তি?

এটা বানিয়ে কী হবে?

এটা বানিয়ে আমাদের কী লাভ?

আমাদের পেটে ভাত নেই আর কালকেতুর সোনার মূর্তি?

ইচ্ছে হয় লাথি দিয়ে ভেঙে দেই।

ইচ্ছে হয় ওর মুণ্ডুটা কেটে এনে চিবিয়ে খাই।

বিশ্বাস হয় না যে আঁটকুড়েটা বাপ হয়েছে।

আমারও মনে হয় এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে।

চুপ করো। আমাদের এত কথা বলার কি দরকার?

ন্যায্য কথা বলব না কেন?

এই টাকা দিয়ে তো গরিব মানুষের দুঃখ দূর করা যায়।

হ্যাঁ, ঠিক আমাদের গরু কিনে দিক। আমরা বেশি করে ধান ফলাব।

আমাদের জন্য একটা কারখানা বানাক। আমরা নিজেদের কাপড় নিজেরা বানাব।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাই তো। আমাদের কত কিছুর দরকার। খামোখা এখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এই শুয়োরের বাচ্চা যতদিন নগর অধিপতি থাকবে ততদিন আমাদের মঙ্গল নেই। ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে কেবল নিজের আখের গোছায়। ফুল্লরা তো একটা ডাইনি।

ডাইনিটাকে পুড়িয়ে মারা উচিত।

আমরা সবাই মিলে একজোট হলে তো শয়তান দুটোকে নগর থেকে বের করে দিতে পারি।

হ্যাঁ, পারি। পারি, পারি।

পারি, পারি, শব্দ চারদিকে বিস্তৃত হতে থাকে। মজিদ এদিক-ওদিক তাকায়। দেখতে পায় প্রতিটি লোকের ঠোঁট নড়ছে। প্রত্যেকে শব্দটি উচ্চারণ করছে।

ও ধীর পায়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসে। রিকশার জন্য হাত তুলতেই দেখতে পায় আযমউদ্দীন এগিয়ে আসছে। অনেকদিন আগে আযমউদ্দীন বলেছিল, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হতেও পারে। দুনিয়াটা বড় তাজ্জব জায়গা।

কেমন আছ আযমউদ্দীন?

আর কেমন থাকা।

আযমউদ্দীনের বুক ফুঁড়ে নিশ্বাস বেরোয়।

নগরে তো বেশ উৎসব আযমউদ্দীন। কালকেতুর ছেলে হয়েছে।

কালকেতুর ছেলে?

আযমউদ্দীন হা-হা করে হেসে ওঠে।

হাসছ কেন আযমউদ্দীন?

হাসব না? হাসির কথা যে।

হাসির কথা? কী বলছ তুমি?

ভালো, ভালো, খুব ভালো। পরের ছেলেরে নিজের ছেলে বলে মানুষ করা।

এমন কথা যে বলছ তোমার একটুও ভয় নেই আযমউদ্দীন?

না, আর ভয় নাই। পেটে ভাত না থাকলে আর ভয় থাকে না। ভয় তাদের যাদের অনেক আছে। এবার একটা লড়াই যে হবে।

কিসের লড়াই আযমউদ্দীন।

লড়াই রাজা আর উলুখড়ের। লড়াই কালকেতু আর আযমউদ্দীনের।

মজিদ চমকে ওঠে। আযমউদ্দীনের মুখ ও দেখতে পায় না। পিঠ দেখে তো প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। পিঠে দেখা যায় ঘামের রেখা, ঘামাচি, মরা চামড়া, লোমকূপ। আযমউদ্দীনের পিঠ শক্ত। কারণ আযমউদ্দীনের মেরুদণ্ড সোজা। পিঠে মেরুদণ্ড আছে। আযমউদ্দীনের মেরুদণ্ড দিয়েই লড়াই। কালকেতুর পিঠে মেরুদণ্ড নেই। ওটা তীরন্দাজ বাহিনীর কাছে জমা হয়ে আছে। তাই কালকেতু

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

লড়তে পারবে না। কারণ তীরন্দাজ বাহিনীও অন্যের মেরুদণ্ড ধার করে লড়তে পারবে না। আসলে ওরা সবাই শক্তিহীন। ও তখন আযমউদ্দীনের মেরুদণ্ড নিরিখ করতে করতে বলে, লড়াইয়ের ফলাফল কী আযমউদ্দীন?

আযমউদ্দীনের ভরাট কণ্ঠে বলে, আযমউদ্দীনের জয়।

রিকশা এসে গেটের সামনে দাঁড়ায় তখন। জয় শব্দ শুনে মজিদ লাফিয়ে রিকশা থেকে নামে। ওর মুখ দেখতে চায়। উজ্জ্বল মুখ। আযমউদ্দীন হাসছে। লড়াইয়ের জন্য পিঠ যেমন শক্ত, বিজয়ের জন্য মুখ তেমন উৎফুল্ল। ও আযমউদ্দীনের আপাদমস্তক দেখে নেয়। তারপর ভাড়া মেটায়।

তোমার সঙ্গে আমার কি আর দেখা হবে আযমউদ্দীন?

কে জানে হয়তো হবে।

আযমউদ্দীন ওর পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। যতক্ষণ রিকশাটা দেখা যায় ততক্ষণ মজিদ দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো কোনো মানুষ এমন করেই আরেকজনকে প্রভাবিত করে। কত দূরের মানুষ অথচ কত তার টান। রিকশাটা চলে গেলে মজিদ অফিসে আসে। আজ ওর কাজ করতে একটুও ভালো লাগে না। মনের সুর কেটে গেছে। বারবার একজন আযমউদ্দীন ওর মগজে হানা দেয়। মগজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আবার জোড়া লাগে আবার টুকরো টুকরো হয়। ও চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। কাগজ খুলতে ইচ্ছে করে না। সব কাগজে কালকেতুর দুটো খবর। ফলাও করে প্রচারিত হচ্ছে। সেইসঙ্গে উৎসবের বর্ণাঢ্য বর্ণনা। পড়ার মতো কিছু নেই। টেবিলে প্রুফ জমে আছে। ও খুলে বসে দেখার চেষ্টা করে। তখন গণি মিয়া এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়।

স্যার?

বলো। মজিদ ওর দিকে তাকায়।

স্যার মেয়েটার বিয়ে ঠিক করেছি।

ভালো। খুশির খবর।

স্যার ছেলে অনেক কিছু চায়।

তা হলে এমন ছেলের কাছে মেয়ের বিয়ে দিও না।

দিতে তো ইচ্ছে হয় না। ছেলেটার একটা চাকরি আছে যে।

তাই বলে যৌতুক দিয়ে?

কী করব স্যার। গরিব মানুষের উপায় কী? স্যার আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করেন? অফিসের সবার কাছ থেকেই চাব।

মজিদ মানিব্যাগ খুলে ওকে দুই শ' টাকা দেয়। গণি মিয়া চলে যায়। হঠাৎ করে মজিদের শরীরে শিরশিরে অনুভূতি হয়। ও বুঝতে পারে যে, গণি মিয়ার পিঠে মেরুদণ্ড নেই। কালকেতু ওটা ভেঙে দিয়েছে। ঐ মেরুদণ্ডের জন্য ওকে আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। ও প্রুফ দেখায়

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মনোযোগী হয়। তখন হামিদুর রহমান ডেকে পাঠায় ওকে। ওর মুখটা তেতো হয়ে যায়। ওর লিভার কি ঠিকমতো কাজ করছে না? করিডোরটুকু পেরুতে গিয়ে ওর মনে হয় মগজে চিড় ধরেছে। সেই ফাটা পথ দিয়ে নোংরা জল ঢুকে যাচ্ছে মগজে। হামিদুর রহমানের মুখোমুখি হতে ওর খুব খারাপ লাগছে। দরজা খুলে ঢুকতেই হামিদুর রহমান প্রসন্ন হাসি হাসে।

এই যে আসুন, বসুন মজিদ সাহেব।

মজিদ নিঃশব্দে চেয়ার টেনে বসে। এয়ারকুলার চলছে। ঠাণ্ডা ঘর। হামিদুর রহমান খসখস করে কী যেন লিখছে। সাদা কাগজের ওপর সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষর ফুটে ওঠে। একটু পর মজিদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে মজিদ সাহেব। কাজটা করার জন্য আপনার হেলপ দরকার। আপনার লেখার হাত ভালো। মজিদ কথা না বলে নীরবে তাকিয়েই তাকে। দেখতে পায় লোকটার মুখ চকচক করছে। এটা এক ধরনের চিকনাই। মানুষকে তেল দেওয়ার সময় এই চিকনাই ত্বক চুইয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। হঠাৎ হামিদুর রহমান কথা থামিয়ে বলে, আপনি তো জানতে চাইলেন না যে কাজটা কী?

মজিদ ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমি শোনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

হামিদুর রহমান মজিদের ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করে বলে, আমি ভাবছি কালকেতু যে উৎসব করছে তাতে আমাদেরও অংশগ্রহণ করা উচিত। এমন একটা শুভ কাজে আমরা পিছিয়ে থাকব কেন? তাই ঠিক করেছি যে কালকেতুর পুত্র-লাভের সংবাদকে উপলক্ষ করে আমরা একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করব।

ক্রোড়পত্র? মজিদের দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। নগরের পত্রপত্রিকাগুলো তো ক্রোড়পত্র বের করে সয়লাব করে ফেলেছে। আমরা আবার কেন?

আহ্ মজিদ সাহেব, আপনি সময় বুঝে চলতে পারেন না। হাওয়া যেদিকে সেদিকে চলতে হয়।

কিন্তু ক্রোড়পত্র আমরা করব কেন? আমাদের প্রতিষ্ঠান তো একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

কালকেতু যে প্রতিষ্ঠানের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে থাকিয়েছে সে প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি হয়েছে। আমি চাই আমাদের প্রতিষ্ঠানেরও তেমন উন্নতি হোক।

উন্নতির নাম যদি মেরুদণ্ড বাঁকানো হয় তা হলে তেমন উন্নতি আমি চাই না। আমি দুঃখিত।

ক্রোড়পত্র বের হবে এবং ক্রোড়পত্রের লেখাগুলো আপনাকেই লিখতে হবে। আমার অর্ডার।

হামিদুর রহমানের কণ্ঠে তীব্র ঝাঁজ। দৃষ্টিতে আগুন ছোটে। মজিদ ঠাণ্ডা মাথায় অনড় হয়ে বসে থাকে। ওর চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই।

আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?

পেরেছি। তবে আমি ভাবছি এটা তো গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ভাবছি ক্রোড়পত্র লিখতে হলে গবেষণা করে তো বের করতে হবে যে সন্তানটি কার। ক্রোড়পত্রে তো আর মিথ্যা কথা লেখা যাবে না।

https://boierhut.com/fb

কী বললেন?

হামিদুর রহমান চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়ায়।

আপনার এতবড় সাহস!

আমি যা বলেছি তা আপনিও জানেন। আপনি বলতে পারেন না, আমি পারি।

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি। আমি দেখে নেব আপনাকে।

রাগে, উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে হামিদুর রহমান। মজিদ নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। হামিদুর রহমানকে বেশ একটা জুতসই জবাব দিতে পেরেছে দেখে ভালোই লাগে। বুঝতে পারে ওর ভেতরে আযমউদ্দীনের যোশ। এখন ওর পিঠের চামড়া ঘামাচিতে ভরা, ঘাম বেরুচ্ছে দরদর করে, মরা চামড়া খাবড়া-খাবড়া হয়ে আছে কিন্তু সবকিছুর অন্তরালে একটি শক্ত মেরুদণ্ড আছে। মজিদ মেরুদণ্ড সোজা করে চেয়ারে বসে থাকে। অপেক্ষা করে কখন খোদ বড়কর্তার ডাক আসবে। কিন্তু না—ছুটির আগ পর্যন্ত কোনো ডাক আসে না।

ও বেশ দ্রুত পায়ে ফুটপাত ধরে হাঁটে। মন্টিকে কথা দিয়েছে ওকে নিয়ে আজ বেড়াতে বেরুবে। রঞ্জনার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার পর মন্টি কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। রাতের বেলা আর বাবার গলা জড়িয়ে ধরে না কিংবা ভোরবেলা বুকের ওপর ওঠে আসে না। গতকাল ও বাবার জন্য বেশ রাত পর্যন্ত জেগেছিল। খায়নি পর্যন্ত। শিশুরা কি দেবদূত? বুঝতে পারে সবকিছু? বলেছি, বাবা আমি তোমাকে দেখতে পাই না কেন? বাবা কাল তুমি আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে কিন্তু। না নিয়ে গেলে আমি ভীষণ রাগ করব। ভাত খাব না। আর কি করব জানো? মজিদ জিজ্ঞেস করেছিল, কী? ও তখন হেসে বলেছিল এরপর থেকে তোমাকে আমি আর বাবা ডাকব না। তা হলে কী ডাকবে? মজিদ মেয়েকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। মন্টি মাথা উঁচিয়ে বলে, আমি তোমাকে ভালুক ডাকব। কী বললে! চমকে ওঠে মজিদ। মন্টি হাসতেই থাকে। ওর তখন প্রবল অনুশোচনা হয়। নিজের মেয়ের কাছে ভালুক হয়ে যাচ্ছে? ও তখন একটা রিকশা নেয়। ভাবতে থাকে সন্তানের কাছে ভালুক হওয়া কোনো পিতারই কাম্য নয়। মন্টি যা চাইবে ও আজ তাই করবে। রিকশা থেকে নামতেই দেখতে পায় বৈঠকখানার দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে কাজের মেয়েটি মন্টিকে নিয়ে খেলছে। মন্টি ওকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা?

চল মামণি আজ তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব।

না বাবা, আমি যাব না।

মা, আঙ্কলের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। আমাকে নেয়নি।

আঙ্কেল?

মজিদ অস্পষ্ট উচ্চারণ করে।

খালু, খালাআম্মা এই চিঠিটা আপনারে দিতে কইছে।

https://boierhut.com/fb

মজিদ চিঠি নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। রঞ্জনার চিঠি। রঞ্জনা ওকে চিঠি লিখবে কেন? মজিদের বুকের ভেতর কেঁপে যায়।

খালাআম্মা কি আর আইব না খালু?

মজিদ কাজের মেয়েটির কথায় চমকে ওঠে। এই মেয়েটি কি সব বুঝতে পেরেছে? তবুও ওর দিকে তাকিয়ে বোকার মতো জিজ্ঞেস করে, তোকে কি কিছু বলেছে?

না। খালাআম্মা সব কাপড়চোপড় লইয়া গেছে।

ও।

মজিদ চিঠি হাতে শোবার ঘরে আসে। চিঠিটা খোলা। কোনো সম্বোধন নেই। লিখেছে, 'আমি রমানির সঙ্গে চলে যাচ্ছি। এখানে আর ফিরব না। রমানি আমাকে বিয়ে করবে।' মাত্র তিনটি বাক্য। নিচে মজিদের নাম লেখা। মাত্র তিনটি বাক্য লিখে মজিদের পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলে গেল রঞ্জনা। রমানি তো মজিদের বন্ধু। রঞ্জনার সঙ্গে বয়সের অনেক তফাত। তবে রমানিকে পছন্দ করল কেন ও? রমানির টাকা আছে তাই? মজিদ স্টিল আলমারির ড্রয়ারে চিঠিটা রাখে। নিজেকে প্রশ্ন করে, তোমার কি কান্না পাচ্ছে মজিদ? না। তোমার কি খারাপ লাগছে? হ্যাঁ। তুমি কি মন্টিকে নিয়ে বেড়াতে যাবে? জানি না। তুমি, মন্টির বাবা কি একটা ভালুক? হ্যাঁ, আমি ভালুক, ভালুক, ভালুক। মজিদ বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। বালিশে রঞ্জনার চুলের গন্ধ। কী তেলমাখত ও? জবাকুসুম। ও পাগলের মতো বালিশে মুখ ঘষে। মনে হয় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, মগজ ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ, করোটিতে দাবদাহ—ও আর নিজের মধ্যে নিজে স্থির থাকতে পারছে না।

সাতদিন একদম নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে। অফিসে যায় না, কোনো কাজ করে না। চুপচাপ শুয়ে থাকে। মন্টিকে নিয়ে রাস্তার ধারে যায়। মন্টির অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ওকে গাড়ি দেখাতে হয়, পাখি দেখাতে হয়। কিন্তু মন্টির একটি প্রশ্নের উত্তরে কখনো মিথ্যা বলে না।

মা আসে না কেন বাবা? মা কি আসবে না?

না, আসবে না।

মন্টি বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। তারপর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়। এই একটি প্রশ্নে মজিদের মাথা গরম হয়ে ওঠে। ও তখন মন্টিকে শিশু ভাবতে পারে না। নানাভাবে ঘুরিয়েও তো মন্টির প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু ও তা করে না। ও তখন মন্টিকে রঞ্জনার সমকক্ষ ভাবে। যে ভাবনায় একজন শিশুর অস্তিত্ব মুছে গিয়ে জেগে ওঠে প্রতিপক্ষ। এভাবেই মজিদের সাতদিন পেরিয়ে যায়। পরদিন অফিসে গেলে হামিদুর রহমানের চিঠি পায়। হামিদুর রহমান সেদিনের আচরণের জন্য ওর কৈফিয়ত তলব করেছে। মজিদ চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।

https://boierhut.com/fb

দুপুর নাগাদ শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সবাই রাস্তায় নেমে এসেছে। ওরা একজন লোক দেখেছে। লোকটি বুকে পিঠে আলকাতরা দিয়ে লিখেছে, 'স্বৈরাচারী কালকেতু নিপাত যাও'— লোকটি নগরের পথে দৌড়ে যাচ্ছে। নগরের প্রতিটি সড়ক ও প্রদক্ষিণ করছে। কেউ ওকে চিনতে পারছে না। ও যেদিকে ছুটছে সেদিকেই মানুষের দৃষ্টি। বড় বড় হরফে লেখা বিশাল হয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মানুষের হৃদয়। নগরে তোলপাড়। পথে হাজার হাজার মানুষের জটলা। সকলেরই প্রশ্ন, কে ও?

বসুনিয়া?

তাজুল?

ভবানি?

না, কেশব?

অসম্ভব, আমার মনে হয় রামনিধি?

কিছুতেই না ও আমাদের সুমুদ্র। ছোটবেলায় গাছ থেকে পড়ে ওর কপাল ফেটে গিয়েছিল। আমি ওর কপালে কাটা দাগ দেখেছি।

হতেই পারে না। ও কুদ্দুস। না খেতে পেয়ে ওর বুক পিঠ এক হয়ে গিয়েছিল। ও কুদ্দুসই। আমি ওকে চিনতে ভুল করিনি।

বাজে বকবেন না। ও মোহন। ও আমাদের পাড়ার ছেলে। ওকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি।

মানুষের এইসব কথাবার্তা মজিদ মন দিয়ে শোনে। মুহূর্তের জন্য কেউ কেউ লোকটিকে দেখেছে। কেউ দেখেনি। তবু মানুষের জল্পনার শেষ নেই। ওর ইচ্ছে করে রাস্তার সব গাড়ি থামিয়ে দিতে। ইচ্ছে করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে একা। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে সেই স্লোগান, 'স্বৈরাচারী কালকেতু নিপাত যাও।' মজিদের এইসব কথা আর ভালোলাগে না। ও লোকটিকে দেখার আশায় ফুটপাতের বিশাল একটি গাছের নিচে একা এসে দাঁড়ায়। পাশ দিয়ে চলে যায় মানুষ। ওদের কণ্ঠ ভেসে আসে আবার।

মনে হয় ও আমাদের চুন্নু। বড় ভালো ছেলে ছিল। চমৎকার বক্তৃতা করত। ওর বক্তৃতা শোনার জন্য দেয়াল টপকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে বেরিয়ে আসতে ছেলেরা।

না না, ও দেলোয়ার। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বড় বড় চোখ।

ধুত, কি যে বলেন ও সেলিম!

আমার তো মনে হয় জাহেদ। খুব সাহসী ছেলে।

একদল মানুষ কথা বলতে বলতে চলে যায়। আর একদল আসে। তাদেরও এমন কল্পনা। মজিদের হঠাৎ মনে হয় তা হলে কি কেউ বিচ্ছিন্ন নয়। এই নগরের সবাই বুকে-পিঠে আলকাতরার লিখন লিখে ছুটে যাচ্ছে। সেজন্যই এমন মনে হচ্ছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের চেনা। এমন যুক্তিসঙ্গত

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সিদ্ধান্তে আসতেই মজিদের বুক আনন্দে-গর্বে ফুলে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ভবানির কাছে ছুটে যাই। ওকে বলি দেখ সবাই নেমে এসেছে।

তখন ওর পাশে এসে একটি রিকশা দাঁড়ায়। মজিদ তাকিয়ে দেখে আযমউদ্দীন।

স্যার যাবেন?

কোথায় যাব?

মজিদ আযমউদ্দীনকে প্রশ্ন করে হেসে ফেলে।

দেখলাম আপনি দাঁড়িয়ে আছেন—

আমি তো ঐ দৌড়ে যাওয়া লোকটিকে দেখব বলে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি দেখেছ তাকে আযমউদ্দীন?

দেখিনি আবার? ও তো আমাদের নূর হোসেন। একই পাড়ার ছেলে। আমি জানি একমাত্র নূর হোসেনই এমন সাহস করতে পারে। ওর কলজে সমুদ্রের মতো বড়। ওখানে হাজার হাজার ঢেউ গর্জন করে।

যাক, তোমার কথা শুনে আমি একটা উত্তর পেয়ে গেছি।

কী উত্তর?

বুঝেছি তোমার নূর হোসেন একলা নয়। এই নগরে লক্ষ লক্ষ নূর হোসেন জন্মেছে। তুমি যাও আযমউদ্দীন। আমি এখন ঘরে ফিরব না।

আযমউদ্দীন একটা গান গাইতে গাইতে রিকশা নিয়ে চলে যায়। মজিদ নির্নিমেষ আকাশ দেখে—বাতাসে গাছের পাতার শনশন শব্দ শোনে। ওর কেবলই মনে হয় ওর এখন এই রাজপথ ধরে কোথাও চলে যাবার সময়। ও আর পিছন ফিরে তাকাবে না—যেমন তাকায়নি এই নগর পত্তনের সময়। এখন কি ঘরে ফিরবে ও? এক শূন্য ঘর? গতকাল মন্টিকে এক দূরসম্পর্কের বোনের কাছে দিয়ে এসেছে। ওর জন্য মাসে দুহাজার টাকা দেবে ওকে। মন্টি খুব কেঁদেছিল। কিন্তু উপায় কী? বোনটিরও একটি মাত্র মেয়ে। হয়তো ও এখানে ভালোই থাকবে। খেলার সঙ্গী পাবে—ফুফুর কাছে আদরযত্ন পাবে। কিছুদিন পর বাবার অভাব, মায়ের অভাব ভুলে যাবে। ভুলে ওকে যেতেই হবে। এটাই নিয়ম। মস্তিষ্কের এই ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটি আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে। নইলে তো স্মৃতির ভারে মানুষ পাগল হয়ে যেত। ওর হঠাৎ মনে হয় মন্টি ভুলে যাক ওর বাবা-মায়ের অস্তিত্ব। এই পৃথিবীতে ও একজন মানবী হয়ে বেড়ে উঠুক। নিজেও মন্টির জন্য আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করার পরও ওর সেই অলৌকিক মানুষটিকে আর দেখা হয় না। ও অনেক রাতে ঘরে ফিরে আসে। জানে টেবিলে খাবার সাজানো থাকবে না। তাই পাড়ার ছোট্ট হোটেলে ব্যবস্থা করেছে। খাওয়াটা ওখানেই সেরে আসে। ঘরে ফিরে গায়ের জামাটা খুলে ছুড়ে দেয় বিছানার ওপর। বৈঠকখানার দরজা খুলে রাখে। ভাবে, ঐ মানুষটি কি ওর এই গলি

https://boierhut.com/fb

দিয়ে দৌড়ে যাবে না একবার? মোড়া নিয়ে দরজার কাছে বসে। বড় গোল চাঁদ দরজা বরাবর জ্বলে আছে। ঐ চাঁদ দেখে ওর সব ক্লান্তি মুছে যায়। ও ডায়েরি নিয়ে লিখতে বসে। অনেক অনেকদিন পর মাথার মধ্যে কবিতার কটি লাইন আনাগোনা করছে। পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে দেখে আজ ওর ডায়েরির শেষ পাতা। বাকি পৃষ্ঠাগুলো কবে যে ভরিয়ে ফেলেছি টেরই পাইনি। কোনো পৃষ্ঠায় একটাও কবিতা নেই। আজ এই শেষ পৃষ্ঠায় ও কবিতাই লিখবে। কলমদানি থেকে সবুজ কালির কলমটা উঠে নেয়। অক্ষরগুলো কেমন আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। তবু লিখতে থাকে :

দরোজায় থাকবে আঁকা কারুকার্যকময়
তোমার নিজেরই নাম, লুকনো হৃদয়
পারবে তো চিনে নিতে পথ?
কালের যাত্রার ধ্বনি যায় শোনা যায়।—
একবার থামাবে না রথ?

এইটুকু লিখে ওর ভালোই লাগে। ওর সামনে এখন এক নতুন দরজা। ওকে ঢুকতেই হবে সেই পথে। কবিতার নিচে দিয়ে লাইন টেনে পৃষ্ঠার একদম শেষে লিখে রাখে কয়েকটি লাইন : কালকেতু ব্যাধ ও শিকারি। ও অস্ত্র দিয়ে রাজ্যশাসন করে। আমরা চাই আমাদের মধ্য থেকে কেউ নগরের অধিপতি হোক। আমরা অস্ত্রের শাসন চাই না।

লেখা শেষ করে ওর ডায়েরি বন্ধ করে চুমু খায়। তারপর টেবিলের ড্রয়ারে ডায়েরিটা ঢুকিয়ে রাখে। ঘুমোতে যাবার আগে ও মনে মনে প্রার্থনা করে সেই অলৌকিক মানুষটির জন্য।

পরদিন নগরের দেয়ালে কালো কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়ে যায় ঐ একটি বাক্য : 'স্বৈরাচারী কালকেতু নিপাত যাক।' কোথাও একটি দেয়ালও ফাঁকা নেই। কারা রাত জেগে এমন করে লিখল? কাদের এত শক্তি। মজিদ অফিস করতে পারে না। ভবানিকে খুঁজতে যায়। ভবানি নেই ওর আস্তানায়। মনু মাঝিকে খুঁজতে যায়। মনু মাঝি নেই ওর আস্তানায়। কোথায় গেল সব? একে একে ও খোঁজে পরিচিত সবাইকে। কেউ ঘরে নেই। সবাই যুদ্ধে গেছে। নগরে সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে দেয়ালে লিখন পড়ছে। পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছে ওরা। প্রতিটি মানুষের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে, স্বৈরাচারী কালকেতু নিপাত যাও। এমনকি শিশুদের মুখে, গৃহবধূদের মুখেও এই কথা। মজিদ নিজেও নতুন দরজার পথে পা বাড়ায়।

এদিকে প্রাসাদে অনেক রাত পর্যন্ত পায়চারি করে কালকেতু। দুপুরে পরিষদ সদস্যদের নিয়ে সভা করেছে। বলেছে, আমার নগরীতে আমার বিরুদ্ধে কথা বলার কাদের এই সাহস হয়েছে? ওদেরকে পিঁপড়ের মতো পায়ের নিচে পিষে ফেলে মারতে হবে।

পরিষদ সদস্যরা সবাই একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছে। হ্যাঁ পিষে মারতে হবে। এই নগরীতে কেউ ঔদ্ধত্য নিয়ে বাঁচতে পারবে না। সবার দৃষ্টি থাকবে পায়ের দিকে। চড়া গলায় ভাঁড়ু

https://boierhut.com/fb

দত্ত এই কথা জানিয়ে দেয়। তীরন্দাজ বাহিনী প্রধানের সঙ্গে কথা হয়েছে কালকেতুর। ও বলেছে, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমরা প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেব নগরীতে।

এতকিছুর পরও এই গভীর রাতে কালকেতুর বুকের ভেতর কেমন করে। অস্থিরতা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ও বিছানায় থাকতে পারে না; পায়চারি করতে গেলে পা শ্লথ হয়ে আসে। চেয়ার টেনে বসলে মনে হয় গদিতে অসংখ্য কাঁটা। ও রেলিঙের ওপর শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে সহজ হতে চায়। ও বুক ভরে শ্বাস টেনে নিজেকে বলে, এই নগরের বাতাসের ওপর আমারই একচ্ছত্র অধিকার। এখন আর আগের জীবনের কথা ভাবতে চাই না। মানুষের এক জীবনের যা কিছু পাওয়ার আমার তা পূরণ হয়েছে। আমি এখন আর স্বর্গের নীলাম্বর নই। ব্যাধ ধর্মকেতুর ছেলেও নই। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজে নিজেই উত্থিত হয়েছি। আমার ভূত-ভবিষ্যৎ নেই। আমার বর্তমানই সব। প্রতিটি মুহূর্ত আমার নতুন জন্ম। যতদিন শ্বাস বইবে ততদিন ক্ষমতায় থাকব। আমার মতো এই নগরের জনগণের কথা আর কে বলবে? অকৃতজ্ঞ নগরবাসী! কালকেতুর দাঁত কিড়মিড় করে।

তখন ফুল্লরা এসে দাঁড়াল ওর কাছে। এতক্ষণ ও ভেবেছে, একসময় কেমন উদ্দাম অবাধ জীবন ছিল ওর। মাংসের চুবড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি মাংস ফেরি করত। এখন এই বন্দিজীবন। এখানে সুখ নেই, স্বস্তি নেই, কিন্তু মোহ আছে। জৌলুস আছে। যেটুকু দীর্ঘশ্বাস এটুকু গোপন করতে হয়। এই গোপনতাটুকুও এক ধরনের ভালোলাগা। বারবার চন্দরের কথা মনে হয় ফুল্লরার। ক্ষমতার দাপটে ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে বিষ নিজে হাতে চন্দরকে দিয়েছে সে বিষের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় এখন ওর নিজের হৃৎপিণ্ডের পচন ধরেছে। ও জ্বলে যাচ্ছে।

কালকেতু ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, উঠে এলে যে?

ঘুম আসছে না।

আমারও না।

আমাদের কি ঘুমের দিন শেষ হয়ে এল?

কখ্খনো না। এসব আমি সহ্য করব না।

কতদিন এভাবে চালাবে?

যতদিন আমার প্রাণ আছে।

অনেকদিন তো হলো। চল এবার আমরা এসব ছেড়ে দিয়ে কোনো নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বাস করি। সময়টা কেবল আমাদের দুজনের থাকবে।

না, তা হয় না। এই নগর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমরা তো প্রচুর অর্থ সম্পদ জমিয়েছি। ঐ দিয়ে আমাদের তিন পুরুষ কেটে যাবে। আমি এখন নিজের মতো সময় কাটাতে চাই।

কালকেতু চেঁচিয়ে উঠে, বলেছ তো হবে না। তোমার ইচ্ছে না থাকলে তুমি নিজের মতো পথ দেখতে পার।

এতবড় কথা তুমি বলতে পারলে?

ক্ষমতার কাছে আমার আর সবকিছু তুচ্ছ।

ওহ কালকেতু তুমি একবার স্মরণ করো আমাদের যৌবনের দিনগুলোর কথা।

আমি স্মরণ করতে চাই না।

জানি, কেন চাও না? তখন আমাদের জীবনে ভালোবাসা ছিল। আমাদের প্রেমময় সময় ছিল। এখন আমাদের জীবনে ভালোবাসা নেই। আমরা প্রেমহীন সময় কাটাচ্ছি।

আমি তো এই সময়ে ভালোই আছি। আমার কোনো দুঃখ নেই। তোমারও দুঃখ থাকা উচিত নয়। কারণ তোমাকে আমি প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছি। তুমি সম্রাজ্ঞীর মতো জীবনযাপন করছ।

তা হলে ক্ষমতাই তোমার কাছে সব?

হা-হা করে হেসে ওঠে কালকেতু। বলে, এতদিনেও বুঝতে পারনি। পারিনি তা নয়। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম।

তখন তীব্রস্বরে কেঁদে ওঠে শিশুটি। দুজনে প্রবলভাবে চমকে উঠে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। একটু পর ওদের ভুল ভাঙে। বুঝতে পারে বাচ্চা কাঁদছে। কালকেতু ভাঙা কণ্ঠে বলে, কান্নার শব্দটা কেমন বিদঘুটে ছিল। আমি ভেবেছিলাম আমাদের এই প্রসাদ বুঝি ধসে গেল।

ফুল্লরা কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলে, আমারও তাই মনে হয়েছিল। তারপর দ্রুত পায়ে গিয়ে বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়। কালকেতু নিজের ঘরে চলে যায়। ওর অস্থিরতা কমে না এবং এজন্য ও ক্রমাগত নিজের ওপর বিরক্ত হতে থাকে। সে রাতে ও আর ঘুমোতেই পারে না। ফুল্লরাও ছেলে কোলে নিয়ে বসেই থাকে। ছেলেটি একটু পরপর কেঁদে ওঠে।

পরদিন দেখা গেল কালকেতুর স্বর্ণমূর্তির মুখে কে বা কারা আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। মূর্তির গায়ে লেখা আছে একটি অশ্লীল শব্দ।

এই দিন হামিদুর রহমান বারবার মজিদের খোঁজ করল। মজিদ অফিসে আসেনি। টেবিলে ওপর টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে কারণ দর্শানোর নোটিশ। বশীর দেখতে পেয়ে কাগজের টুকরোগুলো সরিয়ে রাখে। দুপুরের পর হামিদুর রহমান মজিদের বাসায় পিয়ন পাঠাল ওকে ডেকে আনার জন্য। পিয়ন এসে খবর দিল যে বাসায় তালা। বাড়িতে কেউ নেই। উত্তেজিত হামিদুর রহমান অতিকষ্টে নিজের ক্রোধ সংবরণ করল। ভাবল সময়টা খারাপ। এখন চুপ থাকাই ভালো। সময় ভালো হলে মজিদের ঘাড়টা ও নিজ হাতে মটকে দেবে।

https://boierhut.com/fb

পরদিন দেখা গেল স্বর্ণমূর্তির বাড়িয়ে রাখা ডান হাতটি ভাঙা। না, ওরা কেউ সোনা চোর নয়। কারণ ভাঙা টুকরোটি মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে আছে।

কালকেতুর সভাকক্ষে সভা বসল। ভাঁড়ু দত্ত চেঁচিয়ে বলল, আর তো সহ্য করা যায় না। এর একটা বিহিত করতে হবে।

কালকেতু গম্ভীর। দপদপ করছে চোখ। ক্রোধ ওর চেহারাকে বীভৎস করে দিয়েছে। পরিষদ সদস্যদের মধ্যে যারা একটু নরম স্বভাবের লোক তারা কালকেতুর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। চোখ নামিয়ে ফেলে। যদিও নিজের মতো করে পাত্রমিত্র তৈরি করেছে, তবুও কোথাও একটা ফাঁক আছে। সবাই হুবহু কালকেতুর মতো হতে পারে না। তবে ওরা ওর গোত্রেরই লোক। কালকেতু এক একটা হুঙ্কার দিলে ওদের পিলে চমকে ওঠে। কেবল ভাঁড়ু দত্ত মাথা নাড়ে। যে হাতে ও স্ত্রী খুন করেছে সে হাত জোড়া বারবারই ঊর্ধ্বে ওঠে। শেষে সিদ্ধান্ত হয় নগরের সর্বত্র তীরন্দাজ বাহিনী টহল দেবে। যারাই কিছু করবে তাদের বুক ফুটো করে দেবে বিষাক্ত তীর।

এত টহলের পরও দেখা গেল কালকেতুর স্বর্ণমূর্তির মাথা মাটিতে গড়াচ্ছে। আগের দিনের মাখানো আলকাতরা পরিষ্কার করা হয়েছিল। সেই আলকাতরা আবার পুরো মূর্তির গায়ে মাখানো হয়েছে। তীরন্দাজ বাহিনী বুঝতেই পারল না কীভাবে এটা হলো। সবাই বিমূঢ়, বিস্মিত। যারা মূর্তির পাহারায় ছিল তাদের ব্যর্থতার জন্য কালকেতুর নির্দেশে ফাঁসি হয়ে গেল। সবাই সন্ত্রস্ত, চারদিকে থমথমে ভাব। তীরন্দাজ বাহিনীর তরুণ সদস্যরা কালকেতুর এই আদেশে বিক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছু বলার সাহস পেল না। পনেরজন সহযোগীর লাশের সামনে ওরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

গতরাতে সামান্য ঘুম হলেও আজ আবার নির্ঘুম রাত কাটাতে হয় কালকেতুর। আজো রেলিঙে ভর করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ফুল্লরা কাছে এসে দাঁড়ায়। এইসব ঘটনায় ও পুরোপুরি বিপর্যস্ত। চোখে জল। চোখে জল দেখলে কালকেতু রেগে যায়। তুমি এমন করলে আমি কী করব বলো তো? দোহাই লাগে তোমার, তুমি আমার পথে বাধা তৈরি করবে না।

আমাদের এত সম্পদ নিয়ে আমরা নগরীর নেংটি পরা মানুষের হাতে মরব কেন?

মরব? আমি কিছুতেই মরব না।

কালকেতুর কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

তুমি এত রাতে আমার সঙ্গে এ বাজে কথাগুলো বলছ কেন ফুল্লু বউ?

আমরা একটি ছেলে পেয়েছি। আমি চাই ওকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাততে।

মেয়েমানুষের কেবল সংসারের চিন্তা। তুমি ঘুমোতে যাও ফুল্লু বউ।

কালকেতু রুষ্ট কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে।

ঘুম আসে না। এই নগরে আমার আর ঘুম আসবে না। ফুল্লরাও ঝাঁজাল কণ্ঠে বলে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আজো আবার তীব্রস্বরে কেঁদে ওঠে ছেলে। শব্দের আকস্মিকতায় দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে। কালকেতু ভাঙা কণ্ঠে বলে, আমার মনে হলো শত শত শকুন আর্তনাদ করে উঠল। ফুল্লরা কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল, আমারও তাই মনে হলো। তারপরও ও শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য ছুটে যায়।

কালকেতু পিছু পিছু আসে। শিশুটির কান্না থামে না। ফুল্লরা নানাভাবে ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে। কালকেতু একসময় ওকে ফুল্লরার কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়। বলে, আছাড় মেরে ওর কান্না আমি থামিয়ে দেব।

আহ্ কী করছ? কী করছ?

ফুল্লরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কালকেতুর ওপর।

ওকে আমার কাছে দাও। দাও বলছি।

ফুল্লরা আবার কেড়ে নেয় ওকে।

ধস্তাধস্তিতে শিশুটির কান্না থেকে যায়। ও চোখ বড় করে চারদিকে তাকায়। কালকেতু কণ্ঠে বিষ ছড়িয়ে বলে, ও কে? ও কার সন্তান?

ভাঁড়ু দত্ত ছাড়া এ তথ্য আর কেউ জানেন না।

ও কি ঐসব নেংটিপরা মানুষদের কেউ?

ফুল্লরা হতাশ কণ্ঠে বলে, আমরা তা জানি না। কারণ আমরা ভাঁড়ু দত্তকে খুব বিশ্বাস করি। ভাঁড়ু দত্ত আমাদের ঠকাবে না। ও কোনো ভালো বংশের ছেলে। তা হলে কি ও জারজ সন্তান? আমাদেরকে ভয় দেখায় কেন?

ওহ মিনসে তোমার মুখ সামলাও। নগরে সবাই জানে ও আমাদের সন্তান। এই নিয়ে আর একটি কথাও বলবে না তুমি।

তাই তো, এ নিয়ে তো কথা বলা উচিত নয়।

কালকেতু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ফুল্লরা হেঁটে হেঁটে গান গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায়। একসময় গান থামিয়ে বিড়বিড়িয়ে বলে, মিনসের মাথার গোলমাল হতে শুরু করেছে।

কাছাকাছি থানার ঘণ্টাটা ঢং ঢং করে বেজে উঠলে কালকেতু ছুটে আবার ঘরে আসে।

মনে হলো কাছাকাছি কিছু বুঝি ধসে গেল।

ফুল্লরা হি-হি করে হেসে ওঠে, ভূতে পেয়েছে তোমাকে। এসো এ ঘরে আমরা একসঙ্গে ঘুমোই।

সেই ভালো।

কালকেতু অনুগত দাসের মতো বিছানায় উঠে আসে। ফুল্লরা শিশুটিকে ওর বিছানায় দিয়ে ঘরে নীল বাতি জ্বালিয়ে দেয়। কালকেতু সঙ্গে সঙ্গে বলে, আহ্ কী স্নিগ্ধ আলো!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফুল্লরা বিছানায় এলে ও ফুল্লরাকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বলে, ঘণ্টাধ্বনি, নীল আলো, শিশুর কান্না সবই তো একই আছে, তবু আমার এমন লাগে কেন বলো তো? কেন সবকিছু এলামেলো হয়ে যাচ্ছে?

চুলোয় যাক সবকিছু। এখন এই সময়টা শুধু তোমার আমার। কোথাও কেউ নেই। কোনো মানুষ বুকে-পিঠে আলকাতরার লিখন লিখে দৌড়ে যায় না। মিনসে এখন তুমি আর আমি কেবল বাঁশি বাজাব। কেবল তোমার আর আমার বাঁশি। মিনসে—

ফুল্লরা আর কথা বলতে পারে না। কালকেতুর মোহন বাঁশি ওকে গ্রাস করে। ও তলিয়ে যায় বিশাল বাঁশির সুরের গভীরে।

তখন নগরের চত্বরে জমা হতে শুরু করে মানুষ। আসতেই থাকে চারদিক থেকে। কোথা থেকে, কেমন করে, কোন পথে আসছে কেউ বুঝতে পারছে না, কিন্তু প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছে মানুষ আসছে। একসময় কালো কালো মাথাগুলোকে ঢেউয়ের মতো মনে হয়। সত্তরের জলোচ্ছ্বাসে যেমন দশ থেকে বারো ফুট উঁচু হয়ে ছুটে এসেছিল কালো ভয়াবহ জলরাশি, এখন তেমন অবস্থা। সমুদ্র ফুঁসছে। কালকেতুর মূর্তিটা টুকরো টুকরো হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে। কেউ বলের মতো ছুড়ে মারে এর টুকরোগুলো। চত্বরের উঁচু জায়গা থেকে বক্তৃতা করে কেউ, গভীর ভরাট কণ্ঠ। যখন শব্দ উচ্চারণ করে সে শব্দ সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের জলরাশির মতোই গমগম করে। মানুষ কান পেতে শোনে। ফুলেফেঁপে ওঠে জনতার সমুদ্র। কালকেতুর অপরাধের কথা বলে যাচ্ছে বক্তা।

ভাইসব, আপনারা জানেন ক্ষমতাদর্পী স্বৈরাচারী এই দম্পতি এই নগরে ব্যক্তিপূজার নজির স্থাপন করেন। তাঁরা মনে করতেন এই নগর তাদের পৈতৃক সম্পত্তি। যা খুশি, যেভাবে খুশি ইচ্ছেমাফিক একে ব্যবহার করা যায়। জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম ছিল না। একতরফা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে স্বৈরাচারী কালকেতু পঁচিশ বছর আমাদের শাসন করেছে।

তখন কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনীর এক ঝাঁক তীর ছুটে আসে বক্তার দিকে। বিদীর্ণ হয়ে যায় বক্তার বুক। ও লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তখন আর একজন লাফিয়ে উঠে দখল করে তার শূন্যস্থান।

ভাইসব, এভাবেই কালকেতু প্রতিনিয়ত হত্যা করেছে আমাদের। ওর গোপন বাহিনী ছিনিয়ে নিয়েছে ষাট লাখ মানুষের জীবন। আমরা শীতে কষ্ট পেয়েছি, গ্রীষ্মে কষ্ট পেয়েছি। বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত হয়েছি। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছি। আমাদের লাশের ওপর দিয়ে বসে গেছে কালকেতুর আনন্দ স্রোত। আমাদের লাশের বিনিময়ে বিদেশ থেকে অর্জিত সম্পদ কুক্ষিগত করেছে ফুল্লরার লোভী হাত।

আবার ছুটে আসে তীরন্দাজ বাহিনীর এক ঝাঁক তীর। লুটিয়ে পড়ে বক্তা। শূন্যস্থানে দাঁড়িয়ে যায় আর একজন বক্তা। ওর সফেদ পাঞ্জাবি বাতাসে ওড়ে। এক মাথা সাদা চুল লুটিয়ে আছে কপালের ওপর ।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাইসব, কালকেতু আমাদের ওপর ব্যয় সংকোচ নীতি চাপিয়ে দিলেও নিজের জীবনে কখনো বিলাস ত্যাগ করেনি। তার বিশাল প্রাসাদটি বড় উদারহণ। আরো রয়েছে পার্বত্য ও সমুদ্র তীরবর্তী বিলাসবহুল অবসর বিনোদনকেন্দ্র। তিনি কোনো বিরোধিতা সহ্য করতেন না। যে কেউ বিরোধিতা করলে তিনি তার সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের মতো ব্যবহার করেছেন।

আবার ছুটে আসে তীরন্দাজ বাহিনীর এক ঝাঁক তীর। বক্তা লুটিয়ে পড়ে যায়। তার জায়গা দখল করে একজন মেধাবী তরুণ। গায়ে টকটকে লাল জামা। বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, ঝাঁজাল কণ্ঠ। শব্দগুলো ছুটে আসে বুলেটের মতো।

ভাইসব, এই নগরের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন ফুল্লরা। মাদকদ্রব্যের অবাধ ব্যবহারে ধ্বংস করেছেন এই নগরের তরুণ সম্প্রদায়কে। ভেবেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্মকে নেশায় বুঁদ করে দিতে পারলে পার পেয়ে যাবেন এক যুগ।

তখন তীরন্দাজ বাহিনীর তীর উড়ে যায় যুবকের মাথার ওপর দিয়ে। স্পর্শ করে না ওর শরীর। ও আরো তীব্র ভাষায় বলতে থাকে, কালকেতু ধ্বংস করেছে এই নগরের অর্থনীতি। শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান। অপরদিকে জনগণ ও নগরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড চালানোর মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে কালকেতু।

তীরন্দাজ বাহিনীর তীর এসে বিদ্ধ করে যুবককে। স্তব্ধ হয়ে যায় ওর তেজস্বী কণ্ঠ। ফিনকে দিয়ে ছুটে আসা রক্ত ভিজিয়ে দেয় অন্যদের শরীর। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যায়। একজন মধ্যবয়সী মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাঙা কণ্ঠে অবিরাম বলে যায়। ক্ষীণ স্বাস্থ্য তবু বারবার উত্তোলিত হয় হাত। বলে, কালকেতু বিদেশের ব্যাংকে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। ও এই নগর থেকে পালানোর চেষ্টা করতে পারে। আমাদের উচিত ওকে এখনই গ্রেফতার করা।

চলো, সবাই চলো কালকেতুর প্রাসাদ ঘেরাও করব।

তখনো সূর্যোদয় হয়নি। নগরের মাঝে কেবল আলো ফুটেছে। হাজার হাজার মানুষ কালকেতুর প্রাসাদের দিকে এগুতে থাকে। ঝাঁক ঝাঁক ছুটে আসে তীর। তীরন্দাজ বাহিনী রাস্তায় নেমে এসেছে। হাজার হাজার মানুষের সামনে ওরা আর কয়জন? যত লোক লুটিয়ে পড়ে তার দ্বিগুণ এগিয়ে আসে। ক্লান্ত হয়ে যায় তীরন্দাজ বাহিনী। ধনুকের ছিলা টানতে টানতে ওদের হাত অবশ হয়ে আসে। কারণ তীরন্দাজ বাহিনীর তীরের সামনে রচিত হয়েছে মানবদেয়াল। ঐ দেয়াল ভেদ করার সাধ্য ওদের হয় না।

একসময় ফুরিয়ে যায় সব তীর। ওরা বিধ্বস্ত, বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকে। রাজপথে জনতার ক্রন্দন এবং উল্লাস।

একজন চেঁচিয়ে বলে, ওরা নিরস্ত্র হয়েছে। ওদের রক্তমাখা তীরগুলো পুড়িয়ে ফেলা হোক।

https://boierhut.com/fb

অন্যজন চেঁচিয়ে বলে, না ওগুলো আমরা পোড়াব না। ধনুক এবং তীরগুলো সংগ্রহ করে রেখে দেব জাদুঘরে। কারণ এই নগরে আর তীরন্দাজ বাহিনী থাকবে না। এখন থেকে ওরা আমাদের মতো সাধারণ। শুধু ঐ অস্ত্র দিয়েই তো ওদের সঙ্গে আমাদের বিভেদ ঘটেছে। এই নগরে মানুষে মানুষে আর কোনো বিভেদ থাকবে না।

ঠিক বলেছেন, আর একজন চেঁচিয়ে ওঠে। আজ থেকে তীরন্দাজ বাহিনী বাতিল করা হলো। এ ছোট্ট এই নগরীর জন্য এই ধরনের বাহিনীর দরকার নেই। যে বাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় তা দিয়ে কি করব আমরা?

হ্যাঁ, আমরা চাই না, তীরন্দাজ বাহিনী চাই না।

সহস্র কণ্ঠে স্লোগান ওঠে। কালকেতুর প্রাসাদের সামনে গিয়ে স্লোগান গর্জনে পরিণত হয়। মানুষ প্রাসাদের ভেতর ঢুকতে থাকে, ঢুকতেই থাকে। যারা বাধা দিয়েছিল জনতার চাপে সে বাধা মুহূর্তে উড়ে যায়। মানুষের পদধ্বনি কী কঠিন নির্মম, ভয়াবহ হতে পারে, কালকেতু এবং ফুল্লরা এই প্রথম উপলব্ধি করে। ফুল্লরার কোলে কোনো শিশু নেই। ওকে আয়া নিয়ে গেছে।

ফুল্লরা একবার কালকেতুর মুখের দিকে তাকায়, কিসের শব্দ?

কালকেতু ফ্যাঁসফ্যাঁসে ধরা গলায় বলে, মৃত্যুর।

ফুল্লরা আঁতকে ওঠে, মৃত্যু কেমন? আমরা তো ভাবিনি কোনোদিন আমাদের মৃত্যু হবে।

ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে আমরা আমাদের অভিধান থেকে ঐ শব্দটি উঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখনো আমি ঐ শব্দটি স্বীকার করি না।

তুমি মরতে চাও না?

চাওয়া না চাওয়া এখন আর নেই ফুল্ল বউ। তবু আমি বলছি ঐ শব্দটি মৃত্যু নয়। আমি মানছি না, মানব না।

তবে কেন তুমি ঐ শব্দটি বললে?

বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। আমি বলতে চাইনি।

ওহ্ কী নিষ্ঠুর সময়!

ফুল্লরা আর্তনাদ করে উঠে দুহাতে কান চেপে ধরে। তখন প্রাসাদের ভেতরে মানুষের পদধ্বনি গমগম করছে। সে শব্দ ওদের দরজার কাছে এসে থামে। মুহূর্তে পালটে যায় কালকেতুর চেহারা। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, কী চাও তোমরা?

আপনাকে নিতে এসেছি।

কেন?

আপনার বিচার হবে।

আমার বিচার? কে করবে?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জনগণের আদালত।

জনগণ?

হা-হা করে হেসে ওঠে কালকেতু। তখন মানুষের থাবা এসে পড়ে মুখের ওপর। স্তব্ধ হয়ে যায় হাসি।

আপনি হাসছেন? জানেন না যে নিরস্ত্র হয়ে গেছে আপনার তীরন্দাজ বাহিনী। কোথায় আপনার শক্তি।

'ওহ্' শব্দে আর্তনাদ করে ওঠে ফুল্লরা।

তখন হাজার হাজার মানুষ ওদের টেনে নিয়ে আসে নগরের চত্বরে। স্বর্ণমূর্তির আধা-ভাঙা স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় ওদের দুজনকে। ধরে আনা হয়েছে ভাঁড়ু দত্ত ও অন্যদের। ওদের রাখা হয়েছে আলাদা জায়গায়।

দুদিন ধরে জনতার আদালতে বিচার হয় কালকেতু ও ফুল্লরার। বিচারের রায় হয়েছে ফাঁসি। নগরের চত্বরে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হবে দুজনকে।

২১

জনগণের হাতে বন্দি কালকেতু ও ফুল্লরা প্রবল ক্রোধ নিয়ে চারদিকে তাকায়। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বলে নড়তে পারে না—তাই ক্রোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ক্ষমতাদর্পী স্বেচ্ছাচারী মানব-মানবীরা বন্ধন সহ্য করে না। ক্রোধ ও কৌশল অবলম্বন ছাড়া ওদের আর কিছু সম্বল নেই। ওরা ভালোবাসা দেয় না এবং পায় না। কালকেতুর হাত বাঁধা, সে নিজের অস্ত্র চালাতে পারে না। পা বাঁধা, তাই লাথি দিতে পারে না। পুরো শরীর শৃঙ্খলিত। ফলে বড় বেশি অসহায়। অথচ ওর চারদিকের এই মানুষগুলোকে পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ক্রোধে অন্ধ হয়ে ও মৃত্যুর কথা পর্যন্ত ভুলে যায়।

ফুল্লরা হাঁ করে ফাঁসি-মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পর ও কালকেতুর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, মঞ্চটা তৈরি হয়েছে।

কালকেতু ঘাড় ঘোরায়। দুজনে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। একটু পর ওর দৃষ্টি প্রজ্বলিত হয়। এখুনি বুঝি এই মঞ্চে উঠে ও বক্তৃতা করবে—যেমন করেছে এতকাল। একটু পর হাজার হাজার লোক জড়ো হবে ওখানে। ও এই নগরকে তিলোত্তমা নগর বানানোর স্বপ্নের কথা বলবে। ও তো জনগণকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল, তবে ওরা কেন স্বপ্ন দেখতে পারল না। কালকেতু থুঃ করে থুতু ফেলে। আসলে স্বপ্ন গরিবের জন্য নয়। গরিবরা স্বপ্ন দেখতে পারে না। একটি তিলোত্তমা নগরীর স্বপ্ন দেখা সহজ কথা নয়।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রক্ত এবং লাশ দিয়ে ওরা এই নগরীকে দুর্গন্ধময় করেছে। পচা গন্ধে ওর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ওর মাথা ভার হয়ে আসে—চোখ ঘোলাটে। ও কিছুতেই বুঝতে পারে না যে এই রক্ত এবং মৃত্যুর মূল্য কী? ও ঈর্ষান্বিত হতে শুরু করলে ওর মগজ সক্রিয় হয়। আর কেউ এই নগরের অধিপতি হবে এবং বিলাসবহুল প্রাসাদে অবস্থান নেবে ভাবতেই ওর ঈর্ষা বাড়ে।

ওই মানুষটি এই নগরকে ওর নিজস্ব সম্পত্তি বানাবে—লুটেপুটে খাবে—সম্পদের পাহাড় গড়বে—বিলাস আয়েশে ডুবে থাকবে। ওহ্! কী মর্মান্তিক এইভাবে ছেড়ে যাওয়া! ওরা আমাকে বলে স্বেচ্ছাচারী। কে নয় স্বেচ্ছাচারী? কে নয় নিজের ইচ্ছার দাস?

তখন একদলা থুতু ঠিক ওর চোখের সামনে এসে পড়ে। সারাদিন জনতা ওদের থুতু ছিটিয়েছে। ভিজে গেছে শরীর। কালকেতু মুখ ফিরিয়ে রাখে। ও এসব জঘন্য আচরণের কথা মনে করতে চায় না। পাশ থেকে কে যেন বলে, শুয়োরটার চোখ দুটো উপড়ে দেওয়া উচিত। যেন ও মরার পরও শকুনের দৃষ্টি নিয়ে এই নগরের দিকে তাকাতে না পারে।

ঠিক বলেছেন। আমরা ওর লোভী দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকতে চাই।

কী জঘন্যভাবে আমাদের নিংড়ে রস চুষে খেয়েছে ও।

ওহ্, কী বাঁচাটাই না বেঁচে গেছি আমরা!

বাঁচার কথা শুনে হা-হা করে হেসে ওঠে কালকেতু। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, কে কাকে বাঁচাবে?

উন্মত্তের মতো হাসতে থাকে কালকেতু। ফুল্লরা ভীত চোখে ওর দিকে তাকায়।

আবার থুতু বর্ষণ হয় ওদের ওপর। জনতার থুতু গড়াতে থাকে ওদের শরীরে। থুতুর তোড়ে দুজনের কেউই চোখ তুলে তাকাতে পারে না। মাথা ঝুলে আসে বুকের ওপর।

ঠিক দুপুর, সূর্য যখন মাথার ওপর খাড়া, গনগনে রোদ ঝরছে আকাশ থেকে—তখন ওদের কালো কাপড়ে আবৃত করা হয়। জনতার স্লোগান ওঠে, স্বৈরাচারী দম্পতি নিপাত যাক।

কালকেতু ও ফুল্লরার শরীর কেঁপে ওঠে। বারবার মনে হয়, কী নিষ্ঠুর এই নগর—কী নিষ্ঠুর। কোথাও মায়া নেই, ভালোবাসা নেই। তাহলে এতদিন ধরে কি ওরা এমন হৃদয়হীন নগর গড়েছে? মৃত্যুর মুহূর্তে এই উপলব্ধিতে ওরা দুজনই বিমূঢ় হয়ে যায়। চারদিকে ঘৃণা-মিশ্রিত স্লোগানের মাঝে ওরা ফাঁসি-মঞ্চে উঠতে বাধ্য হয়।

বিশাল শকুনের ছায়া ওদের মাথায় ওপর নেমে আসে।

প্রকাশ্য দিবালোকে কালকেতু ও ফুল্লরার ফাঁসি কার্যকর হয়।

https://boierhut.com/fb